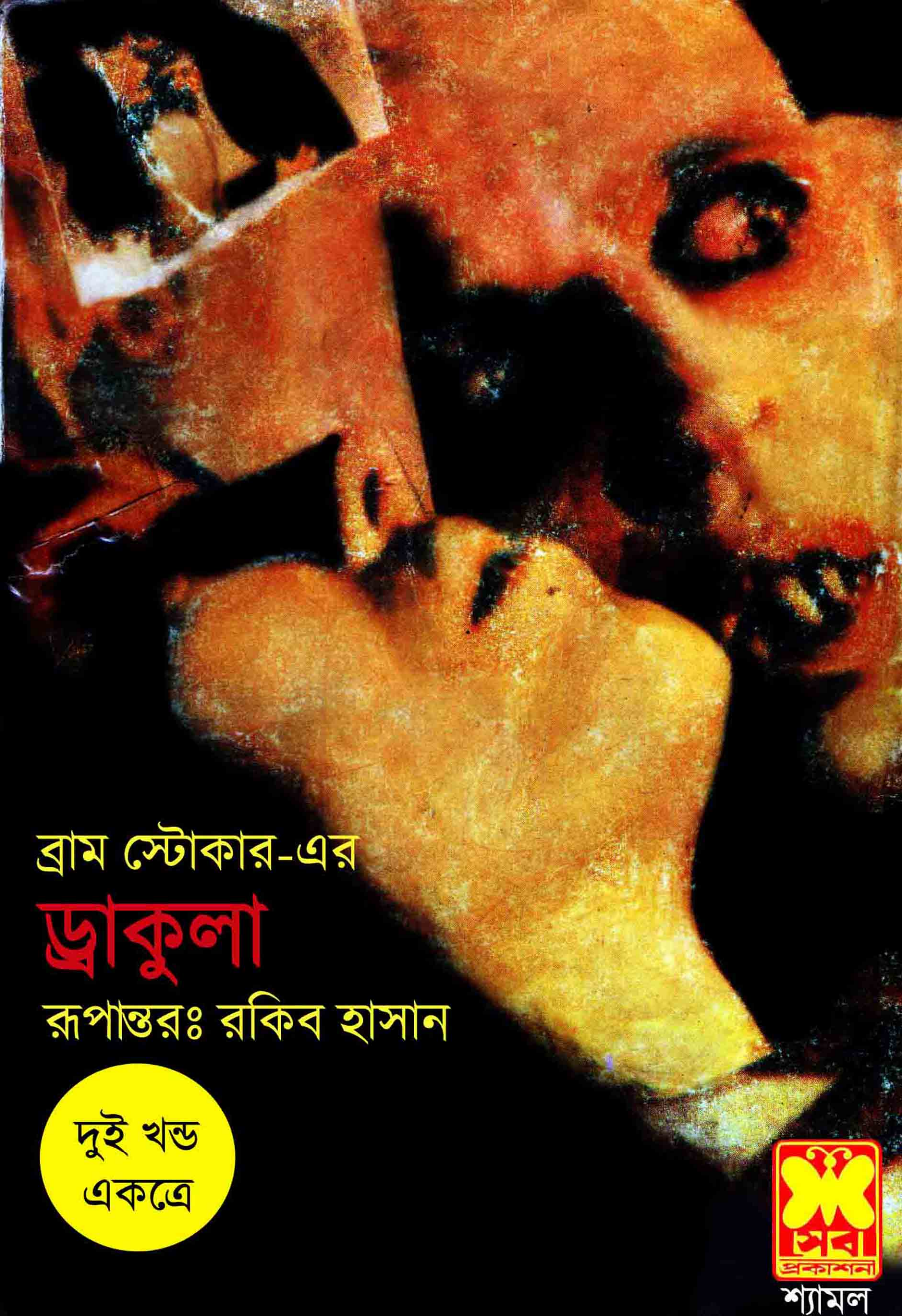

ব্রাম স্টোকার-এর

ড্রাকুলা

রূপান্তরঃ রকিব হাসান

দুই খন্ড একত্রে

সেবা প্রকাশনী

শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For More Exclusive, High Quality, Water-mark less E-books.

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books.

And Don't Remove This Page. Thank You.

-SHAMOL

ড্রাকুলা

(দুইখণ্ড একত্রে)

ব্রাম স্টোকার

রূপান্তরঃ

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3008 7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স : ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DRACULA
By: Bram Stoker
Bengali translation by:
Rakib Hassan

তেত্রিশ টাকা

প্রথম খণ্ড ড্রাকুলা ৫
দ্বিতীয় খণ্ড ড্রাকুলা ৯৭

সেবা'র

আরও ক'টি পিশাচ কাহিনী

পিশাচ দ্বীপ ঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কারপেথিয়ান দুর্গ ঃ জুলভার্ন ঃ শামসুদ্দিন নওয়াব

রক্তবীজ ঃ পিটার ট্রিমেন ঃ খসরু চৌধুরী

অশুভ সংকেত ঃ তিনখণ্ড একত্রে ঃ কাজি মাহবুব হোসেন

অ্যামিটিভিলের আতঙ্ক ঃ জে অ্যানসন ঃ কাজি মাহবুব হোসেন

উত্তরাধিকার ঃ কাজি মাহবুব হোসেন।

ড্রাকুলা ১

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৭৯

এক

জোনাথন হারকারের ডায়েরী থেকে

৩ মে, বিসট্রিজ।

মিউনিক ছেড়েছিলাম পয়লা মে, রাত আটটা পঁয়তিরিশে। সারারাত একটানা চলেও পরদিন ভোরে ভিয়েনায় পৌছে দেখা গেল একঘন্টা লেট করে ফেলেছে ট্রেন। আবার একটানা চলা। ট্রেনের কামরা থেকে একনজর দেখে অপূর্ব লাগল বুদাপেস্ট। দানিয়ুব নদীর ওপর তুরস্কীয় কায়দায় গড়া পাশ্চাত্যের সবচে' সুরম্য চওড়া ব্রিজটা পেরুবার সময়ই টের পেলাম পশ্চিম ইউরোপ ছেড়ে পুবের দিকে পাড়ি জমিয়েছি আমরা। বুদাপেস্টে নেমে খানিকক্ষণ ঘুরেফিরে দেখলাম শহরটা। স্টেশন ছেড়ে বেশিদূর যেতে সাহস পেলাম না, কি জানি যদি ট্রেনটা আবার আমাকে ফেলে রেখেই চলে যায়। স্টেশনে ফিরে দেখলাম ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে। আর কয়েক মিনিট দেরি হলেই মিস করতাম ট্রেন। যথাসময়েই অর্থাৎ সন্ধ্যের পরপরই ক্লসেনবার্গে পৌছে গেল ট্রেন। রাত কাটাবার জন্যে স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে উঠলাম। কার্পেথিয়ানদের জাতীয় খাদ্য প্যাপরিকা—সাংঘাতিক ঝাল দেয়া মুরগীর মাংস দিয়ে রাতের খাওয়া সেরেই শুয়ে পড়লাম। তুলতুলে নরম পালকের বিছানায় শুয়েও কিন্তু ঘুম এল না। গত কয়েকদিনের কথা একসঙ্গে এসে ভিড় জমাল মনে। একটা বিশেষ কাজে কার্পেথিয়ান পর্বতমালার ঠিক হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত ইউরোপের সবচেয়ে অখ্যাত আর দুর্গম এক জায়গায় চলেছি আমি। লণ্ডন ছাড়ার আগেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খুঁজেপেতে এ পর্যন্ত ট্রানসিলভেনিয়া সম্পর্কে যে সমস্ত বই বা মানচিত্র বেরিয়েছে তা জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তেমন কিছু পাইনি। দেশটা সম্পর্কে বাইরের লোকে বিশেষ কিছু জানে না দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম। অনেক খোঁজ-খবর করে শুধু এটুকুই জানতে পেরেছিলাম, কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গ, অর্থাৎ যেখানে চলেছি আমি, সে-জায়গাটা ট্রানসিলভেনিয়ার একেবারে পুব প্রান্তে। কোন মানচিত্র বা বইপত্রের কোথাও কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গের কোন উল্লেখই নেই। দু'একজন প্রাচীন লোকের মুখে জায়গাটার শুধু নামটা শুনেছি আমি।

ক্লসেনবার্গে পৌছে দেখলাম কাউন্ট ড্রাকুলার পূর্বপুরুষদের আমলে প্রতিষ্ঠিত

শহর বিসট্রিজ এখানকার লোকদের বেশ পরিচিত, কিন্তু কাউন্ট ড্রাকুলা সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে চায় না, কেন বুঝলাম না। এসব ভাবতে ভাবতেই একটু তন্দ্রা মত এল। কিন্তু অদ্ভুত সব দুঃস্বপ্ন দেখে সে-তন্দ্রাও ছুটে গেল বার বার। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেয়েও তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারলাম না। পিপাসা যেন মিটছেই না। ভোর রাতের দিকে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙল কড়া নাড়ার তীক্ষ্ণ শব্দে। লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই পরিচারক জানাল আমার যাত্রার সময় হয়ে এসেছে।

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে স্টেশনে পৌছতে পৌছতে সাতটা বেজে গেল। কিন্তু স্টেশনে এসে দেখলাম তখনও ট্রেন আসেনি, অর্থাৎ এ লাইনের যা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—ট্রেন লেট। টের পাচ্ছি, যতই পূবে এগোচ্ছি ততই গড়বড় হয়ে যাচ্ছে ট্রেনের সময়-সূচী।

শেষ পর্যন্ত এল ট্রেন, ছাড়লও একসময়। জানালা দিয়ে বাইরের অপূর্ব দৃশ্যপট দেখতে দেখতে চললাম। কখনও চোখে পড়ল প্রাচীন চিত্রকরদের আঁকা ছবির মত পাহাড়চূড়ায় ছোট্ট শহর কিংবা দুর্গ, কখনও দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলা তীব্র-স্রোতা পাহাড়ী নদী। চলার পথে প্রত্যেকটি স্টেশনে দেখলাম বিচিত্র পোশাক পরা মানুষের ভিড়। অধিকাংশই গেঁয়ো চাষী। পুরুষদের পরনে খাটো কোর্তা আর ঘরে তৈরি পাজামা। মাথায় বিশাল ব্যাঙের ছাতার আকৃতির গোল টুপি। মেয়েদের কাপড়গুলো কিন্তু ভারি সুন্দর। পুরো-হাতা ঝলমলে সাদা পোশাক আর ঘেরওয়ালা লুটানো ঘাঘরা পরা মেয়েদেরকে দেখতে প্রাচীন থিয়েটারের নর্তকীর মত মনে হল।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম স্লোভাকদের দেখে। বলতে কি, মনে মনে কিছুটা ভয়ও হল। গরুর গাড়ির চাকার সাইজের বিশাল বারান্দাওয়ালা লোকগুলোর টুপি, ঢলঢলে নোংরা পাজামা, সাদা কোর্তা, আগাগোড়া পিতলের পেরেক আঁটা বিঘতখানেক চওড়া চামড়ার বেল্ট আর উঁচু বুট। ওদের কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা কোঁকড়ানো কালো চুল আর সেই সাথে পাল্লা দেয়া বিরাট গোঁফ দেখে প্রথম দর্শনেই ডাকাত বলে ভুল হয়। অথচ পাশের লোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম এ এলাকার লোকদের মধ্যে নাকি ওরাই সবচেয়ে নিরীহ।

এত সব আশ্চর্য আর নতুন নতুন জিনিস দেখতে দেখতে দিনটা কিভাবে ফুরিয়ে গেল টেরই পেলাম না। সন্ধ্যার একটু আগে বিসট্রিজে এসে পৌছুলাম। গোধূলির ম্লান আলোয় বুদাপেস্টের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হল শহরটাকে। ট্রানসিলভেনিয়ার শেষ সীমান্তে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিসট্রিজ। বোর্গো গিরিপথটা এখান থেকেই সোজা চলে গেছে বুকোভিনা পর্যন্ত। বিসট্রিজ শহরের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় অতীতে বহু যুদ্ধের প্রচণ্ড ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। শোনা যায় সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

পাঁচ পাঁচবার যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার প্রকোপে পড়ে নিশ্চিহ্ন হতে হতে কোনরকমে বেঁচে যায় বিসট্রিজ। প্রথম যুদ্ধের প্রথম তিন সপ্তাহেই মারা যায় প্রায় তেরো হাজার মানুষ, এছাড়া দুর্ভিক্ষ আর মড়ক তো আছেই। এ থেকেই অনুমান করা যায় পরের যুদ্ধগুলোতে কত লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

গোল্ডেন ক্রোন হোটেলে ওঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাকে কাউন্ট ড্রাকুলা। প্রাচীন হোটেলটা দেখেই পছন্দ হল আমার, যেন এটাকেই খুঁজছিলাম মনে মনে। হোটেলের সদর দরজার কাছে একজন মাঝ-বয়সী সুন্দরী মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। জায়গায় জায়গায় সাদা কাপড়ের ঝালর দেয়া আঁটসাঁট রঙিন পোশাক পরা মহিলার আর একটু কাছাকাছি পৌঁছতেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি ইংল্যাণ্ড থেকে আসছেন তো?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলাম, 'আমি জোনাথন হারকার'

মৃদু হেসে পাশ ফিরলেন ভদ্রমহিলা। সাথের ভদ্রলোককে মৃদুস্বরে কি যেন বললেন, বুঝতে পারলাম না। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক, একটু পরই আবার ফিরে এলেন। হাতে একটা চিঠি। ওঁর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে খুলে পড়তে শুরু করলাম।

বন্ধু,

কার্পেথিয়ানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে। বুঝতেই পারছেন, আপনার সাথে সাক্ষাতের আশায় অধীর হয়ে দিন গুনছি আমি। আজ রাতটা কোনমতে হোটেলেই কাটিয়ে দিন। আগামীকাল তিনটের দিকে আবার যাত্রা শুরু হবে আপনার। একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে আপনার জন্যে আসন সংরক্ষিত করা আছে। আগামীকাল তিনটায় বুকোভিনার উদ্দেশে রওনা দেবে গাড়িটা। নির্দ্বিধায় উঠে বসবেন তাতে। বোর্গো গিরিপথের কোন এক জায়গায় ওই ঘোড়ার গাড়ি থেকে আপনাকে তুলে নেবে আমার নিজস্ব টমটম, পৌঁছে যাবেন আমার প্রাসাদ-দুর্গে। আশা করছি আপনার সাথে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের ক'টা দিন অত্যন্ত আনন্দেই কাটবে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে।

আপনার বন্ধু—
ড্রাকুলা।'

৪ মে।

হোটেলের মালিক অর্থাৎ যিনি আমাকে চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁকেও একটা চিঠি দিয়েছেন কাউন্ট ড্রাকুলা। আমার যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়

সেদিকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ আছে সে চিঠিতে। হোটেলের মালিক বলতে গেলে কথা প্রায় বলেনই না। আমি স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছিলাম তিনি জার্মান ভাষা জানেন না। কিন্তু তাঁর সাথে কথা বলার পর বুঝলাম তাঁর সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের ধারণাটা ভুল। কারণ তিনি এবং তাঁর স্ত্রী—সেই সুন্দরী ভদ্রমহিলা, আমার দু'একটা ছাড়া, বাকি সব প্রশ্নের উত্তরই যথাযথভাবে দিয়েছিলেন। তবে আমাকে দেখলেই কেমন একটা চাপা উত্তেজনা আর আশঙ্কার ছায়া পড়েছে ওঁদের চোখে-মুখে। প্রশ্ন করে জানলাম আমার রাহা খরচের টাকা আগেই ডাকযোগে হোটেলের মালিকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন কাউন্ট ড্রাকুলা। কাউন্ট ড্রাকুলা আর তাঁর প্রাসাদ-দুর্গ সম্পর্কে কি জানেন জিজ্ঞেস করতেই চমকে উঠে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। মুখে যদিও বললেন সে-সম্পর্কে ওঁরা কিছু জানেন না, কিন্তু আমার মনে হল ইচ্ছে করেই কিছু গোপন করছেন তাঁরা। দ্রুত এগিয়ে আসছে রওনা দেবার সময়। আর কারও সাথে পরিচিত হয়ে কাউন্ট ড্রাকুলা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই যাত্রার সময় হয়ে গেল। মনে মনে একটা তীব্র অস্বস্তি নিয়ে হোটেলের কামরা থেকে বেরোতে যাব, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন সুন্দরী ভদ্রমহিলা। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, 'সত্যিই আপনি যাচ্ছেন তাহলে?'

'মানে?' অবাক হলাম আমি।

'না গেলেই কি নয়?'

'কেন যাব না? তাছাড়া খামোকা বেড়াতে তো আর সেখানে যাচ্ছি না আমি। অফিস থেকে রীতিমত কাজ নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছি কাউন্টের সাথে।'

'তা যান,' একটু যেন হতাশ হলেন ভদ্রমহিলা, 'আমি বলছিলাম আজকের দিনে…জানেন না আজ চৌঠা মে?'

'জানব না কেন? আজ চৌঠা মে তো হয়েছে কি?'

'হয়নি, কিন্তু হবে। আজ সেন্ট জর্জ দিবস। মাঝ রাতের ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যেখানে যত প্রেতাত্মারা আছে, সব জেগে উঠবে আজ। তাছাড়া, জানেন কার কাছে যাচ্ছেন?'

ব্যাপার কি? এবারে সত্যিই আশ্চর্য হলাম আমি। বোধহয় আমাকে কিছুটা টলিয়ে দিতে পেরেছেন ভেবে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন ভদ্রমহিলা। হাত জোড় করে বললেন, 'আমি আপনার কেউ না, আপনাকে জোর করতে পারি না আমি। তবু মিনতি করছি, আরও দু'টো দিন অন্তত আপনি এ হোটেল ছেড়ে বেরোবেন না।'

এবারে দ্বিধায় পড়লাম। ভাবছি কি করা যায়। যাব, না থাকব। অনিশ্চয়তার

দোলায় দুলতে দুলতে নিজের ওপরই খেপে গেলাম, এ কি ছেলেমানুষী হচ্ছে! এসব দুর্বোধ্য কথাবার্তা আর হেঁয়ালি শুনে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়? ওদিকে কত কাজ পড়ে আছে। কথাটা মনে হতেই গম্ভীর হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'মাফ করবেন। কাজটা অত্যন্ত জরুরী, আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

আমাকে ঠেকানর কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। নিজের গলায় ঝোলানো ক্রুশটা খুলে নিয়ে জোর করে গুঁজে দিলেন আমার হাতে। ধর্মের প্রতি কোনদিনই আমার তেমন বিশ্বাস-টিশ্বাস নেই। কাজেই একবার ভাবলাম ফিরিয়ে দিই ওটা, কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে তা আর পারলাম না, আসলে মমতাময়ী ওই মহিলাকে আঘাত দিতে ইচ্ছে করল না আমার। মনে মনে ঠিক করলাম, মহিলা চোখের আড়াল হলেই টুপ করে ফেলে দেব কোথাও। বোধহয় আমার মনোভাব বুঝতে পেরে মৃদু হাসলেন মহিলা, তারপর আমার হাত থেকে ক্রুশটা নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'যদি আপনার মা এটা গলায় পরিয়ে দিতেন, তাহলে কি ফেলে দিতে পারতেন?'

কথাটা বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। কি জানি, আমার মনের ভুলও হতে পারে, ঘুরে দাঁড়ানর আগে ভদ্রমহিলার চোখে অশ্রু টলমল করতে দেখেছিলাম।

গলা থেকে খুলে ফেলতে পারলাম না ক্রুশটা। চিন্তিতভাবে হোটেলের কামরা থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। একটু পর চলতে শুরু করল গাড়ি। মিনা, তখনও কি জানতাম কতটা ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি আমি!

৫ মে, প্রাসাদ-দুর্গ।

পুব আকাশে উঠি উঠি করছে সূর্য। ভোরের সূর্য আমার দারুণ ভাল লাগে, তা তো তুমি জানোই, মিনা, কিন্তু আজ ভাল লাগল না। কেমন যে রোগাটে মলিন দেখাচ্ছে সূর্যটাকে। বিছানায় বার দু'য়েক গড়াগড়ি করে উঠে পড়লাম, ডায়েরীটা লিখে ফেলতে হবে।

গতকাল আমি গাড়িতে উঠে বসার পরও গাড়ি ছাড়তে কিছুক্ষণ দেরি করল কোচোয়ান। হোটেলের মালিকের সাথে উত্তেজিতভাবে কিছু বলছে সে, আর বার বার তাকাচ্ছে আমার দিকে। বুঝলাম কথা হচ্ছে আমার সম্পর্কেই। এতক্ষণ আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল হোটেলের কয়েকজন বয় বেয়ারা। আস্তে আস্তে ওরাও হোটেলের মালিক আর কোচোয়ানের সাথে তর্কে যোগ দিল। ওরা কি বলছে

ভালমত শুনতে পেলাম না। তবে যে কয়েকটা শব্দ শোনা গেল সেগুলোর মানে জানার জন্যে তাড়াতাড়ি ওই দেশী অভিধানটা বের করলাম। কয়েকটা শব্দের মানে সত্যি রহস্যজনক। যেমন—শয়তান, নরক, ডাইনী ইত্যাদি। আর দু'টো শব্দ তো রীতিমত অবাক করল আমাকে। শব্দ দু'টো হল নেকড়ে আর রক্ত চোষা বাদুড়। মনে মনে ঠিক করলাম, কাউন্টকে জিজ্ঞেস করে শব্দগুলোর তাৎপর্য জেনে নেব।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর গাড়িতে এসে উঠল কোচোয়ান। ততক্ষণে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে হোটেলের গেটের সামনে। আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে সবাই। পাশের সহযাত্রীর দিকে ঝুঁকে মৃদুস্বরে জানতে চাইলাম, এসব কি হচ্ছে? প্রথমে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সে। আমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত জানাল, অশুভ আত্মার দৃষ্টি থেকে আমাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই অমন করছে ওরা। সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় ঠিক তেমনি অচেনা একজন লোকের সাথে দেখা করতে যাবার আগে এ ধরনের কাজ কারবার দেখে মনটা ঘাবড়ে গেল আমার।

ঝাঁকড়া, সবুজ পাতাওয়ালা বাতাবি আর কমলালেবুর গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে হোটেল প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানটায়। তার আশপাশে দাঁড়ানো লোকগুলো আমার মত অচেনা একজন বিদেশীর জন্যে আন্তরিক আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে যে হৃদ্যতা দেখাল তা জীবনে ভুলব না আমি।

কোনরকম জানান না দিয়েই হঠাৎ ছুটতে শুরু করল গাড়ি। সহযাত্রীদের ভাষা আমার বোধগম্যের বাইরে বলে তাদের সাথে আলাপে অংশগ্রহণ করতে পারছি না। কিন্তু চারপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। বড় বড় গাছে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পাহাড়ের গা। বনের ওপারে সবুজ ঘাসে ছাওয়া তেপান্তর, তারপরেই আবার চলে গেছে পাহাড়ের সারি। এখানে ওখানে জন্মে আছে অজস্র আপেল, পাম, নাশপাতি আর চেরিফলের গাছ। সব ক'টা গাছের গায়েই ভাবী সন্তানের আগমনের ইঙ্গিত, অর্থাৎ ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। সন্তান বরণ করার জন্যেই বোধহয় ওগুলোর গোড়ায় জন্মানো সবুজ ঘাসের ঘন জঙ্গলের ওপর আলপনা এঁকেছে ঝরা ফুলের পাপড়ি। পাশের সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম অপূর্ব এই জায়গাটার নাম 'মিটেল ল্যাণ্ড'।

পাহাড়ের গা ঘুরে এঁকেবেঁকে নামতে নামতে হঠাৎ করেই মনে হবে দেবদারু বনের মাঝে গিয়েই শেষ হয়ে গেছে বুঝি পথটা, কিন্তু আসলে শেষ হচ্ছে না। পথটা অল্পবিস্তর অসমান, তবু ঢালু পথে ঝড়ের বেগে ছুটছে আমাদের গাড়ি।

মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে বোর্গো গিরিপথে পৌছনর জন্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে কোচোয়ান। কারণ বুঝতে পারলাম না। সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করেও সন্তোষজনক উত্তর পেলাম না।

আরও সামনে এগিয়ে, মিটেল ল্যাণ্ডের সবুজ উপত্যকা পেছনে ফেলে কার্পেথিয়ানের বিশাল প্রান্তরের প্রান্তে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া অরণ্যের কাছে এসে পৌছুলাম। আমার ডাইনে-বাঁয়ে তখন শুধু ছোটবড় পাহাড়ের সারি। ওদিকে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। অস্তগামী সূর্যের আলোয় দূরে পাহাড় চূড়াগুলোকে দেখাচ্ছে গাঢ় নীল, আর কাছেরগুলো কমলা। ঘাস প্রান্তর আর পাহাড়ের গোড়ার সঙ্গমস্থলের কোথাও সবুজ, কোথাও বাদামী। আর বহুদূরে, দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি তুষার ছাওয়া চূড়াগুলোর সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

একটু পরই পাহাড়ের গা থেকে নেমে আসা ছোট ছোট ঝর্ণার দেখা পেলাম। বিদায়ী সূর্যের সোনালী আলো এসে পড়েছে ওগুলোর ওপর। এখন আর পানির ঝর্ণা বলে মনে হচ্ছে না ওগুলোকে। ঝিরঝির শব্দে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসছে যেন তরল সোনা।

পথটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিতেই হুমড়ি খেয়ে আমার গায়ের উপর এসে পড়লেন পাশের সহযাত্রী। আঙুল দিয়ে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে চোখের ইঙ্গিতে আমাকে দেখালেন, 'ওই, ও-ই-ই যে, ওখানেই বাস করেন ঈশ্বর।' কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না। আঁকাবাঁকা সর্পিল পথে আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটন্ত সূর্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বহু আগেই, এখন একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে। পাহাড়ের ওপারে ডুবছে এখন সে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সম্পূর্ণ চোখের আড়ালে চলে গেল সূর্য। এতক্ষণ সাহস পায়নি, কিন্তু সূর্য ডুবে যাওয়া মাত্র এদিক ওদিক চাইতে চাইতে মন্থর পায়ে এগিয়ে আসতে থাকল অন্ধকার। সূর্যের চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না, অথচ আশ্চর্য, তুষার ছাওয়া পাহাড়গুলো তখনও সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। একটা সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু তুষার ছাওয়া চূড়াগুলো অসংখ্য সূর্য হয়ে আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে। সেই আলোয় চোখে পড়ল রাস্তার দুধারে ঘাসে ছাওয়া জমির বুক ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ক্রুশ। যতবার চোখে পড়ছে ক্রুশগুলো ততবার বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে আমার সহযাত্রীরা। কখনও কখনও দু'একটা ক্রুশের সামনে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করছে কিষাণী বধূ। বোধহয় অকালে হারিয়ে যাওয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে জানাচ্ছে তার ব্যথাভরা বুকের গোপন হাহাকার। এতই তন্ময় হয়ে বসে আছে যে আমাদের দিকে একবারের জন্যেও মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। যেন আমরা নেই।

গিরিমুখে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গোধূলির শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেল।

সাঁঝ ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বাড়তে লাগল ঠাণ্ডা। গাঢ় কুয়াশা নেমে আসতে লাগল বার্চের অরণ্যের উপর। হালকা তুষারের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে পাতাবাহারের কালো কালো ঝোপ। ঢাল বেয়ে দ্রুত নামার সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি দেবদারুর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে গাড়ি। সে-ঢালটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে আবার খাড়া উঠে গেছে পথটা। অতি ধীরে গাড়িটাকে টেনে টেনে এখন এগোতে হচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। ওগুলোর পেছন পেছন হেঁটে যাব ভেবে কোচোয়ানকে বললাম কথাটা। সাথে সাথেই দারুণ চমকে উঠে আমাকে বাধা দিয়ে বলল সে, 'বলছেন কি, সাহেব? এখানে নামামাত্রই ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে নেবে আপনাকে হিংস্র কুকুরের দল।' আশপাশে তাকিয়ে একটা কুকুরও চোখে পড়ল না আমার। কানে এল না কুকুরের একটা ডাকও। 'কোথায় কুকুর?' কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করতেই অদ্ভুত ভাবে হাসল সে, কোন উত্তর দিল না।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতেই আলো জ্বালবার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড থামল কোচোয়ান। হোটেল ছাড়ার পর এই প্রথমবারের জন্যে থামল সে। আঁধার হবার পরপরই কেন যেন একটু উত্তেজিত মনে হল যাত্রীদের। বার বার কোচোয়ানকে আরও জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে ধমকাতে লাগল ওরা। আর ওদের কথার প্রত্যুত্তরেই যেন নির্মম ভাবে হিশিয়ে উঠতে থাকল কোচোয়ানের চাবুক, জান বাজি রেখে ছুটে চলল ঘোড়াগুলো।

জমাট অন্ধকারে প্রায় অন্ধের মত ছুটছে আমাদের গাড়ি। এবড়োখেবড়ো আর আঁকাবাঁকা পথে লাফাতে লাফাতে ছুটছে, স্থির হয়ে বসে থাকা যাচ্ছে না কিছুতেই। একটু পরই অপেক্ষাকৃত মসৃণ হয়ে এল রাস্তা, সাথে সাথে দু'পাশ থেকে চেপে এসে আমাদের গিলে নিতে চাইল পাহাড়ের সারি। বুঝলাম, বোর্গো গিরিপথে প্রবেশ করেছি আমরা।

গিরিপথে প্রবেশ করতেই একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল সহযাত্রীদের মধ্যে, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু আর একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ কেন যেন আবার গম্ভীর হয়ে গেল ওরা। যেন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার অপেক্ষা করছে। কারণ জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও আমাকে কিছু জানাল না কেউ। উত্তেজিত নীরবতায় থমথম করছে গাড়ির ভিতরটা। গাড়ি আরও এগোতেই পুব দিকে খাঁড়ির মুখটা চোখে পড়ল। আবহাওয়ার পরিবর্তনও টের পেলাম। একে গাঢ় অন্ধকার, তার ওপর আকাশে মেঘ জমায় কালিগোলা অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক। থমথমে বাতাসে ঝড়ের সংকেত।

আর একটু এগোতেই দেখা গেল রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দু'দিকে চলে গেছে। ডান পাশের পথটা বেছে নিল কোচোয়ান। বাঁ দিকের পথটা

কোথায় গেছে জানতে চেয়েও উত্তর পেলাম না কারও কাছ থেকে। ইচ্ছে করেই আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সহযাত্রীরা। ক্রমেই বাড়ছে বাতাসের বেগ।

এদিকেরই কোন এক জায়গা থেকে কাউন্টের টমটমে আমাকে তুলে নেবার কথা। উৎকণ্ঠিত ভাবে এদিক ওদিক চেয়ে তার খোঁজ করতে লাগলাম। প্রতিমুহূর্তে আশা করতে লাগলাম এখনই অন্ধকারের বুক চিরে দেখা দেবে কোন লণ্ঠনের আলো। কিন্তু দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমাদের গাড়ির লণ্ঠনের কাঁপা কাঁপা আবছা ভৌতিক আলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। সে-আলোয় ধাবমান ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

বালি বিছানো পথ বেয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে চললাম। এখনও চোখে পড়ছে না কাউন্টের টমটম। তবে কি ওটা আসবে না? যাত্রীদের অস্বস্তি আর উত্তেজিত ভাবটা যেন একটু কমে আসছে। আরও কিছু পর হাতঘড়ি দেখে সবচেয়ে কাছের যাত্রীকে নিচু গলায় কি যেন বলল কোচোয়ান। তেমনি নিচু গলায় উত্তর দিল যাত্রী ভদ্রলোক, 'ঘন্টাখানেক বাকি আছে এখনও।' কিসের ঘন্টাখানেক বাকি আছে? সবটা ব্যাপারই কেমন অদ্ভুত আর রহস্যময় ঠেকল আমার কাছে।

আরও কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আমার দিকে ফিরে ভাঙা ভাঙা জার্মানিতে কোচোয়ান বলল, 'আজ বোধহয় আর আসবে না কাউন্টের টমটম। তার চেয়ে এক কাজ করুন না, অযথা এই বুনো পথে টমটমের অপেক্ষা না করে আমাদের সাথে বুকোভিনায় চলুন। সেখান থেকে কাল, না-না, পরশু ফিরে আসবেন।'

কোচোয়ানের কথা শেষ হবার আগেই তীক্ষ্ণ হ্রেষা ধ্বনিতে চমকে উঠলাম। ভয়ঙ্কর কোন কিছুর গন্ধ পেয়েছে বোধহয় আমাদের ঘোড়াগুলো। থমকে থেমে দাঁড়িয়ে, নাক তুলে বাতাসে কি যেন শুঁকছে আর চেঁচাচ্ছে ওগুলো। কেমন অজানা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে থেমে গেল দু'একজন যাত্রী।

ঠিক সেই সময় গাড়ির চাকা আর ঘোড়ার খুরের শব্দে পিছন ফিরে চাইলাম। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে চার ঘোড়ায় টানা সুন্দর একটা ফিটন। আমাদের লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম চারটে ঘোড়াই কুচকুচে কালো রঙের, আর আশ্চর্য বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। ফিটনটা থেমে দাঁড়াতেই চালকের আসন থেকে নেমে এল লম্বামত একজন লোক। বাদামী দাড়িতে ঢাকা লোকটার মুখ মাথার বিশাল কালো টুপিটা সামনের দিকে টেনে দেয়া, তাতে মুখের প্রায় সবটাই ঢাকা পড়ে গেছে। সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল আগন্তুক। মুখ তুলে চাইতেই লণ্ঠনের আলোয় এক পলকের জন্যে দেখলাম লোকটার টকটকে লাল দুটো চোখ। কোচোয়ানের দিকে ফিরে ধরা গলায়, অনেকটা শাসনের সুরে বলল আগন্তুক, 'আজ এত তাড়া কেন, গলায় কাঁটা আটকেছে নাকি?'

যেন ভয়ঙ্কর কোন অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছে, তাই দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে এমন ভাবে উত্তর দিল কোচোয়ান, 'না না, কি যে বলেন। আসলে ওই বিদেশী ভদ্রলোক দ্রুত চালাবার জন্যে কেবলই তাড়া লাগাচ্ছিলেন কিনা, তাই...'

'তাই তাকে বুকোভিনায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে?' কোচোয়ানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ধমকে উঠল আগন্তুক, 'ফের আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা করলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। জানো না আমার শক্তি সম্পর্কে? আমার ওই ঘোড়ার সাথে দৌড়ে পারবে তোমার ঘোড়াগুলো?'

একটু অবাক হয়েই আগন্তুকের কথা শুনছি। লণ্ঠনের আবছা আলো এসে পড়েছে ওর চোখে-মুখে। সে আলোয় দেখলাম রুক্ষ কঠিন লোকটার মুখ। কড়া করে লিপস্টিক লাগানো লাল টুকটুকে ঠোঁটের মত দুটো ঠোঁটের ভেতর ঝিকমিক করছে মুক্তোর মত সাদা তীক্ষ্ণ দাঁত। আগন্তুক কোচোয়ানকে শেষ প্রশ্নটা করতেই আমার কানের কাছে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বলল পাশের সহযাত্রী, 'তা বটে, মৃত্যুর ঘোড়া একটু জোরেই ছোটে।'

এত আস্তে কথা বলল সহযাত্রী যে কোনরকমে কথাটার মানে বুঝলাম আমি। কিন্তু চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে চাইল আগন্তুক। আমার মনে হল কথাটা শুনতে পেয়েছে সে। কিন্তু কি করে শুনল? তার শ্রবণশক্তি কি এতই প্রখর? আমার পাশের সহযাত্রীর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল আগন্তুক। সাথে সাথে চমকে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল সহযাত্রী। পাত্তা দিল না আগন্তুক। সহযাত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'ভদ্রলোকের জিনিসপত্রগুলো দিন।'

সঙ্গে এনেছি শুধু একটা স্যুটকেস। সেটাই নিয়ে ফিটনে তুলে রাখল আগন্তুক। তারপর ফিরে এসে আমাকে নামার ইঙ্গিত করল। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ফিটনে উঠলাম আমি। ফিটনে উঠতে আমাকে সাহায্য করল আগন্তুক। তার হাতের ছোঁয়া লাগতেই যেন শির শির করে উঠল আমার গা। ইস্পাতের মত কঠিন আগন্তুকের হাতের আঙুলগুলো। এ থেকেই লোকটার শরীরের আসুরিক শক্তি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল আমার।

আমি ফিটনে উঠে বসতেই চালকের আসনে উঠে বসল আগন্তুক। সাপের মত হিস হিস করে উঠল তার হাতের চাবুক। বিদ্যুতের মত লাফিয়ে উঠে একপাক ঘুরে অন্ধকার গিরিপথের দিকে ছুটে চলল ঘোড়াগুলো। ফিটনটা ঘোরার সময়ই আগের গাড়িটার দিকে চোখ পড়েছিল আমার। প্রচণ্ড ভয়ে থর থর করে কাঁপছে ঘোড়াগুলো। আর সমানে বুকে ক্রুশ এঁকে চলেছে যাত্রীরা। ফিটনটা ঘুরে যেতেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল আগের গাড়ির কোচোয়ান। মুহূর্তে প্রাণ ফিরে পেল যেন ঘোড়াগুলো। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলল বুকোভিনার পথ ধরে।

গাড়িটা অন্ধকারে মিলিয়ে যেতেই একটা একাকীত্ব আর অস্বস্তি চেপে বসল আমার বুকে। প্রচণ্ড শীতে কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। অথচ আগের মতই গায়ে গরম কোট আর গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গরম কম্বলে জড়ানো। কি করে যেন আমার শীত লাগার ব্যাপারটা টের পেল আগন্তুক। পরিষ্কার জার্মানিতে বলল, 'প্রচণ্ড শীত পড়েছে আজ। কাউন্ট ড্রাকুলা আপনার সমস্ত সুখ-সুবিধের খেয়াল রাখতে বার বার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন আমাকে। আপনার সীটের তলায় একটা দেশী মদের বোতল রাখা আছে, প্রয়োজন মনে করলে বের করে নিয়ে শরীরটা একটু গরম করতে পারেন।'

প্রয়োজন মনে করলাম না। তবু ওটা আছে জেনে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম। আসলে ভয় করছে না আমার, কিন্তু তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তির মত ভাব থেকে থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে মনের ভেতর। অত্যন্ত জরুরী কাজ না থাকলে ঝড়ের রাতে এভাবে অজানা বুনো পথে পাড়ি দেয়ার চেয়ে হোটেলের আরামদায়ক কামরায় নিজেকে আটকে রাখতেই বেশি পছন্দ করতাম আমি।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে ফিটন। একটু এগিয়ে যাবার পরই মোড় ঘুরে আর একটা পাহাড়ী পথে গাড়ি ছোটাল আগন্তুক। হঠাৎ একটা অদ্ভুত সন্দেহ জাগল আমার মনে। বাঁকের পর বাঁক ঘুরে মনে হল একই পথে বার বার ঘুরে বেড়াচ্ছে গাড়িটা। সন্দেহটা জাগতেই সতর্ক হলাম। আবার বাঁক ঘুরতেই সেটার কয়েকটা বিশেষ চিহ্ন মনে গেঁথে নিলাম। একটু পরই আমার সন্দেহের নিরসন হল, যা ভেবেছিলাম তাই, একই পথে বার বার ঘুরছে গাড়িটা। কেন? একবার ভাবলাম, ব্যাপারটা আগন্তুককে জিজ্ঞেস করে দেখি। কিন্তু পরক্ষণেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা।

কোন কারণে হয়ত ইচ্ছে করেই দেরি করছে সে। তাই যদি হয়, তাহলে জিজ্ঞেস করলেও সদুত্তর পাব না। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। সময় দেখেই একটা কুসংস্কারের কথা মনে পড়ল। নিজের অজান্তেই ধক করে উঠলো হৃদপিণ্ডটা। মাঝ রাত হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। মাঝ রাতের পরপরই নাকি জেগে ওঠে সমস্ত অশুভ প্রেতাত্মা আর পিশাচেরা। একটু যে ভয় পেলাম না তা নয়, তবু যুক্তি তর্ক দিয়ে জোর করে ভয়টা তাড়াবার চেষ্টা করলাম।

আরও কয়েক মিনিট পরই দূরে কোথাও আর্তস্বরে ডেকে উঠল একটা কুকুর। সেটার প্রত্যুত্তরে আর একটা, তারপর আর একটা। হঠাৎ করেই জীবন্ত হয়ে উঠল যেন বুনো পাহাড়ী এলাকা। শত শত কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎকারে খান খান হয়ে ভেঙে

গেল আশপাশের নিস্তব্ধতা। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে শতগুণ বেড়ে গেল সেই শব্দ ঝংকার।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফিটনের ঘোড়াগুলো। আগন্তুকের শত আশ্বাস সত্ত্বেও আর এক পা এগোল না ওগুলো। মনে হল প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে বাঁধন ছিঁড়ে গাড়ি ফেলে পালাতে পারে। হঠাৎ থেমে গেল কুকুরের ডাক। তার পরিবর্তে শোনা গেল হাজার হাজার নেকড়ের রক্ত-পানি করা চাপা গর্জন। ঘোড়াগুলোকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমারই ইচ্ছে করতে লাগল গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে পালাই। কিন্তু পালাব কোথায়? ডাক শুনে মনে হচ্ছে আমাদেরকে ঘিরে এগিয়ে আসছে নেকড়ের দল। ঘোড়াগুলোকে আয়ত্তে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল আগন্তুক। ধীরে ধীরে একটু শান্ত হয়ে এল ঘোড়াগুলো, কিন্তু শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হল না ওগুলোর। লাফ দিয়ে চালকের আসন থেকে নেমে এল আগন্তুক, ঘোড়াগুলোর কানে কানে কি যেন বলল। সাথে সাথেই স্বাভাবিক হয়ে এল ঘোড়াগুলো। আবার চালকের আসনে উঠে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল আগন্তুক।

আগের মত আর একই জায়গায় ঘুরছে না এখন গাড়িটা। দ্রুত গিরিপথটা পার হয়ে এসে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ মোড় নিল ডাইনে। একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ পথে এসে পড়ল গাড়িটা। দু'পাশ থেকে পথের ওপর এসে ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁকড়া গাছ। গায়ে গায়ে লেগে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো, আর ওগুলোর ডালপালা এমনভাবে এসে পড়েছে রাস্তার ওপর, মনে হল সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছি। ডালপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ছে এক আধটা পাহাড়ের চূড়ার আবছা অবয়ব। বাইরে তখন প্রচণ্ড বেগে ফুঁসছে ঝড়, আর প্রচণ্ড বেগেই পরস্পরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে গাছের ডালপালাগুলো। শীতের তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে, তার ওপর কুয়াশার মত হালকা তুষারপাতও শুরু হয়েছে। তুষারের চাদরে ঢাকা পড়ে আরও অন্ধকার হয়ে গেছে রাত। হিমেল হাওয়ায় ভর করে বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের আর্ত চিৎকার। হঠাৎ আবার শোনা গেল নেকড়ের চাপা গোঙানি। ভেবেছিলাম চলে গেছে নেকড়েগুলো। কিন্তু যায়নি,-বরং আমাদেরকে ঘিরে আরও কাছিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড ভয় পেলাম এবার। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পেল না আগন্তুক। বোধহয় রোজ রাতেই নেকড়ের ডাক শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে।

ঠিক এমনি সময় ঘটল ঘটনাটা। আমার বাঁ দিকে দূরে দপ করে জ্বলে উঠল একটা নীলচে আলোর শিখা। আলোটা দেখেই রাশ টেনে ঘোড়া থামাল আগন্তুক। লাফ দিয়ে চালকের আসন থেকে নেমেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে গভীর

অন্ধকারে। কোন্‌দিকে যে গেল বুঝতে পারলাম না। ওদিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে নেকড়ের গর্জন।

কয়েক সেকেণ্ড পরই আবার ফিরে এল আগন্তুক। কোন কথা না বলে চালকের আসনে উঠে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার মনে হল, ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? গায়ে চিমটি কেটে দেখলাম, না ঠিকই তো আছি! হঠাৎ আবার দেখা গেল সেই নীলচে আলোটা। এবার একেবারে গাড়ির পাশেই। তীব্র উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল চালক আর ঘোড়াগুলোকে। মুহূর্তে গাড়ি থেকে নেমে কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আলোটাকে তাড়া লাগাল আগন্তুক।

যে-কোন প্রকার আলোর সামনে কোন মানুষ দাঁড়ালে তা তার শরীরের আড়ালে ঢাকা পড়ে যেতে বাধ্য, অথচ আশ্চর্য, এ ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটল না। নীল আলোটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল আগন্তুক, কিন্তু তার শরীরের আড়ালে ঢাকা পড়ল না আলোর শিখা। আগন্তুকের এপাশে বসে আগের মতই পরিষ্কার আলোর শিখাটা চোখে পড়ছে আমার। আগন্তুক যেন রক্ত-মাংসের মানুষ না, হালকা কাঁচের তৈরি। এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখা তো দূরের কথা, কখনও কল্পনাও করিনি আমি। একটা শিরশিরে আতঙ্কে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম।

কয়েক সেকেণ্ড পরই দপ করে নিভে গেল নীল আগুনের শিখা, আর জ্বলল না। ফিরে এসে গাড়ি ছেড়ে দিল আগন্তুক। ওদিকে চারদিক ঘিরে আরও এগিয়ে এসেছে নেকড়ের গর্জন। বেশ কিছুক্ষণ একভাবে চলার পর গাড়ি থেকে নেমে কোথায় যেন চলে গেল আগন্তুক। সে চলে যেতেই আতঙ্কে থর থর করে কাঁপতে লাগল ঘোড়াগুলো। কারণটা বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ খেয়াল করলাম নেকড়ের ডাক থেমে গেছে। দেবদারুর বন আর পাহাড়ের মাথার ওপরের কালো মেঘের ফাঁক থেকে হঠাৎ করেই বেরিয়ে এল চাঁদ। জীবনে চাঁদের বহু রূপ দেখেছি, কিন্তু সেদিনের রূপের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি। অদ্ভুত এক ছায়া ছায়া ভৌতিক আলো ছড়িয়ে পড়েছে দেবদারুর মাথায় আর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। সেই আবছা চাঁদের আলোতেই চোখে পড়ল জানোয়ারগুলো। ধূসর লোমশ শরীর, ঝকঝকে সাদা দাঁতের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা টকটকে লাল জিভ আর পেশল শরীর নিয়ে আমাদের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার নেকড়ে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ করে বসতে পারে ওরা। সত্যি কথা বলতে কি, জীবনে এত ভয় পাইনি আমি কখনও।

হঠাৎ কানে তালা লাগানো শব্দ করে একসঙ্গে ডেকে উঠল সব কটা নেকড়ে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়াগুলো। বহু আগেই গাড়ি ফেলে যে যেদিকে পারত ছুট

লাগাত ঘোড়াগুলো, কিন্তু চারপাশ থেকে ঘিরে আছে নেকড়ের দল। কোন দিকে যাবার পথ নেই, তাই যেতে পারছে না।

পাগলের মত চেঁচিয়ে আগন্তুককে ডাকতে শুরু করলাম আমি। হঠাৎ রাস্তার একপাশে চোখ পড়তেই দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক। কোন ভাবান্তর নেই তার মধ্যে। আরও কয়েক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল আগন্তুক, তারপর দু'হাত সামনে বাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাড়াতে লাগল, বোধহয় দূর হয়ে যেতে বলছে হতচ্ছাড়া নেকড়েগুলোকে। চোখের সামনে দেখলাম লোকটার হাতের ইশারায় গর্জাতে গর্জাতেই পিছিয়ে যাচ্ছে নেকড়ের দল। আর ওদের সাথে তাল রেখেই বোধহয় যেমনি আচমকা বেরিয়ে এসেছিল তেমনি আবার মেঘের ফাঁকে ঢুকে গেল চাঁদ। আবার নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক।

টের পেলাম গাড়িতে উঠে বসেছে আগন্তুক। চলতে শুরু করল গাড়ি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ আগের অদ্ভুত ঘটনাটা মন থেকে তাড়াতে পারলাম না কিছুতেই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি। আতঙ্কে ঠক ঠক করে কাঁপছে হাত-পা। বিমূঢ়ের মত বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকলাম।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল বলতে পারি না। হঠাৎ গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তেই চমক ভাঙল। বিশাল এক প্রাসাদ-দুর্গের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি। বিশাল প্রাসাদের তেমনি বিশাল সব জানালার কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। কখন যে আবার মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ, খেয়াল করিনি। সেই চাঁদের আলোয় দুর্গের মাথায় প্রাচীন কামান বসানর খাঁজ-কাটা ভাঙা ফোকরগুলো চোখে পড়ছে। কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ-দুর্গে এসে পৌছুলাম শেষ পর্যন্ত।

বিশাল প্রাঙ্গণে এসে গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নিচে নামল আগন্তুক। গাড়ির দরজা খুলে হাত ধরে আমাকে নামতে সাহায্য করল সে। দ্বিতীয় বারের মত সেদিন অনুভব করলাম তার হাতের ইস্পাত কঠিন আঙুলের শক্তি। স্যুটকেসটা গাড়ি থেকে নামিয়ে আনল সে। তীক্ষ্ণ লোহার পেরেক গাঁথা ভারি প্রকাণ্ড দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে কালের কষাঘাতে জর্জরিত রুক্ষ পাথরের দেয়ালগুলো দেখতে লাগলাম। স্যুটকেসটা আমার পাশে নামিয়ে রেখে আবার গিয়ে গাড়িতে উঠল আগন্তুক, তারপর গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই।

আবছা অন্ধকারে বিশাল এক ভৌতিক বাড়ির প্রাঙ্গণে ভূতের মতই দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। কি করব বুঝতে পারছি না। ঘন্টা জাতীয় কিছু নেই দরজায়, থাকলে তা বাজিয়ে লোকদের ডাকা যেত। চেঁচিয়েও লাভ নেই, কারণ সারা জীবন

এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচালেও এই নিরেট পাথরের দেয়াল ভেদ করে আমার কণ্ঠস্বর ওপারে গিয়ে পৌঁছুবে না। ক্রমেই নানারকম সন্দেহ আর ভয় বাসা বাঁধতে শুরু করেছে মনে। এ কোথায় এসে পড়লাম? কি দরকার ছিল এই সৃষ্টিছাড়া অভিযানের? একজন আইনজীবীর অধীনস্থ কেরানির পক্ষে বহুদূরে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় বাস করা একজন বিদেশীর কাছে লণ্ডনের সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে আসা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়? আসলে আমার এই কেরানিগিরিটাকে মিনা কোনদিনই ভালো চোখে দেখতে পারেনি। প্রায় জোর করে আমাকে দিয়ে এল. এল. বি. পরীক্ষাটা দিইয়েছিল মিনা, এখানে আসার ঠিক আগের দিন জানতে পেরেছি ভালমতই পাস করেছি পরীক্ষায়। ইচ্ছে আছে, এখান থেকে ফিরে গিয়ে পুরোদস্তুর উকিল হয়ে বসব। কিন্তু যে ভূতুড়ে এলাকায় এসে ঢুকেছি, আদৌ কোনদিন লণ্ডনে ফিরে যেতে পারব কি না কে জানে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজার ওপারে কার ভারী পায়ের শব্দে চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এলাম। কপাটের ফাঁক দিয়ে আসা অস্পষ্ট আলোও চোখে পড়ছে এখন। দু'এক সেকেণ্ড পরই কপাটের ওপারে লোহার ভারী খিল খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর বহুদিনের না খোলা মরচে ধরা তালা খোলার শব্দ। পরক্ষণেই বিশ্রী ঘড় ঘড় আওয়াজ করে খুলে গেল ভারী লোহার পাল্লা।

গলা থেকে পা পর্যন্ত কালো আলখাল্লায় ঢেকে দাঁড়িয়ে আছেন একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ। হাতে ধরা প্রাচীন আমলের চিমনিবিহীন রূপোর বাতিদানে বসানো মোমের আলোয় প্রথমেই চোখে পড়ল তাঁর নাকের নিচের ধবধবে সাদা পুরু গোঁফ আর পরিষ্কার কামানো চিবুক। ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে আন্তরিকতার সুরে পরিষ্কার ইংরেজিতে আমায় আমন্ত্রণ জানালেন বৃদ্ধ, 'আপনার জন্যে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি আমি। আসুন।'

স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। জোর করে আমার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে নিলেন বৃদ্ধ, তারপর ইঙ্গিতে এগিয়ে যেতে বললেন। বলেই কি মনে করে, বোধহয় এতক্ষণ হাত মেলাতে মনে ছিল না বলে একটু লজ্জিত ভাবেই আমার ডান হাতটা চেপে ধরলেন তিনি। চমকে উঠলাম। বহুক্ষণ আগে মরে যাওয়া মানুষের মত ঠাণ্ডা ওঁর হাত। আমার চমকে ওঠাটা বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। মৃদু হেসে বললেন তিনি, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ওপরে চলুন।'

আমার হাত চেপে ধরা আর ঝাঁকুনি দেয়ার ভঙ্গি দেখে চকিতে আগন্তুকের কথা মনে পড়ে গেল আমার। সেই আগন্তুক ভদ্রলোক আর এই বৃদ্ধ একই লোক নয়ত? কথাটা কেন মনে এল বুঝতে পারলাম না, কিন্তু কেন যেন মনে হতে লাগল

দু'জন একই লোক। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, 'আপনি. কি কাউন্ট ড্রাকুলা?'

'ঠিক ধরেছেন,' বিনয়ে বিগলিত ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন বৃদ্ধ, 'আমিই কাউন্ট ড্রাকুলা।' বলেই সচকিত হয়ে উঠলেন কাউন্ট, 'এখন চলুন তো। বাইরে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে চলুন, সেখানেই আপনার সব প্রশ্নের জবাব পাবেন। তাছাড়া পথশ্রমে নিশ্চয়ই আপনি ক্লান্ত। খাওয়া এবং বিশ্রামেরও দরকার আছে আপনার।'

বলতে বলতেই পাশের দেয়ালের তাকে বাতিদানটা রেখে দিয়ে চওড়া ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ওপরে উঠতে শুরু করলেন কাউন্ট। কয়েক তলা উঠে লম্বা টানা বারান্দা। নিঝুম নিস্তব্ধ বারান্দায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমাদের পায়ের ভারী শব্দ। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা ভারী দরজা ঠেলে খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকতে আহ্বান জানালেন কাউন্ট। ঘরের ভেতরে ঢুকেই খুশি হয়ে উঠল মনটা। আলোয় ঝলমল করছে বিশাল কক্ষটা। বিশাল একটা ডাইনিং টেবিল রাখা আছে ঘরের মাঝখানে। ঘরের কোণের বিরাট ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে গনগনে আগুন।

আমি ঢুকতেই স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে দিলেন কাউন্ট। এগিয়ে গিয়ে ঘরের অন্য পাশের দরজাটা খুললেন। দরজা খুলতেই চোখে পড়ল জানালাশূন্য ছোট্ট একটা আটকোনা ঘর, একটি মাত্র মোমবাতি জ্বলছে সে ঘরে। সে ঘরটাও পেরিয়ে গিয়ে অন্যপাশের দরজাটা খুললেন কাউন্ট, তারপর ইঙ্গিতে ডাকলেন আমাকে। তৃতীয় ঘরটায় গিয়ে ঢুকলাম। চমৎকার করে সাজানো ঘরটা। খাট, ফায়ারপ্লেস ইত্যাদি বেশ কায়দা করে জায়গামত রাখা হয়েছে। নিজে গিয়ে প্রথম ঘরটা থেকে আমার স্যুটকেসটা বয়ে আনলেন কাউন্ট। সেটা জায়গামত রাখতে রাখতে বললেন, 'বাথরুমে গিয়ে ভালমত হাত-মুখ ধুয়ে নিন, চাইলে গোসলও সেরে নিতে পারেন। গরম পানি আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে ওখানে। কাজ শেষ করে সোজা ডাইনিং রুমে চলে আসুন। আমি অপেক্ষা করব সেখানে,' বলেই দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন কাউন্ট।

কাউন্টের ব্যবহারে সন্দেহ ও আশঙ্কার আর লেশমাত্র থাকল না আমার মনে। মনটা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই চেগিয়ে উঠল খিদে। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে গিয়ে ঢুকলাম। ফায়ারপ্লেসের একপাশে পাথরের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কাউন্ট। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রাশি রাশি খাবার সাজানো ডাইনিং টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে খুব? আপনি আসার আগেই খেয়ে নিয়েছি আমি। সুতরাং অযথা দেরি না করে বসে পড়ুন।'

খাওয়ার টেবিলে বসে পড়ে প্রথমে মিস্টার হকিন্সের কাছ থেকে নিয়ে আসা

চিঠিটা পকেট থেকে বের করে কাউন্টের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম আমি। চিঠিটা আমার হাত থেকে নিয়ে খুলে পড়তে শুরু করলেন কাউন্ট। পড়া শেষ হতেই নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল কাউন্টের মুখ। চিঠিটা পড়ে দেখার জন্যে আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। চিঠির শেষের খানিকটা পড়ে আমার মনটাও অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল। হকিন্স লিখেছেন, '…হঠাৎ বাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় আমি নিজে আপনার সাহায্যে হাজির হতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু যাকে পাঠাচ্ছি তাকেও নির্দ্বিধায় আমার আসনে স্থান দিতে পারেন। আমার কাজের জন্যে ওর মত যোগ্য লোক আর খুঁজে পাইনি আমি। আপনার প্রাসাদে থাকাকালীন আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নির্দেশ আমি দিয়ে দিয়েছি ওকে, অতএব কাজ উদ্ধারের ব্যাপারে যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারেন…'

আমার পড়া শেষ হতেই এগিয়ে এসে প্লেটের ঢাকনা তুলে দিয়ে আমাকে খেতে তাড়া লাগালেন কাউন্ট। চমৎকার রান্না করা মুরগীর রোস্ট, সালাদ, পনির আর এক বোতল পুরানো টোকয় মদ দিয়ে খাওয়া সেরে নিলাম। খাওয়ার পর আমার সাথে গল্প করতে বসলেন কাউন্ট। কাউন্টের অনুরোধেই চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের সামনে টেনে এনে তার মুখোমুখি বসলাম আমি। পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন কাউন্ট। আমি একটা টেনে নিতেই বাক্সটা বন্ধ করে পুরো বাক্সটাই আমাকে দিয়ে দিলেন তিনি। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতেই মৃদু হেসে জানালেন ধূমপানে অভ্যস্ত নন কাউন্ট। তাঁর মেহমানদারীতে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। অতিথির আদর আপ্যায়নে কোন দিকেই ত্রুটি রাখেননি তিনি।

চুরুটে টান দিতে দিতে কাউন্টের চেহারা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম আমি। সম্ভ্রান্ত চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় কাউন্ট হবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে এ লোকের ভরাট মুখে রাজ্যের গাম্ভীর্য, বলিষ্ঠ চিবুক, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক, চওড়া ঢালু কপাল যেন পাথর কুঁদে বের করে আনা হয়েছে। আশ্চর্য ঘন কালো ভুরু, আর মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চুল আর ভুরু ঘন কালো অথচ গোঁফ সম্পূর্ণ সাদা, ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো!

টুকটুকে লাল ঠোঁটের প্রান্ত ঠেলে একটু সামনের দিকে বেরিয়ে এসেছে ঝকঝকে সাদা তীক্ষ্ণ দাঁত, এটাও কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল আমার কাছের পাতলা কানের আগাদুটো ছুঁচালো হয়ে উঠে গেছে। সব মিলিয়ে আমার মনে হল এ পৃথিবীর মানুষ নন কাউন্ট, এখানে বাস করা যেন তাঁর সাজে না। কথাটা কেন মনে হল বুঝতে পারলাম না।

হাঁটুর ওপর রাখা কাউন্টের হাতের বেঁটে রুক্ষ আঙুলগুলোর দীর্ঘ নখগুলো

দু'পাশ থেকে কেটে তীক্ষ্ণ করা। হঠাৎ তাঁর হাতের তালু দুটো উল্টাতেই একটা জিনিস দেখে চমকে উঠলাম, দু'হাতের তালুতেই কয়েক গোছা করে চুল। ভারি অদ্ভুত তো! কথা বলার জন্যে আমার দিকে একটু ঝুঁকে আসতেই ওঁর দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিলাম আমি। নিঃশ্বাসে ওঁর বোঁটকা পচা গন্ধ। কোন মানুষের নিঃশ্বাসে অমন পচা গন্ধ থাকতে পারে ভাবিনি কখনও। আমার মুখ বাঁকানো দেখে মুচকে হাসলেন কাউন্ট। হাসার সময় স্পষ্ট দেখা গেল দু'পাশের ঠেলে বেরিয়ে আসা দাঁত।

হঠাৎ চারদিকের নিঃসীম নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে উপত্যকার দিক থেকে ভেসে এল হাজারো নেকড়ের চাপা হিংস্র গর্জন। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠে জানালার দিকে চাইতেই দেখলাম বাইরে শেষ হয়ে আসছে রাত। ইতিমধ্যেই ফিকে হতে শুরু করেছে নিকষ কালো অন্ধকার। নেকড়ের গর্জন শুনে চাপা উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল কাউন্টের দু'চোখ। আবেগ জড়িত গলায় বললেন তিনি, 'শুনেছেন কেমন সুন্দর গান গাইছে ওরা? গাইবেই তো, আসলে ওরা যে আঁধারের সন্তান।'

তাঁর কথায় আমার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতেই মৃদু হেসে বললেন কাউন্ট, 'আসলে সবাই সব কিছু বোঝে না। তাছাড়া আপনারা শহুরে মানুষ, কিসে শিকারীর আনন্দ তা আপনাদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।' বলেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'ভোর হয়ে আসছে। ভুলেই গিয়েছিলাম পথশ্রমে আপনি ক্লান্ত। যান, আর দেরি না করে শুয়ে পড়ুনগে। একটা বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে। তাই সাঁঝের আগে দেখা পাবেন না আমার।' নিজেই এগিয়ে গিয়ে আমার শোবার ঘরের দরজা মেলে ধরলেন কাউন্ট। আমি ঘরে ঢুকতেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন তিনি। হঠাৎ নিঃসীম একাকীত্বে পেয়ে বসল আমাকে। অকারণেই ছমছম করে উঠল গা। মন বলছে ভয়ঙ্কর কোন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি আমি।

৭ মে।

জানালার দিকে চাইতেই দেখলাম অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। ব্যাপার কি? একদিনে দু'বার ভোর হতে পারে না। হঠাৎ বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা এক কাক ভোরে ঘুমিয়ে আরেক কাক ভোরে জেগে উঠেছি আমি। মাঝখানে পার হয়ে গেছে পুরো একটা দিন আর রাত। বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। কাপড় জামা পাল্টে নিয়ে ডাইনিং রুমে এসে ঢুকতেই টেবিলে সাজানো নাস্তার দিকে চোখ পড়ল। এক পাশে ঢাকা দেয়া কফির পাত্র। এগিয়ে গিয়ে ঢাকনা খুলতেই বাষ্প বেরিয়ে এল কফির পাত্র থেকে। বোধহয় মিনিট খানেকও হয়নি পাত্রটা রেখে গেছে কেউ। টেবিলে রাখা বাতিদানে মোমবাতি জ্বলছে। তার

একপাশে পেপার-ওয়েট দিয়ে চেপে রাখা একটুকরো কাগজের দিকে চোখ পড়ল। তাতে কি যেন লেখা। এগিয়ে গিয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে পড়লামঃ 'জরুরী কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে। আপনাকে একা একা নাস্তা সারতে হচ্ছে বলে দুঃখিত—ড্রাকুলা।'

একা একাই নাস্তা সেরে নিলাম। একটা ব্যাপার বড় আশ্চর্য লাগল। এত বড় বাড়িটা এত নিঝুম কেন? চাকর-বাকর বা অন্য কোন লোকজন নেই নাকি? চাকরদের ডাকার জন্যে ঘন্টী-টন্টি জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে শুরু করলাম, কিন্তু সে রকম কিছুই চোখে পড়ল না।

খুঁজতে খুঁজতে বাড়িটার অফুরন্ত প্রাচুর্য চোখে পড়ল। টেবিলে রাখা প্রত্যেকটা বাসন পেয়ালা বাঁটি সোনার তৈরি। এত সুন্দর কারুকাজ করা তৈজসপত্র আজকের দিনে দুর্লভ। আমার বেডরুমের দরজা-জানালার পর্দা আর সোফার কভারগুলো অপূর্ব সুন্দর আর দুর্লভ মখমলের তৈরি। দেখেই বোঝা যায় কয়েক শতাব্দী আগে তৈরি হয়েছে এসব, অথচ এখনও কি আশ্চর্য সুন্দর আর ঝলমলে। ঘরের কোথাও আয়না জাতীয় কিছু চোখে পড়ল না। এটাও আশ্চর্য। এত বড় বাড়ি আর প্রাচুর্যের মধ্যে চাকর-বাকর না থাকার মতই কাঁচ না থাকাও কেমন যেন বেমানান।

এখনও ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। এসময় বাইরে বেরনো যাবে না, আর কাউন্টের বিনা অনুমতিতে বাইরে বেরোনো উচিত হবে না।

পড়ার মত বই-টই পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে শুরু করলাম। ছোট্ট আটকোনা ঘরের তৃতীয় দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। দরজার ওপাশে বেশ বড় একটা ঘর। হ্যাঁ, পড়ার ঘরই। দেয়াল-জোড়া বুক-কেসগুলো চামড়ায় বাঁধানো অজস্র বইয়ে ঠাসা। প্রায় সব বিষয়ের ওপরেই বই আছে সেখানে। অধিকাংশই ইংরেজি। আর আছে আইনের বই। বইগুলো দেখে খুশি হয়ে উঠল মনটা। ডুবে গেলাম বইগুলোর মধ্যে। বাড়ছে বেলা।

গভীর মনোযোগের সাথে বইগুলো দেখছি, এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকলেন কাউন্ট। বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে বললেন, 'চমৎকার, মি. হারকার। আপনিও দেখছি আমার মতই বইয়ের পোকা।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? বইগুলোর বেশিরভাগই ইংরেজি। আসলে ইংরেজি আর ইংরেজদের আমার দারুণ ভাল লাগে। আমার জীবনের একটা বড় ইচ্ছা লণ্ডনে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করব, তাই ইংরেজিটা মোটামুটি ভালই আয়ত্ত করে নিয়েছি...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'মোটামুটি বলছেন কি, কাউন্ট? আপনি তো ইংরেজদের

মতই ইংরেজি বলতে পারেন।'

'আসলে বাড়িয়ে বলছেন আপনি। তবে হ্যাঁ, গ্রামারটা ভাল মতই আয়ত্ত করে নিয়েছি। আর কাজ চালানো যায় এমন কিছু ইংরেজি শব্দও জানা আছে আমার।'

'খামোকা বিনয় দেখাচ্ছেন, কাউন্ট। আমার মত যে-কেউই বলবে চমৎকার ইংরেজি জানেন আপনি।'

'তবুও আপনার কাছে ভাষাটা আর একটু ঝালিয়ে নিতে চাই আমি।'

'অবশ্যই, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি। তবে শেখার বাকি নেই খুব একটা।' বিষয়টাকে চাপা দেবার জন্যেই বললাম, 'আচ্ছা, কাউন্ট, আপনার প্রাসাদের ঘরগুলো দেখতে কোন অসুবিধে আছে কি?'

'অসুবিধে! কিসের অসুবিধে? স্বচ্ছন্দে প্রাসাদের ভেতরে যেখানে আপনার খুশি যেতে পারেন আপনি। তবে একটা কথা, তালা দেয়া ঘরগুলোতে ভুলেও ঢোকার চেষ্টা করবেন না। কারণটা ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে। তবে এটুকু বলছি, অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করবেন না।'

মনে মনে আশ্চর্য হলেও মুখে বললাম, 'তা আপনি যা বলেন।'

'আমার কথায় অবাক হবেন না। ট্রানসিলভেনিয়ায় যখন এসেছেন নতুন অনেক কিছুই দেখতে পাবেন, জানতে পারবেন। অবশ্য ইতিমধ্যেই অদ্ভুত অনেক কিছু নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছেন আপনি।'

আরও আশ্চর্য হলাম। ইতিমধ্যেই কিছু দেখেছি তা কাউন্ট জানলেন কি করে? একটানা বকবক করে চললেন কাউন্ট। প্রাসাদ-দুর্গ এবং আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করলাম, অনেক প্রশ্নের জবাবই কৌশলে এড়িয়ে গেলেন তিনি। দ্বিধায় ভুগতে ভুগতে একসময় জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, 'একটা কথা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছি না, কাউন্ট। সেদিন রাতে ঘোড়ার গাড়িতে করে আসার সময় একটা অদ্ভুত নীল আলো চোখে পড়েছিল আমার। এ সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে কি?'

'আছে,' মুচকি হাসলেন কাউন্ট, 'এখানকার লোকদের ধারণা বছরের বিশেষ একটা দিনে মাঝরাতের পর সমস্ত প্রেতাত্মারা জেগে ওঠে। ধন-রত্নের পাহারাদার প্রেতাত্মারা যেখানে থাকে সেখানে জ্বলতে শুরু করে ওই অদ্ভুত নীল আলো। আসলে ওদের গা থেকেই বেরোয় ওই আলোর ছটা।'

'আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, তাই। গতকালই গেছে সেই বিশেষ দিনটি। যেসব এলাকা পার হয়ে এসেছেন আপনি সেসব এলাকার মাটির নিচে প্রাচীন ধন ভাণ্ডার চাপা পড়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধের আগে ট্রানসিলভেনিয়ার সমস্ত ধনী ব্যক্তিরা ওই এলাকার

পাশেই বসবাস করত।'

'ওই নীল আলো সম্পর্কে এখানকার লোকেরা জানে, বোধহয় দেখেও থাকবে কেউ কেউ। তা সত্ত্বেও ওই গুপ্তধন এতদিন অনাবিষ্কৃত থাকল কি করে?'

জোরে শব্দ করে হাসলেন কাউন্ট। আলোর ছটা ঝিক করে উঠল দু'পাশের তীক্ষ্ণধার দাঁত দু'টোয়। হাসিটা স্তিমিত হয়ে এলে বললেন, 'আগেই বলেছি, নীলচে আলো দেখা যায় শুধু বছরের বিশেষ একটা রাতে। ওই রাতে দরজায় শক্ত করে খিল এঁটে ঘরে বসে ইষ্ট নাম জপ করতে থাকে এ এলাকার ভীত গেঁয়ো মানুষের দল। ভুলেও ঘরের বাইরে পা বাড়াতে সাহস করে না ওরা। আর যদি ঘরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কেউ দেখেও ফেলে ওই আলো তাহলেও চোখের ভুল বলে ভুলে যেতে চেষ্টা করে। আসলে আলো দেখা যাওয়া জায়গার ত্রিসীমানায় দিনের বেলাতেও ঘেঁষতে চায় না কেউ।'

'বুঝলাম।'

প্রসঙ্গ বদলে অন্য কথায় চলে গেলেন কাউন্ট। বললেন, 'যে জন্যে আপনার এখানে আসা সে সম্পর্কেই তো এখন জানা হল না কিছু। আমার কেনার জন্যে নির্দিষ্ট করা বাড়িটা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?'

'আসছি,' বলে সোজা নিজের ঘরে চলে এলাম। স্যুটকেস থেকে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র বের করে নিয়ে আবার পড়ার ঘরে এসে ঢুকলাম। ছোট্ট টেবিলটার সামনের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে এখন ব্রাডসর গাইডের পাতা উল্টাচ্ছেন কাউন্ট। তার পাশে একটা সোফায় বসে পড়ে দলিলের নকল, টাকার হিসেব-পত্র সব বুঝিয়ে বললাম। বাড়ির পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। মনে হল সব শুনে সন্তুষ্ট হয়েছেন কাউন্ট। স্পষ্টই বোঝা গেল চারধারে উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা কুড়ি একর জমির ওপর গাছপালায় ছাওয়া আর গির্জাওয়ালা বহু পুরানো লণ্ডনের ওই নির্জন বাড়িটা কিনতে পেরে খুশি হয়েছেন তিনি। কাউন্টের কথায় মনে হল নির্জনতা আর ছায়া ছায়া অন্ধকারে একা বসে বসে ভাবতে ভাল লাগে ওঁর কারণটা কি? সাংঘাতিক কোন মানসিক আঘাত পেয়েছেন জীবনে? কাউন্টকে দেখার পর থেকে ওঁর কথা বলার ধরন-ধারণ মোটেই ভাল লাগছে না আমার, আর ওঁকে হাসতে দেখলেই চমকে উঠি, কেমন যেন ভয়ঙ্কর মনে হয় হাসিটা। বুঝতে পারছি না কিসের সাথে এর তুলনা করা চলে।

কি মনে হতেই হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কাউন্ট, যাবার আগে পেছন থেকে টেনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। সেদিকে একবার চেয়ে আবার বইগুলোর দিকে মনোনিবেশ করলাম আমি। একটা পাতলা কিন্তু বড় আকারের

বইয়ের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল আমার। দেখে মনে হল গত কিছুদিন ধরে বইটা বড় বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। তাক থেকে টেনে নিলাম বইটা। একটা ওয়ার্ল্ডম্যাপ। বইয়ের একজায়গায় পাখির পালক গুঁজে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। পালক গোঁজা পাতাটা খুলে দেখলাম সেটা ইংল্যাণ্ডের মানচিত্র। মানচিত্রের গায়ে কয়েকটা জায়গায় লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম জায়গাগুলো। লণ্ডনের পূবদিকে যেখানে ওঁর নতুন বাড়িটা কেনার কথাবার্তা চলছে তার কাছাকাছিই একটা জায়গা চিহ্নিত করা। দ্বিতীয়টা এগজিটার এবং তৃতীয়টা ইয়র্কশায়ার উপকূলের হুইটবি এলাকার কাছাকাছি কোন এক জায়গায়।

কয়েক ঘন্টা পর আবার ফিরে এলেন কাউন্ট। বললেন, 'সেরেছে, সারারাত এভাবেই কাটাবেন নাকি! কখন রাত হয়ে গেছে খেয়াল নেই বুঝি? খেতে যেতে হবে না? আসুন, জলদি খেয়ে নিন।'

কাউন্টকে অনুসরণ করে ডাইনিং রুমে এসে ঢুকলাম। হাত ধরে ডাইনিং টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিয়ে ফায়ার-প্লেসের কাছের চেয়ারটায় বসলেন কাউন্ট। বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'আজও একাই খেতে হচ্ছে আপনাকে। আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।'

আমার খাওয়া শেষ হলে গত রাতের মতই একটানা বকবক করে চললেন কাউন্ট। সময় সম্পর্কে আমাদের কারোরই কোন খেয়াল থাকল না। হঠাৎ হিমেল হাওয়ায় ভর করে দূরের কোথাও থেকে ভেসে এল মোরগের ডাক। ভোর হয়ে আসছে তার জানান দিচ্ছে ওরা। রীতিমত চমকে উঠলেন কাউন্ট। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ছিঃ ছি, ভোর হয়ে গেছে। সারাটা রাত আপনাকে আটকে রাখা আমার সত্যিই অন্যায় হয়েছে। আসলে ইংল্যাণ্ডের কথা এসে পড়ায়ই এমনটা ঘটল। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে দারুণ ভাল লাগে আমার। যান, আর দেরি না করে শুয়ে পড়ুনগে,' বলেই দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কাউন্ট।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। জানালার ভারী পর্দাটা সরিয়ে ফেলতেই খোলা আকাশের দিকে চোখ পড়ল। দ্রুত রং বদলাচ্ছে রাতের আকাশ। ইতিমধ্যেই আঁধার কেটে গিয়ে ধূসর হতে শুরু করেছে চারদিক। সারাটা রাত কেটে গেল অথচ এখনও ঘুমের লেশমাত্র নেই আমার চোখে। তাই আবার পর্দাটা টেনে দিয়ে এসে লিখতে বসলাম।

৮ মে।

কাউন্টের প্রাসাদ-দুর্গের কিছু কিছু জিনিস অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে

আমার। প্রাসাদে পৌঁছে কাউন্টের সৌজন্যতায় প্রথমে মনে হয়েছিল এখানে আমি নিরাপদ, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তা নয়। সারাটা প্রাসাদে একমাত্র কাউন্ট ছাড়া এ পর্যন্ত অন্য কোন মানুষের ছায়াও চোখে পড়েনি আমার। কাউন্টের ব্যবহারও কেমন যেন অদ্ভুত। দিনের বেলায় ভুলেও দেখা পাওয়া যায় না তাঁর। কোথায় যান, কি করেন বুঝতে পারছি না।

অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে আজ। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। সন্ধ্যার পর ঘুম থেকে উঠে সঙ্গে করে আনা ছোট আয়নাটা আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বের করে নিয়ে জানালার সামনে বসে দাড়ি কামাবার জোগাড় করছি। সবে কামাতে শুরু করেছি এমন সময় কাঁধের ওপর কারও হাতের কঠিন চাপ অনুভব করলাম। ঘুরে তাকাতে যাব এমন সময় কানের কাছে বেজে উঠল কাউন্টের ভারি গলার আওয়াজ, 'গুড ইভনিং, মি. হারকার।'

ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন কাউন্ট, অথচ আয়নায় তাঁর প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছি না আমি। ঘরে ঢোকার সময় তাঁর পায়ের শব্দও আমার কানে যায়নি। ব্যাপারটা কি করে সম্ভব?

আয়নায় কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে চাইলাম। যা ভেবেছিলাম, ঠিক আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন কাউন্ট। সারাটা ঘর এবং ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়, অথচ আমার পেছনে দাঁড়ানো কাউন্টকে দেখা যাচ্ছে না কেন? এমন অদ্ভুত কথা তো শুনিনি কখনও! একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম বুঝতে পারলাম না অস্বস্তিটা কিসের, কিন্তু খেয়াল করেছি, কাউন্ট যখনই আমার খুব কাছাকাছি আসেন তখনি এমন বোধ করতে থাকি আমি।

হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করলেন কাউন্ট যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। কাউন্ট আমার কাঁধে হাত রাখার পর চমকে উঠে হাত ফসকে গিয়ে গালের খানিকটা জায়গা কেটে গেল আমার। সেখান থেকে বেরিয়ে গাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে রক্ত, টের পাচ্ছি। ক্ষুরটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে সেটা মুছতে যাব এমন সময় কাউন্টের চোখের দিকে চোখ পড়ল আমার। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম। অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলছে কাউন্টের দুটো চোখ। কয়েক মুহূর্ত একভাবে রক্তের দিকে চেয়ে থেকে আচমকা আমার গলাটা চেপে ধরলেন কাউন্ট, মুখটা নিয়ে এলেন চিবুকের খুব কাছে, যেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখানে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম। গলা থেকে কাউন্টের হাতটা সরে গিয়ে আমার বুকের ওপর ঝোলানো ক্রুশটায় ঘষা লাগল। একলাফে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন কাউন্ট। চোখের পলকে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল ওঁর

অবস্থা।

মৃদু হেসে সাফাই গাইবার সুরে বললেন কাউন্ট, 'দেখুন তো, গালের কতটা কেটে ফেলেছেন! এত অন্যমনস্ক হলে কি চলে?' বলেই দাড়ি কামাবার ছোট আয়নাটা তুলে নিলেন তিনি। 'এসব আজেবাজে জিনিস রাখার কোন মানে হয়? ফেলে দিন এটা,' বলে আমার অপেক্ষা না করে নিজেই খোলা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ওটা। এরপর আর একটাও কথা না বলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মনে মনে দারুণ রেগে গেলাম কাউন্টের ওপর। আয়না ছাড়া দাড়ি কামাব কি করে? শেষ পর্যন্ত পিতলের তৈরি ঝকঝকে ক্ষুরের বাক্সের পিঠেই কোনমতে মুখ দেখে দাড়ি কামানোটা সারলাম। দাড়ি কামিয়ে, বাথরুম সেরে কাপড় পালটে নিয়ে ডাইনিংরুমে এসে ঢুকলাম। টেবিলে যথারীতি খাবার সাজানো রয়েছে, কিন্তু কাউন্ট নেই। অতএব একাই খাওয়া সেরে নিলাম। এখানে আসা অবধি কাউন্টকে কিছু খেতে দেখিনি। খাওয়ার পর একা একা এক জায়গায় ঠায় বসে না থেকে বাতিদান সহ মোমবাতি নিয়ে প্রাসাদটা একটু ঘুরে দেখতে চললাম।

সিঁড়ি বেয়ে অল্পক্ষণেই দক্ষিণমুখো একটা ঘরে এসে পৌঁছুলাম। এ ঘরের জানালার কাছে দাঁড়ালে বাইরের প্রকৃতির অপূর্ব সব দৃশ্য চোখে পড়ে। ওদিকে চাঁদ উঠেছে। জানালার কাছে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে বাইরের সেই দৃশ্যই দেখতে লাগলাম।

প্রায় খাড়া একটা পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টের প্রাসাদদুর্গ। এই জানালা থেকে কোন কিছু ফেললে কোন জায়গায় ঠেকো না খেয়েই পড়বে গিয়ে হাজার ফুট নিচের পাথুরে উপত্যকায়। তারপর থেকে যদ্দূর চোখ যায় বন আর বন। চাঁদের আলোয় ওই বনকে মনে হল ঢেউ খেলানো উত্তাল সাগর। আসলে অত ওপর আর দূর থেকে ছোট বড় গাছের মাথাগুলোকেই ওরকম দেখাচ্ছে। ওই অদ্ভুত, ধূসর গাছের সাগরের বুক চিরে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে চকচকে রূপালী ফিতে। ওগুলো পাহাড়ী নদী। চাঁদের আলোয় ওদের সৌন্দর্য বেড়ে গেছে শতগুণ। সে-সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

বেশ কিছুক্ষণ সে-দৃশ্য দেখে জানালার কাছ থেকে সরে এসে অন্যান্য কক্ষগুলো ঘুরে দেখতে লাগলাম। প্রাসাদ-দুর্গের ভেতরে অজস্র ঘর আর তার দরজা। প্রায় সব ক'টা ঘরের দরজাতেই তালা মারা। জানালাগুলোতে গরাদ নেই, কিন্তু এমন জায়গায় যে তা গলে বাইরে বেরিয়ে নিচে নামা যাবে না। আর অত ওপর থেকে নিচে নামাটাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম লোকালয় থেকে বহুদূরে, নির্জন এক রহস্যময় প্রাসাদ-দুর্গে আসলে বন্দী করে রাখা হয়েছে

আমাকে। মিনা, সত্যি বলতে কি, ভয় পেয়েছি আমি, টের পাচ্ছি ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে আমাকে ঘিরে।

দুই

আমি বন্দী। ব্যাপারটা টের পাবার পরপরই একটা প্রচণ্ড ভয় গ্রাস করে ফেলল আমাকে। পাগলের মত সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। হাতের কাছে যে ক'টা দরজার সন্ধান পেলাম সব ক'টা ঠেলে ঠুলে দেখতে লাগলাম। কিন্তু বৃথা। এ দুর্গ থেকে বেরোবার কোন পথ খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ মনে হল এভাবে পাগলের মত ছুটাছুটি করে লাভ হবে না। মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হবে, খুঁটিয়ে দেখতে হবে প্রতিটি সম্ভাবনা। একমাত্র তাহলেই মুক্তি পাওয়ার কোন না কোন উপায় বের করে ফেলতে পারব।

এই সময় নিচে সদর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে বুঝলাম ফিরে এসেছেন কাউন্ট। দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে এসে দেখলাম আমার বিছানা গুছাচ্ছেন তিনি। এ বাড়িতে যে চাকর-বাকরের বালাই নেই এটা আরও স্পষ্ট হল আমার কাছে। স্পষ্ট হতেই আর একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল মনে। এই দুর্গে যদি আর কেউ না থেকে থাকে তাহলে সেদিন রাতে টমটম চালিয়ে এসেছিল কে? কাউন্ট নিজে? তাই যদি হয় তাহলে তাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল হিংস্র নেকড়ের দল। আতঙ্কে ঘাড়ের কাছটা শিরশির করে উঠল আমার। বিসট্রিজের লোকেরা সেজন্যেই বোধহয় আমার এখানে আসাটা ভাল চোখে দেখছিল না। আর কাউন্টের সম্পর্কে অলৌকিক কোন কথাবার্তা প্রচলিত থাকায়ই বোধহয় গলা থেকে ক্রুশ খুলে নিয়ে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন হোটেলের সেই ভদ্রমহিলা। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ধর্মের প্রতি কোন দিনই আমার তেমন বিশ্বাস নেই। কিন্তু আজ গলার ক্রুশটা স্পর্শ করে যেন কিছুটা সাহস সঞ্চয় করতে পারছি মনে।

এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে আমাকে। আমি যে বন্দী এবং কোন ব্যাপারে কাউন্টকে সন্দেহ করছি তা তাঁকে জানতে দেয়া যাবে না। যদ্দূর সম্ভব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেনে নেবার চেষ্টা করতে হবে তাঁর আসল পরিচয়।

হঠাৎ মধ্যরাতের প্রহর ঘোষণা করল কয়েকটা শেয়াল আর পেঁচা। এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুপুরীতে বসে, মধ্য রাতে শেয়াল আর পেঁচার ডাক হিম করে দেয় বুকের রক্ত সত্যি আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতে থাকে শরীর।

ঘর পরিষ্কারের কাজ শেষ হলে আমাকে নিয়ে পড়ার ঘরে এসে ঢুকলেন কাউন্ট। একথা-ওকথার মধ্যে দিয়ে ট্রানসিলভেনিয়ার প্রাচীন ইতিহাস এসে পড়ল। যে-ইতিহাস বলতে গিয়ে রীতিমত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কাউন্ট। সে-যুগের প্রত্যেকটি ঘটনা, বিশেষ করে যুদ্ধের বর্ণনা এমন ভাবে দিয়ে গেলেন যেন তিনি নিজে সে-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দেশের প্রতিটা বীরের সম্মানে সম্মানিত, তাদের গৌরবে তিনি গর্বিত, তাদের দুর্ভাগ্য যেন নিজেরই দুর্ভাগ্য। যখনই ওই মৃত্যুপুরী আর তার মারা যাওয়া লোকদের কথা উঠছে তখনি 'আমরা জেকলিরা' শব্দটা এমনভাবে ব্যবহার করছেন যেন কোন গর্বিত সম্রাট তাঁর বিলুপ্ত বংশ গৌরবের কথা বলছেন। তাঁর প্রাঞ্জল বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সমস্ত অতীত ইতিহাসটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল আমার। কথা বলতে বলতে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কাউন্ট। শেষ পর্যন্ত আর বসে থাকতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে বিশাল গোঁফের দু'প্রান্ত হাতের আঙুলে পাকাতে পাকাতে ঘরের ভেতরেই পায়চারি শুরু করলেন তিনি। তাঁর বর্ণনা করা ইতিহাস লিখতে গেলে পুরো একটা বই হয়ে যাবে, তাই তা আর লিখলাম না। ওদিকে ভোর হয়ে আসছে, মোরগ ডাকার শব্দ তাই প্রমাণ করছে। আশ্চর্য! গত দিনের মতই মোরগ ডাকার শব্দে চমকে উঠে তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কাউন্ট। কথাটা শুনলে হয়ত হাসবে, মিনা, তবু বলছি, কাউন্টের ব্যবহার হ্যামলেটের পিতার সেই প্রেতাত্মার মতই মনে হচ্ছে আমার কাছে।

১২ মে।

নিজেকে অকারণ দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে গতকাল সারাটা দুপুর বই-পত্র ঘেঁটেই কাটিয়েছি। অন্যান্য দিনের মতই সারাদিন কাউন্টের টিকির খোঁজও পাইনি এবং সন্ধ্যার পর ভূতের মত কোত্থেকে এসে উদয় হয়েছেন তিনি। এসেই জিজ্ঞেস করে বসলেন লণ্ডনের একাধিক আইনজীবীকে আমি তাঁর কাজে নিয়োগ করতে পারি কিনা। বললাম, তা করা যাবে, কিন্তু ঝামেলাই বাড়বে তাতে, কাজের তেমন সুবিধে হবে না। বুঝিয়ে বলতেই আমার সাথে একমত হলেন তিনি। কয়েক মিনিট চুপচাপ কি যেন ভেবে বললেন, 'ব্যস্ত মানুষ আমি। সবদিক একা সামলে উঠতে পারি না। ধরুন, নিউ ক্যাসেল ডারহাম, হারউইচ বা ডোভারের যে-কোন বন্দরে জাহাজে করে মাল পাঠাতে চাই আমি। কারও হাতে সে-দায়িত্ব দিয়ে কি নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব? পাওয়া যাবে তেমন কাউকে?'

'পয়সা দিলেই পাওয়া যাবে। তবে আমার মনে হয় বিদেশী কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে যে অঞ্চলে মাল পাঠাবেন সেখানকার কাউকে কাজটা দিলেই ভাল হবে।'

'আমার নির্দেশ অনুযায়ী চলবে সে?'

'টাকা পাবে আপনার কাছে, অথচ নির্দেশ মানবে না এটা কোন কথা হল নাকি?' সারা জীবন এক দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় একাকী জীবন যাপন করে বাইরের পৃথিবীতে মাল পাঠানর ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছেন কাউন্ট, ভেবে একটু অবাক লাগল আমার।

আমার উত্তরে খুশি হলেন কাউন্ট। বললেন, 'ভাল কথা, আপনি নিরাপদে আমার এখানে এসে পৌছেচেন, কথাটা আপনার বস্ মি. হকিন্সকে নিশ্চয়ই জানিয়েছেন?'

'কি করে জানালাম? এ পর্যন্ত দিন রাতের প্রতিটি মুহূর্ত তো এ প্রাসাদেই কাটালাম।'

আমার কথায় একটু ঝাঁঝ টের পেয়ে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে আমার কাঁধে মৃদু চাপ দিলেন কাউন্ট। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক্ষুণি লিখে দিন। লিখে দিন, আরও প্রায় মাসখানেক এখানে থাকছেন আপনি। আগামীকালই চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করব আমি।'

'মাসখানেক?' আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'তাই, মি. হারকার। অবশ্য যদি আপনার বলার কিছু না থাকে। আর থাকলেই বা কি? আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন আপনি, সেই সুবাদে ইচ্ছে করলে জোর করেও আপনাকে এখানে রেখে দিতে পারি আমি, তাই না?'

বুঝলাম, জোর করেও কোন লাভ নেই। আমি যেতে চাইলেও আমাকে যেতে দেবেন না কাউন্ট। কিন্তু তাঁর মতলবটা কি? আমাকে এখানে বন্দী করে রেখে কি লাভ তাঁর? আমি অসহায় এবং কাউন্টের হাতের মুঠোয়, ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই বোধহয় একটা চাপা উল্লাস ফুটে উঠল তাঁর চোখে-মুখে।

পকেট থেকে তিনটে সাদা কাগজ আর তিনটে খাম বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন কাউন্ট। সুন্দর বিদেশী স্ট্যাম্প আঁটা খাম। আমি হাত বাড়িয়ে কাগজ আর খামগুলো নিতেই বললেন কাউন্ট, 'চিঠিতে কুশল সংবাদ এবং বৈষয়িক বিষয় ছাড়া আর কিছু লিখবেন না। আপনি নিরাপদে আছেন জেনে খুব খুশি হবেন মি. হকিন্স, না?' কাউন্টের দিকে তাকিয়ে দেখলাম নিঃশব্দ চাপা হাসিতে ভরে গেছে তাঁর মুখ। লাল টুকটুকে ঠোঁটের দু'কোণ থেকে তীক্ষ্ণ দাঁত দুটো বেরিয়ে ভয়ঙ্কর কুৎসিত করে তুলেছে সে হাসিকে। হাসির সাহায্যেই বোধহয় আমাকে সাবধান করে দিতে চাইছেন কাউন্ট, বলতে চাইছেন—সাবধান, একটিও আজেবাজে কথা নয়! পরিষ্কার বুঝলাম কোন রকম চালাকি করে লাভ হবে না কিছু

মিনা, তোমাকে এবং মি. হকিন্সকে দুটো চিঠি লিখে চুপ করে বসে থাকলাম। নিজেও কয়েকটা চিঠি লিখলেন কাউন্ট। চুপচাপ বসে তাই দেখলাম। কাউন্টের লেখা শেষ হলে আমার চিঠি দুটোও তুলে নিলেন তিনি। তারপর লেখার সাজ-সরঞ্জাম সহ পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলাম সরঞ্জামগুলো আমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলছেন। টেবিলের ওপর খোলা পড়ে থাকা ওঁর চিঠিগুলোয় চট করে চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি। চিঠিগুলোর ঠিকানা যথাক্রমে—স্যামুয়েল এফ বিলিংটন, ৭নং ক্রিসেন্ট, হুইটবি; হের লুটনার, ভার্ণা; কটস অ্যাণ্ড কোং, লণ্ডন এবং একজন ব্যাঙ্ক অধিকর্তা হেরেন ক্লোপস্টক, বুদাপেস্ট। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চিঠির মুখ বন্ধ করা হয়নি। সবে খুলে দেখতে যাব, এমন সময় দেখলাম দরজার হাতল ঘুরছে। চট করে আগের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়লাম। নতুন একটা চিঠি হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন কাউন্ট, বোধহয় ও ঘরে বসে লিখে এনেছেন।

টেবিল থেকে চিঠিসুদ্ধ খামগুলো তুলে নিয়ে পাকা হাতে সেগুলোতে ডাক টিকেট লাগালেন কাউন্ট। লাগানো শেষ হলে বললেন, 'একটা ব্যাপারে কখনও সতর্ক করে দেয়া হয়নি আপনাকে। আপনাকে বার বার অনুরোধ করছি, আপনার নিজের ঘর ছাড়া প্রাসাদের আর কোন ঘরে রাতের বেলা ভুলেও ঘুমাতে যাবেন না। ঘুম পেলেই সোজা নিজের ঘরে চলে আসবেন। বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িত একটা অত্যন্ত পুরানো প্রাসাদ এটা। নিজের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে ঘুমালে হয়ত ভয়ঙ্কর আর বিশ্রী সব দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেতে পারেন। তাই আপনাকে সতর্ক করে দেয়া,' বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর হেঁয়ালিপূর্ণ কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। এখন যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাস করছি প্রাসাদের অন্য কোন ঘরে কি তার চেয়ে বেশি দুঃস্বপ্ন দেখব?

ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন—আমার মনে হয় আজেবাজে কথা বলে আমাকে ভয় দেখানর চেষ্টা করেছেন কাউন্ট, আসলে প্রাসাদের যে-কোন ঘরেই নিরাপদে ঘুমাতে পারি আমি। এখন থেকে ঘুমানর আগে ক্রুশটা যত্ন করে বালিশের নিচে রেখে দেব, এতে বোধহয় অলৌকিক কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাব আমি।

পড়ার ঘরে একাকী বসে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে মাঝরাত হয়ে গেল, শেয়াল আর পেঁচার ভৌতিক কর্কশ স্বরে ধ্যান ভাঙল আমার, কাউন্ট চলে গেছেন অনেকক্ষণ। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়েছিল শেয়াল আর পেঁচার ডাক। ওরা চুপ করে যেতেই দ্বিগুণ নিস্তব্ধ মনে হল চারদিক।

বিছানায় শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করেও ঘুম এল না। বিরক্ত হয়ে উঠে

পড়ে ঘরের বাইরের পাথরের সিঁড়িটার উপর এসে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ দিকটা স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে। আবছা আঁধারে দূরের বিস্তৃত পাহাড়গুলোকে রূপকথার দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। ওগুলোর নিচেই গভীর গিরিখাদ আরও রহস্যময় করে তুলেছে পাহাড়গুলোকে। দেখলেই ছমছম করে ওঠে গা। ভয়ঙ্কর সব অলৌকিক কল্পনা ভিড় করে আসে মনে। আমার কোন পাপের শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুপুরীতে এনে ফেলেছেন বুঝতে পারছি না।

দূরের অপরূপ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে নানান কথা ভাবছি, এমন সময় মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। রূপালী আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। নিমেষে চেহারা বদলে মাথায় রূপোর মুকুট পরে ফেলল দূরের বরফ ছাওয়া পাহাড়চূড়াগুলো। আরও রহস্যময় হয়ে পড়ল ওগুলোর আশপাশের গভীর গিরিখাদ। স্তব্ধ হয়ে প্রকৃতির এই দৃশ্যপট পরিবর্তন দেখছি, হঠাৎ মনে হল নিচের তলায়, বাঁ দিকে, কাউন্টের ঘরের ঠিক জানালার সামনে কি যেন নড়ছে। চট করে একপাশে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

গরাদশূন্য জানালা গলে আস্তে করে বেরিয়ে এল কাউন্টের মাথাটা। দূর থেকে ওঁর মুখ দেখা না গেলেও চিনতে পারলাম আমি। অবাক লাগল। গভীর রাতে এভাবে জানালা গলে বেরিয়ে আসছেন কেন কাউন্ট? কয়েক মুহূর্ত পরেই আমার অবাক ভাবটা গভীর আতঙ্কে পরিণত হল। বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল হৃৎপিণ্ডের গতি। জানালা গলে বেরিয়ে এসে নব্বই ডিগ্রী খাড়া মসৃণ দেয়াল বেয়ে টিকটিকির মত এদিকেই উঠে আসছেন কাউন্ট। বাতাসে বিশাল বাদুড়ের ডানার মত উড়ছে কালো আলখাল্লার দু'পাশ। ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? জোরে চিমটি কাটলাম গায়ে। ব্যথা লাগল, অর্থাৎ ঘুমোইনি। কাউন্ট কি মানুষরূপী কোন ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা? তাই যদি হয় তাহলে ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতিতে পড়েছি, সন্দেহ নেই। আতঙ্কে চিন্তাশক্তি লোপ পাচ্ছে আমার, টের পাচ্ছি চেতনা হারাতে চলেছি। কিন্তু এ-সময় তো চেতনা হারালে চলবে না···

১৫ মে।

কিছুটা উঠেই থেমে পড়লেন কাউন্ট। কি মনে করে নেমে যেতে শুরু করলেন নিচের দিকে। শ'খানেক ফুট নেমেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। কোন জানালা গলে বোধহয় ঢুকে পড়েছেন ভেতরে। ভাল করে দেখার জন্যে সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালাম, কিন্তু এতদূর থেকে বোঝা গেল না কিছু। প্রাসাদ ছেড়ে বোধহয় বাইরে কোথাও গেছেন কাউন্ট। প্রাসাদটা ঘুরে দেখার এই-ই সুযোগ। দ্রুত নিজের ঘরে গিয়ে বাতিটা নিয়ে ফিরে এলাম। তারপর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সিঁড়ি ধরে ধরে। ঢাকা বারান্দা আর ছোট বড় সিঁড়ি বেয়ে অজস্র গলি ঘুপচি

পেরিয়ে চললাম। কিন্তু একটা ঘরেও ঢুকতে পারলাম না। সব ক'টাতে তালা লাগানো। সম্প্রতি লাগানো হয়েছে তালাগুলো, তা একবার পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলাম। দু'একটা ছোটখাট কামরা অবশ্য খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, কিন্তু তাতে প্রাচীন আমলের জীর্ণ, ধূলি ধূসরিত কিছু আসবাবপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই।

হতাশ না হয়ে খুঁজতেই থাকলাম। শেষ পর্যন্ত প্রধান সিঁড়ি ধরে সবচেয়ে ওপরের তলায় উঠে একটা তালা-ছাড়া দরজা খুঁজে পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম এটাও বন্ধ, কিন্তু দরজার গায়ে জোরে একটা ধাক্কা দিতেই বেমক্কা ভাবে খুলে গেল দরজার পাল্লা। আসলে এ দরজাটায়ও তালা দেয়া ছিল, কিন্তু কি করে যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল প্রাচীন কব্জা। আমার ধাক্কায় ভেঙে পড়েছে ওগুলো। চাপ দিয়ে দরজার পাল্লাটা আর একটু ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

প্রাসাদের ডান দিকের একেবারে শেষ প্রান্তে এ ঘরটা। ঘরের বিশাল জানালার সামনে দাঁড়ালে প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে সারি সারি ঘরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এ ঘরে দাঁড়িয়ে আরও ভাল মত বুঝতে পারলাম প্রাসাদের অবস্থান। বিশাল একটা পাথুরে পাহাড়ের খাঁজ তিন দিক থেকে দুর্ভেদ্য দেয়ালের মত ঘিরে আছে প্রাসাদটাকে। আর এত উঁচুতে অবস্থিত এটা যে নিচ থেকে প্রাচীন কামানের গোলা বোধহয় এর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারত না। এবং সেভাবেই পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রাসাদের অবস্থান। পশ্চিমের বিস্তীর্ণ উপত্যকার ওপারে, এখান থেকে অনেক অনেক দূরে ধাপে ধাপে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ের চূড়া।

চাঁদনি রাতে প্রকৃতি দেখার জন্যেই যেন তৈরি হয়েছে এ ঘরটা। পর্দাশূন্য জানালার কাঁচের শার্সি ভেদ করে ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। পুরু ধুলোর আস্তরণ কাঁচের শার্সির স্বচ্ছতাকে ম্লান করে দিয়েছে অনেকখানি, তবু চাঁদের আলোয় আমার হাতের বাতিটাকে হাস্যকর রকম টিম টিমে দেখাচ্ছে।

চারদিকে বিরাজ করছে অখণ্ড নীরবতা। একটানা এই নিস্তব্ধতা পাগল করে দিতে পারে মানুষকে। তবু এই গা শিরশির করা নীরবতা কাউন্টের উপস্থিতির চাইতে অনেক ভাল মনে হল আমার কাছে। জানালার পাশেই চকচকে কালো রঙ করা মেহগনির ছোট্ট একটা টেবিল এবং চেয়ার। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে বাতিটা নামিয়ে রাখলাম টেবিলের ওপর। তারপর জানালার একপাশের শার্সি খুলে দিয়ে বসে পড়লাম টেবিলের পাশের চেয়ারটায়। হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা মেরে নিভিয়ে দিয়ে গেল বাতিটাকে। মনে হল শরীরের একটা অঙ্গ খসে পড়ল আমার, এই অলৌকিকতার রাজ্যে যেন বাতিটাই একমাত্র ভরসা ছিল। যদিও

আলোর কমতি নেই, তবু বাতিটার দিকে চেয়ে মনটাকে সতেজ রাখতে পারছিলাম।

অল্পক্ষণেই বাতির চিন্তা মুছে গেল মন থেকে। বাইরের অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম। আমি যে চেয়ারে বসে আছি হয়ত এখানে বসেই সামনের টেবিলে কাগজ পেতে প্রিয়তমের কাছে প্রেমের বার্তা পাঠাত কোন সুন্দরী। মিনা, সেই সুন্দরী কি সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল, এই চেয়ারে বসেই জীবনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা ডায়েরীতে লিখে তার প্রেমিকাকে জানাবার চেষ্টা করবে এক অসহায় অবস্থায় বন্দী হয়ে পড়া প্রেমিক-পুরুষ?

এখনও যে পাগল হয়ে যাইনি, সেজন্যে ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমার চোখের সামনে। এসব আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ভীষণ ঘুম পেল আমার। ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু'চোখ, কিছুতেই খুলে রাখতে পারছি না। এই সময়ই হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাউন্টের সতর্কবাণী। কিন্তু পাত্তা দিলাম না। এই পরিবেশে কাউন্টের কোন কথাই মানতে ইচ্ছে হল না আমার। ঘুম আসছে, আসুক। কাউন্টের স্মৃতি জড়ানো আমার ঘরের আবছা অন্ধকারে আর ফিরে যাব না আজ।

চেয়ারটা ছেড়ে ঘরের এক কোণে জানালার দিকে মুখ করে ফেলে রাখা একটা ইজিচেয়ারে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, হঠাৎ চমকে উঠে চোখ মেলে চাইলাম। অকস্মাৎ কোন অস্বাভাবিকতা ছাপ ফেলেছে আমার অবচেতন মনে। তাইতেই ঘুম ভেঙে গেছে।

টের পাচ্ছি, এখন আর একা নই আমি। আরও উজ্জ্বল হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। সে-আলোয় মেঝেতে বিছানো ধুলোর ওপর আমার পায়ের ছাপগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। ডান পাশে তাকাতেই চোখ পড়ল ওদের ওপর। রাজকীয় পোশাক পরা তিনজন সুন্দরী যুবতী বসে আছে তিনটে চেয়ারে। আমাকে চাইতে দেখেই উঠে দাঁড়াল তিন সুন্দরী। নাচের ছন্দে অতি ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। এগোতে এগোতেই ফিসফিস করে কি যেন আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। তিনজনের মধ্যে দু'জনের রঙ একটু চাপা। কাউন্টের মতই খাড়া নাক ওদের, রক্তাভ কিন্তু মর্মভেদী তীক্ষ্ণ চোখ। হলুদ জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করে জ্বলছে সে চোখ।

তৃতীয়জন অপূর্ব সুন্দরী। মাথায় সোনালী চুল, হরিণীর মত আয়ত চোখ; এই রমণীকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হল আমার। কিন্তু কোথায় তা মনে করতে পারলাম না। হয়ত এ চেহারারই অন্য কোন মেয়েকেও দেখে থাকতে পারি। আমার আর একটু কাছাকাছি এসে একসাথেই ফিক করে হাসল তিনজন।

জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করে উঠল ওদের আশ্চর্য সাদা দাঁত। লীলায়িত ছন্দে ক্রমেই এগিয়ে আসছে তিন যুবতী। আবার হাসল ওরা। ওদের রক্তলাল ঠোঁটে চুমু খাবার জন্যে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠতে লাগলাম। ইচ্ছে করল আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করে দিই ওদের পেলব কোমল দেহ। মিনা, আমি জানি এসব পড়লে দুঃখ পাবে তুমি, কিন্তু এ নির্মম সত্য এমনভাবে বলতে না পারলে এখনকার আমার মনের সে অনুভূতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাবে না তোমার কাছে। আবার একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল তিন যুবতী। হাসিটা কেমন যেন নিষ্প্রাণ মনে হল আমার কাছে। অপূর্ব সুন্দরী ওই যুবতীদের হাসির শব্দে মাধুর্যের লেশমাত্র নেই।

যেমনি শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমে গেল ওদের হাসি। অপেক্ষাকৃত অসুন্দরী মেয়ে দুটো তৃতীয় মেয়েটাকে বলল, 'তুমিই আগে যাও, সখী। ও তোমারই যোগ্য।'

গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটি, 'ও তরুণ, সুপুরুষ। আমাদের তিনজনকেই সন্তুষ্ট করতে পারবে ও।'

'তা পারবে। কিন্তু তোমার সাথেই ওকে মানাতে ভাল। অতএব আগে তুমিই যাও।'

ওদের কথাবার্তা শুনে ভয়ে, আশঙ্কায় কেঁপে উঠল আমার সমস্ত শরীর। ধীরে অতি ধীরে এগিয়ে এসে আমার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল মেয়েটি। কাঁধের কাছে স্পষ্ট অনুভব করলাম আশ্চর্য মিষ্টি উষ্ণ একটা স্পর্শ। উত্তপ্ত হয়ে দ্বিগুণ বেগে বইতে শুরু করল শরীরের রক্ত স্রোত। চোখ দুটো আধবোজা হয়ে এসেছে, মোহগ্রস্তের মত চেয়ে থাকলাম তরুণীর দিকে।

মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তরুণী। পেলব দুই বাহু দিয়ে মালার মত জড়িয়ে ধরল আমার গলা। কিন্তু আমার মনে হল বিশাল একটা সাপ আমার গলা পেঁচিয়ে ধরে ক্রমশ শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে যাচ্ছে আমাকে। তীব্র কামনায় হাঁ হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ। টুকটুকে লাল ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছে তীক্ষ্ণ সাদা দাঁত। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় এত কাছে থেকে পরিষ্কার দেখলাম কাউন্টের মত ওরও ঠোঁটের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে আছে দুটো তীক্ষ্ণ দাঁত। বুঝতে পারছি কিছু একটা করা উচিত, কিন্তু প্রচণ্ড অবসাদে চোখের পাতাও নড়াতে পারছি না। স্বপ্নের জগতে বাস করছি যেন আমি।

অতি ধীরে মেয়েটার মুখটা নেমে এল আমার মুখের কাছে, ঠোঁট দুটো আমার দু'ঠোঁটের ওপর। এ তো কামনা মত্ত কোন রূপসীর প্রণয় চুম্বন নয়! মনে হচ্ছে, কোন অজানা দানব দু'ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে ছিঁড়ে নিতে চাইছে আমার ঠোঁট

দুটো। কয়েক মুহূর্ত পর ওর ঠোঁট দুটো আমার চিবুক বেয়ে পিছলে নেমে চলল গলার কাছে। আগুনের মত তপ্ত নিঃশ্বাসে গলার চামড়া ঝলসে দিতে দিতে আমার রক্তনালী খুঁজতে শুরু করল মেয়েটার মুখ। একসময় রক্তনালী খুঁজে পেল সে। একমুহূর্ত দ্বিধা করেই দাঁত বসিয়ে দিতে লাগল সেখানে। কি ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না। আমার হাত-পা দড়ি দিয়ে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে কেউ। এক ভয়ঙ্কর পিশাচিনীর হাতে কি আজই আমার জীবনের শেষ? আমার শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলে রেখে যাবে ওরা? আতঙ্কে দুপদাপ লাফাতে লাফাতে বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে হৃৎপিণ্ডটা। তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো আরও, আরও বসে যাচ্ছে আমার ঘাড়ের পাশে রক্তনালীতে। এখুনি ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করল কেউ। প্রচণ্ড এক দমকা হাওয়া যেন ঝাপটা দিয়ে গেল আমার শরীরে। চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম সুন্দরী মেয়েটার ঠিক পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছেন কাউন্ট। বলিষ্ঠ হাতে রূপসীর গলাটা পেছন থেকে চেপে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন পেছনে। সমস্ত লাবণ্য মুছে গেছে রূপসীর মুখ থেকে। তীব্র আক্রোশে সাপের মত হিস হিস করে ফুঁসছে সে।

ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কাউন্টের চেহারা। দুটো জ্বলন্ত রুবীর মত লাগছে ওর চোখ দুটো। থমথমে মুখটা দেখে ওঁকে মানুষ বলে মনে হল না আমার কাছে। নরক থেকে যেন উঠে এসেছে সাক্ষাৎ শয়তান। কাউন্টের সে চেহারা জীবনে ভুলব না আমি।

আমার কাছ থেকে সুন্দরী মেয়েটাকে সরিয়ে নিয়েই ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কাউন্ট, একটা বাচ্চা যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা খেলার পুতুল। তারপর ঘুড়ে দাঁড়ালেন অন্য মেয়ে দুটোর দিকে। সেদিন অন্ধকার রাতে প্রাসাদে আসার সময় এমনিভাবেই ঘুরে দাঁড়াতে দেখেছিলাম কোচোয়ানকে। ক্রমশ আমার বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে, সেই কোচোয়ান কাউন্ট ছাড়া আর কেউ নয়।

মেয়ে দুটোর দিকে চেয়েই বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন কাউন্ট, 'হারামজাদীরা, সেদিন থেকেই না বলছি ও আমার, ওর ধারেকাছে আসবি না কেউ কখনও? কানে যায় না কথা? ফের যদি আমার আদেশ অমান্য করেছিস, সারা জীবন মাথা নিচু করে ওই পাহাড়ের চূড়ায় ঝুলিয়ে রাখব। এখন ভাগ এখান থেকে।'

কাউন্টের হুমকিতে বিন্দুমাত্র ভয় পেল না সুন্দরী মেয়েটি। খিল খিল করে হেসে বলল সে, 'আমরা তো তোমার শিকারের কোন ক্ষতি করতে আসিনি, ওর সাথে একটু প্রেম করতে এসেছিলাম মাত্র।'

সুন্দরীর কথায় সাহস ফিরে পেল বাকি দু'জন, হেসে উঠল ওরাও। বলল, 'হাসালে, সুন্দরী, কাউন্টের কাছে প্রেমের কথা বলছ? প্রেমের কি বোঝে কাউন্ট? জীবনে প্রেম করেছে সে কখনও?'

চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে একবার চাইলেন কাউন্ট। তারপর বললেন, 'করিনি? মনে থাকে না তোদের কিছু?'

'থাকে না আবার!' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কথাটা বলেই আবার হেসে উঠল সুন্দরী মেয়েটি।

'হয়েছে হয়েছে।'একটু যেন অপ্রস্তুত মনে হল কাউন্টকে। ওদের সান্ত্বনা দেবার সুরে বললেন, 'আগে আমার কাজ শেষ করি, তারপর সবাই মিলে চুটিয়ে প্রেম করিস ওর সাথে।'

'সে না হয় করব, কিন্তু এখন যে বড্ড খিদে পেয়েছে। খাবার এনেছ কিছু?' প্রশ্ন করল অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী দু'জনের একজন।

'এই যে,' বলে মেঝে থেকে একটা পোঁটলা তুলে মেয়েগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিলেন কাউন্ট।

পোঁটলাটা শূন্য থেকেই লুফে নিল একটা মেয়ে। সাথেসাথেই পোঁটলার ভেতর থেকে এল মানব শিশুর কান্না। ভুল শুনলাম? নাকি এত কাণ্ডের পর পাগল হয়ে গেছি আমি? প্রচণ্ড আতঙ্কে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম মেয়েগুলোর দিকে। পোঁটলাটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে ওরা। আবার পোঁটলার ভেতর থেকে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। আধশোয়া অবস্থা থেকে ওঠার চেষ্টা করলাম, কিন্তু জোর পেলাম না পায়ে। আমার ওঠার আগেই পোঁটলা সুদ্ধ শিশুটাকে নিয়ে জানালা গলে উধাও হয়ে গেল তিন ডাইনী। পলকের জন্যে চোখে পড়ল উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় গা ভাসিয়ে উড়ে গেল ওরা আকাশে।

ঠিক সেই মুহূর্তে চেতনা হারালাম আমি।

তিন

চোখ মেলতেই দেখলাম আমার ঘরে বিছানার ওপর শুয়ে আছি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তাহলে কাল রাতে যা দেখেছি সব স্বপ্ন, কিছুই সত্যি নয়! ঠিক এই সময় পরনের জামাকাপড়গুলোর দিকে নজর পড়তেই সন্দেহের নিরসন হল। এ কাপড় নিয়ে কখনও ঘুমোতে যাই না আমি। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই গলায় হাত দিলাম। দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আছে ক্ষতটা। কাল রাতে দেখা

সুন্দরী ডাইনীর দাঁতের ক্ষত। প্রথম থেকে শুরু করে শেষে জ্ঞান হারানো পর্যন্ত গত রাতের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার। আমি জ্ঞান হারাবার পর কাউন্টই এ ঘরে বয়ে এনেছেন আমাকে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম খোয়া যায়নি ডায়েরীটা। অর্থাৎ আমি যে ডায়েরী রাখি এটা এখনও জানেন না কাউন্ট। জানলে নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলতেন ওটা। স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম গত রাতের অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কথা।

১৮ মে

এসবের মানে আমাকে জানতেই হবে। তবে রাতের বেলা নয়, প্রকাশ্য দিবালোকে। বাথরুম সেরে, কাপড় বদলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরের তলার সেই ঘরে আসতেই দেখলাম দরজা বন্ধ। প্রাণপণ চেষ্টা করেও একচুল নড়াতে পারলাম না বন্ধ দরজার পাল্লা। বাইরে থেকে শেকল তোলা হয়নি। তাহলে নিশ্চয়ই ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছে। গতরাতে ভাল মতই লক্ষ্য করেছিলাম এ ঘরে এই একটা মাত্র দরজা। তাহলে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করার পর কোন পথে বেরোলেন কাউন্ট? সেই তিন ডাইনীর মত জানালা গলে উড়ে গেছেন? ব্যাপারটাকে আর স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না কিছুতেই। প্রতিজ্ঞা করলাম এ রহস্যের সমাধান করতেই হবে আমাকে।

১৯ মে।

পরিষ্কার বুঝতে পারছি ভয়ঙ্কর এক ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি আমি। গত রাতে আমাকে দিয়ে আরও তিনটে চিঠি লিখিয়ে নিয়েছেন কাউন্ট। প্রথমটায় লিখেছি—এখানের কাজ প্রায় শেষ, দিন কয়েকের মধ্যে বাড়ি ফিরছি। দ্বিতীয়টায়—আগামীকাল সকালেই প্রাসাদ-দুর্গ ছেড়ে রওনা হচ্ছি। আর তৃতীয়টায়—আমি বিসট্রিজে এসে পৌঁছেছি।

প্রতিবাদ করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কাউন্টের কথার প্রতিবাদ করা হবে পাগলামিরই নামান্তর। এখন ওঁর সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় আমি, বিরোধিতা করতে গেলেই রেগে গিয়ে যা খুশি করে বসতে পারেন। একমাত্র উপায় সুযোগের অপেক্ষা করা। অবশ্য সেরকম সুযোগ আর আমার জীবনে আসবে কিনা জানি না।

আমার সাথে আর আগের মত মন খুলে আলাপ করেন না কাউন্ট। গম্ভীর গলায় শুধু আদেশ করে যান আমাকে। তিনি ধরে নিয়েছেন তাঁর আদেশ মানতে আমি বাধ্য। চিঠি তিনটে লিখে শেষ করার পর ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'একই দিনের তারিখ দেব চিঠিগুলোতে?'

'না,' গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন কাউন্ট, 'এখানে নিয়মিত আসে না ডাক

পিয়ন। আপনার চিঠিগুলো আমার কাছে থাকল। সময় বুঝে পরপর পাঠিয়ে দেব ওগুলো,' মিনিট খানেক চুপ থেকে আবার বললেন তিনি, 'প্রথমটায় তারিখ দিন ১২ জুন, দ্বিতীয়টায় ১৯ জুন আর তৃতীয়টায় ২৯ জুন।

যাক তবু জানলাম আমার হাতে আর কতদিন সময় আছে! অর্থাৎ ২৯ জুন পর্যন্ত আমাকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছেন কাউন্ট।

২৮ মে।

কোত্থেকে যেন একদল জিপসী এসে তাঁবু গেড়েছে প্রাসাদ দুর্গের উঠানে। ভারি অদ্ভুত এই জিপসীদের ধরন-ধারণ। নিজেদের সমাজ, নিজেদের রীতিনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকে ওরা। নির্ভীক, দুঃসাহসী এই জাতটা আইনের ধারেকাছেও ঘেঁষে না, ওদের ইচ্ছে মাফিক কাজকারবার করে বেড়ায়।

জানালায় দাঁড়িয়ে আকার ইঙ্গিতে ইতোমধ্যেই ভাব জমিয়ে ফেলেছি আমি। বিচিত্র পদ্ধতিতে আমার ইঙ্গিতের উত্তরে সাড়া দিয়েছে ওরাও। ভাবছি, ওদের মাধ্যমেই বাইরের জগতে কয়েকটা চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করতে হবে আমাকে।

দ্রুত দুটো চিঠি লিখে ফেললাম। একটা মি. হকিন্সকে। চিঠিতে মিনার সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছি ওকে। দ্বিতীয়টা মিনার নামে। শর্টহ্যাণ্ডে আমার অসহায়তার কথা সবই জানিয়েছি তাকে। ভয় পেয়ে অনর্থ বাধিয়ে বসতে পারে ভেবে সে-রাতের ডাইনীদের ঘটনা বাদ দিয়েছি শুধু।

পকেট থেকে পয়সা বের করে চিঠি দুটো দিয়ে সেটা মুড়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলাম, ইঙ্গিতে জিপসী সর্দারকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, চিঠি দুটো ডাকে দিতে চাই আমি। কি বুঝল সে কে জানে, তবে চিঠি দুটো তুলে নিয়ে আমার উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে হ্যাটের ভেতর গুঁজে রাখল ওগুলো।

কাউন্ট এলেন সন্ধ্যার একটু পরে। শান্তভাবে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করলেন তিনি। মৃদু বিদ্রুপের স্বরে বললেন, 'জিপসী সর্দার দিয়েছে আমাকে চিঠি দুটো। একটা মি. হকিন্সকে লেখা, অবশ্যই আপনার হাতের, দ্বিতীয়টা মিনা মুর নামের এক মহিলাকে।' বলেই রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন কাউন্ট। আমার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আন্তরিক বন্ধুত্ব এবং আতিথেয়তার তাহলে এই প্রতিদান!' বলতে বলতে খাম দুটো জ্বলন্ত মোমের আগুনে তুলে ধরলেন তিনি। ধীরে ধীরে পুড়তে শুরু করল খাম দুটো। সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেদিকে চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'জানি, অন্যের চিঠি খোলা ঘোরতর অন্যায়, কিন্তু কি করব, মি. হারকার, নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই এতটা হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয় আমাকে।' বলতে বলতেই একটা নতুন খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন

তিনি, 'মিনা মুরের ঠিকানাটা আর একবার লিখে দিন এতে।'

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে কাউন্টের হাত থেকে খামটা নিয়ে তাতে ঠিকানা লিখে দিলাম। খামটা হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তারপরই আমার ঘরের দরজায় চাবি লাগানর শব্দ শুনে লাফ দিয়ে ছুটে গেলাম দরজার দিকে। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দরজা।

ঘন্টা দুয়েক পর আবার ফিরে এলেন কাউন্ট। একটানা সোফায় বসে থাকতে থাকতে একটু ঝিমুনি মত এসেছিল আমার। তাই কোন্‌দিক দিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছেন তিনি বুঝতে পারিনি। তাঁর পায়ের মৃদু শব্দে তন্দ্রা ছুটে যেতেই দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন কাউন্ট আমাকে চমকে উঠতে দেখেই বললেন, 'খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নাকি?'

'না, বসে থাকতে থাকতে...'

'হয়েছে, আর বসে থাকতে হবে না। সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। কয়েকটা বিশেষ জরুরী কাজে আমাকে এখুনি একটু বাইরে যেতে হচ্ছে, না হলে আপনার সাথে বসে গল্প করতাম।'

কোন কথা না বলে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়লাম গভীর ঘুমে। সবচেয়ে আশ্চর্য, এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও এমন গাঢ় ঘুম আমার এল কি করে।

৩০ মে।

নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল। চোখ খুলতেই কথাটা মনে হল আমার। তাই তো, প্রয়োজনের সময় কাগজ কোথায় পাব, কিছু কাগজ পকেটে রেখে দিলে হয় না? তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে স্যুটকেস খুললাম। খুলেই চক্ষুস্থির। কাগজ তো দূরের কথা, প্রাসাদের বাইরে বেরোনর উপযোগী জামাকাপড়, ওভারকোট, কম্বল এমনকি রেল গাইডটা পর্যন্ত স্যুটকেস থেকে উধাও। বজ্রাহতের মত সেদিকে চেয়ে বসে থাকলাম। আমার বাইরে যাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছেন কাউন্ট।

৭ জুন।

বিছানার এক কোণে চুপচাপ বসে বসে ভাবছি। ভোর হয়েছে একটু আগে। হঠাৎ প্রাসাদ-দুর্গের পাথর বাঁধানো বিশাল চত্বরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর চাবুকের তীক্ষ্ণ শব্দে চমকে উঠলাম। খুশিতে ছেয়ে গেল মনটা। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ছুটে গেলাম জানালার কাছে। আট ঘোড়ায় টানা বিশাল দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদ দুর্গের প্রাঙ্গণে। লম্বা চাবুক হাতে নিয়ে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কোচোয়ান দু'জন। মাথায় স্লোভাক হ্যাট, কোমরে কাঁটা মারা চামড়ার চওড়া বেল্ট, গায়ে ভেড়ার লোমের তৈরি নোংরা জামা আর পায়ে হাঁটু

পর্যন্ত উঁচু ভারী বুট পরা কোচোয়ান দু'জনকে দেখেই ওদের সাথে কথা বলার জন্যে দরজার দিকে ছুটলাম। কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিয়ে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল আমার। বাইরে থেকে বন্ধ দরজাটা।

ছুটে ফিরে এলাম জানালার কাছে। চেঁচিয়ে ডাকলাম কোচোয়ান দু'জনকে। চমকে উঠে মাথা তুলে আমার দিকে চাইল ওরা। সেই মুহূর্তে কোত্থেকে এসে উদয় হল সেই জিপসী সর্দার, ফিসফিসিয়ে ওদের কানে কানে বলল কিছু। জিপসী সর্দারের কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল ওরা। হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা।

আমার দিকে আর ভুলেও ফিরে চাইল না কোচোয়ান দু'জন। নিজের কাজে মন দিল ওরা। মোটা দড়ির হাতল লাগানো চৌকো মতন বেশ বড় বড় কয়েকটা কাঠের বাক্স ওরা নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর সেগুলো নিয়ে পর পর সাজিয়ে রাখল প্রাঙ্গণের এক কোণে। বাক্স বয়ে নিয়ে যাবার ভঙ্গি দেখে আর পাথুরে প্রাঙ্গণে নামিয়ে রাখার সময় যে শব্দ হল তা শুনে আন্দাজ করলাম বাক্সগুলো খালি। কাজ শেষ হতেই কোচোয়ানদের ভাড়া মিটিয়ে দিল জিপসী সর্দার। বোধহয় সংস্কারের বশেই পয়সার ওপর থু থু ছিটিয়ে পকেটে পুরে খুশি মনে গাড়িতে ফিরে গেল কোচোয়ানেরা। তারপরই হিশিয়ে উঠল ওদের হাতের চাবুক। চলে গেল কোচোয়ানেরা, আর একাকী বসে বসে নিজের কপাল ধিক্কার দিতে থাকলাম আমি।

২৪ জুন, শেষ রাত।

কেন যেন একটু তাড়াতাড়িই নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন কাউন্ট। তিনি চলে যাবার পরপরই দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম দক্ষিণের সেই ঘরে। নজর রাখতে হবে কাউন্টের ওপর।

গত ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছে আমার অজান্তে প্রাসাদের কোথায় যেন ঘটে চলেছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু। জিপসীদের সেই দলটাকে আর দেখা যায় না, কিন্তু প্রাসাদের ভেতরেই কোত্থেকে যেন ভেসে আসে শাবল, কোদাল আর বেলচার অস্পষ্ট ঠুং ঠাং শব্দ। প্রাসাদের ভেতরেই কি কিছু করছে জিপসীরা?

বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি দক্ষিণের ঘরের জানালার সামনে। হঠাৎ কাউন্টের ঘরের জানালার দিকে নজর পড়তেই চট করে সরে দাঁড়ালাম একপাশে। জানালা গলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছেন কাউন্ট। গায়ে আমার স্যুটকেস থেকে চুরি যাওয়া বেড়ানর পোশাক, কাঁধে একটা থলে, এটাতেই বাচ্চাটাকে ভরে সেদিন রাতে ডাইনীগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন কাউন্ট। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আবার কাছাকাছি গ্রাম বা শহর থেকে বাচ্চা চুরি করতে যাচ্ছেন তিনি, আর তারই

শয়তানির জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী হতে হবে আমাকেই। কেউ দেখে ফেললে মনে করবে আমিই চুরি করেছি বাচ্চা। ঘৃণায় ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে লাগল আমার সর্ব শরীর। কিন্তু মনে মনে জ্বলে মরা ছাড়া করার কিছু নেই। এমন অসহায় ভাবে বন্দী থেকে এ ছাড়া আর করবই বা কি?

কাউন্ট ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করব, স্থির করলাম। জানালার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপচাপ। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় হঠাৎ মনে হল ক্ষুদ্র কণিকার মত কি যেন সব উড়ছে বাতাসে। কি ওগুলো? ভাল করে দেখার জন্যে আর একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। অকস্মাৎ দূরের উপত্যকার দিক থেকে ভেসে এল কুকুরের হিংস্র চিৎকার। ক্রমেই বাড়ছে সে চিৎকার, সেই সাথে বাড়ছে বাতাসে ভাসমান চকচকে অদ্ভুত কণাগুলোর ঘূর্ণন। ঘুমে দু'চোখ বুজে আসতে চাইছে আমার, জোর করে টেনে খুলে রাখতে হচ্ছে চোখের পাতা। ওই কুকুরের ডাক, অদ্ভুত কণিকা আর এই ঘুমের সাথে কি কোন সম্পর্ক আছে? আরও কেটে গেল সময়। চোখের সামনে স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করেছে এখন কণিকাগুলো। বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল আমার গলা থেকে। কণিকাগুলো মিলিয়ে গেছে, তার জায়গায় ভাসছে তিনটে নারী-মূর্তি। সেদিনকার সেই তিন ডাইনী। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের কাছের লোম। একছুটে পালিয়ে এলাম নিজের ঘরে।

আরও প্রায় ঘন্টা দু'য়েক পেরিয়ে যাবার পর কাউন্টের ঘর থেকে ভেসে আসা একটা শব্দে স্তব্ধ হয়ে যেতে চাইল আমার হৃৎপিণ্ডের গতি। হিমেল হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসছে মানব শিশুর কান্না। কয়েক মুহূর্ত চেঁচিয়েই হঠাৎ থেমে গেল বাচ্চাটার চিৎকার, যেন গলা টিপে ধরে থামিয়ে দিল কেউ ওকে। আর সহ্য করতে পারলাম না। এখনই একটা কিছু করতে হবে ওই কাউন্ট নামক পিশাচের বিরুদ্ধে। প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে গেলাম দরজার দিকে। কাঁধ দিয়ে একটানা ধাক্কা দিয়ে চললাম দরজার গায়ে। কিন্তু ভারী মেহগনি কাঠের দরজা নড়ল না একচুল।

ঠিক সেই সময় প্রাঙ্গণের দিক থেকে ভেসে এল কোন নারীর বুকফাটা ক্রন্দন। একলাফে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। লোহার বিশাল কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। এলোমেলো মাথার চুল, গায়ের কাপড় এখানে ওখানে ছেঁড়া, বোধহয় পাগলিনীর মত ছুটে আসতে গিয়েই এ-অবস্থা হয়েছে ওর। কপাটের গায়ে মাথা কুটতে কুটতে বিলাপ করছে সে। হঠাৎ জানালার কাছে আমাকে দেখেই জ্বলে উঠল মহিলার দুই চোখ। তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দে, ফিরিয়ে দে। শয়তান!' বলেই আবার করুণ বিলাপে ভেঙে পড়ল মহিলা। তার করুণ চিৎকার শুনে অসহ্য বেদনায় বুকের ভেতরটা টনটন

করে উঠল আমার।

হঠাৎ মাথার ওপরে, বোধহয় প্রাসাদের ছাত থেকে ভেসে এল কাউন্টের ভয়ঙ্কর রুক্ষ, কর্কশ চিৎকার। কাকে যেন ডাকছে সে। পরমুহূর্তেই তার ডাকের সাড়া দিয়ে চারদিক থেকে হিংস্র গর্জন করে উঠল হাজার হাজার নেকড়ে। একটু পরেই চোখে পড়ল উপত্যকার দিক থেকে ছুটে আসছে নেকড়ের দল। সাথে সাথে ঘন মেঘে ঢেকে গেল চাঁদ। অন্ধকারে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে হাজার হাজার রক্তচক্ষু। বিদ্যুতের মত ছুটে এসে হতভাগিনী মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নেকড়ের দল। কয়েক মুহূর্ত পরেই থেমে গেল মায়ের বিলাপ। নিকষ কালো অন্ধকারে চোখে না পড়লেও নেকড়েদের হুটোপুটিতে বুঝলাম মহিলাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে শয়তানের দল। কয়েক মিনিট পরই ডাকতে ডাকতে আবার উপত্যকার দিকে ফিরে গেল নেকড়েগুলো। হা ঈশ্বর, ভয়ঙ্কর এই মৃত্যুপুরীতে এসে এ-ও দেখতে হল আমাকে!

২৫ জুন, ভোর।

সূর্য উঠছে। সারাটা রাত অসহ্য আতঙ্কের ভেতর কাটিয়ে ওই সূর্যকে ঈশ্বর প্রেরিত দেবতা বলে মনে হল আমার কাছে। সমস্ত ভয়, সমস্ত আতঙ্ক আমার মন থেকে ধুয়েমুছে নিয়ে গেল ওই উজ্জ্বল সূর্যালোক। শুধু আজই নয়, এ-প্রাসাদে আসা অবধি সূর্য ওঠা মাত্রই আস্তে আস্তে ভয় কেটে যেতে থাকে আমার মন থেকে। দিনের স্বচ্ছ আলোয় একটু একটু করে ফিরে পাই হারানো সাহস। সাঁঝ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়ের দোদুল দোলায় দুলতে থাকে মন, সিঁটিয়ে আসতে থাকে হাত-পা।

ইতোমধ্যেই দুটো চিঠি ডাকে ফেলা হয়েছে। বাকি রয়েছে একটা। ভয়ঙ্কর বিপদে আছি। আমার মাথার ওপর ঝুলছে মৃত্যুর খাঁড়া, যে-কোন সময় নেমে আসতে পারে সেটা। কিন্তু কিভাবে আসবে আমার মৃত্যুদূত, কিভাবে মরব আমি?

বাঁচতে হলে মাথাটা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন। গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলোকে তলিয়ে দেখতে শুরু করলাম। একটি জিনিস খেয়াল করেছি, ভয়ঙ্কর যা কিছু ঘটছে সব রাতের বেলায়। আর একটা জিনিস, এ-পর্যন্ত দিনের বেলায় কাউন্টের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি কখনও। বোধহয় সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে সে তখন জেগে ওঠে, আর সবার জেগে ওঠার সময় সে ঘুমোতে যায়। তাহলে যা কিছু করার, দিনের বেলায় করতে হবে আমাকে। কোনমতে কাউন্টের ঘরে একবার ঢুকতে পারলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু কিভাবে ঢোকা যায়? সব যে তালা বন্ধ।

অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করে ফেললাম। কাজটায় বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই। জানালা গলে কয়েকবারই

কাউন্টকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি, সে-পথে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। মনস্থির করে নিয়ে বেরিয়েই পড়লাম শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ি বেয়ে দক্ষিণের ঘরে এসে পৌছুলাম। ঘরের সামনে থেকে পাথরের এবড়োখেবড়ো একটা সরু কার্নিস সোজা চলে গেছে কাউন্টের ঘরের কাছে দিয়ে। পা থেকে জুতো খুলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে এগোতে শুরু করলাম কার্নিস বেয়ে। চলার পথে দেয়ালের মাঝেমধ্যে পলেস্তারা খসে গিয়ে ইঁটের পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। চলতে চলতে হঠাৎ একবার নিচের দিকে চোখ পড়তেই ঘুরে উঠল মাথাটা, তবু থামলাম না। কারণ এমনিতেও দু'দিন পরেই মরতে হবে আমাকে, তারচেয়ে বরং একবার চেষ্টা করেই মরা যাক। বার কয়েক পা ফসকে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনমতে এসে পৌছুলাম কাউন্টের ঘরের জানালার সামনে। জানালার কাঁচের শার্সি লাগানো পাল্লা দুটোয় ঠেলা দিতেই মসৃণভাবে খুলে গেল ওগুলো।

কোনরকমে প্রচণ্ড উত্তেজনা দমন করে জানালা টপকে ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতরে। কাউন্ট নেই ঘরে। ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করলাম ঘরটা। প্রাসাদের ওপরের তলার ঘরগুলোর মত এ-ঘরটাও প্রাচীন আমলের আসবাবপত্রে সাজানো। বহুদিন অব্যবহৃত থাকায় ওগুলোর উপর পুরো ধুলোর আস্তরণ জমেছে। ঘরের কোণে এক জায়গায় প্রায় তিনশো বছর আগের বৃটিশ, রোম, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, গ্রীক আর তুরস্কের স্বর্ণমুদ্রা স্তূপাকারে ফেলে রাখা হয়েছে। এছাড়া আছে অজস্র মূল্যবান সোনার গহনাপত্র। এগুলোর ওপরেও পুরু ধুলোর স্তর। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা ভারী দরজা। জানি বাইরে থেকে তালা মারা আছে দরজায়, তবু একবার ঠেলে দেখলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল দরজাটা। তালা দেয়া হয়নি দরজায়। বোধহয় ভুলে গেছেন কাউন্ট।

দরজার সামনেই ছোট্ট একফালি বারান্দা। বারান্দার একপ্রান্ত থেকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচে। অতি সতর্ক পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললাম। যতই নিচে নামছি ততই গ্রাস করছে আমাকে নিকষ কালো অন্ধকার। কিছুক্ষণ থেকেই একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধও নাকে এসে লাগছে। মাঝে মাঝে অবশ্য পাথরের জাফরি দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে ভেতরে, কিন্তু এত অন্ধকারের কিছুই দূর করতে পারছে না সে-আলো। চলতে চলতে আর একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। সদ্য খোঁড়া মাটির বিশ্রী সোঁদা গন্ধ, বন্ধ বাতাসে থমথম করছে। যতোই এগোচ্ছি ততোই তীব্র হয়ে উঠছে গন্ধটা।

সিঁড়ির শেষ মোড়টা ঘুরতেই আবছা আলো চোখে পড়ল। সিঁড়ির শেষ মাথায় দরজাটা খোলা। দরজা পেরিয়ে একটা চ্যাপেলের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। গির্জা

সংলগ্ন মাটির নিচের এই ঘরটাকে নিঃসন্দেহে এক সময়ে পারিবারিক কবরখানা হিসেবে ব্যবহার করা হত। ওপরদিকে তাকিয়ে দেখলাম পলেস্তারা খসে পড়েছে ছাদের। পরপর দু'সারি কফিন সাজানো আছে নিচে। সারিগুলোর মাঝখান থেকে গভীর করে মাটি খুঁড়ে বড় বড় বাক্সে ভরা হয়েছে। দেখেই চিনলাম, স্লোভাকদের আনা সেই বাক্স এগুলো।

দুরু দুরু বুকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম সেই প্রাচীন কবরখানা। আবছা আলো-আঁধারিতে ভীষণ ভয় করতে লাগল, তবু সাহস করে এগিয়ে গেলাম কফিনগুলোর দিকে। ঈশ্বরের নাম নিয়ে ডালা খুললাম প্রথম কফিনটার। ভেতরে চেয়েই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। শুধু মাটি দিয়ে ভর্তি কফিনটা। পরপর দুটো কফিনের ডালা খুলে একই ফল পেলাম। এখন আর ভয় করছে না ডালা খুলতে। কিন্তু ভয় পেলাম তৃতীয় কফিনটার ডালা খুলেই এবং এত ভয় জীবনে কখনও পাইনি। ঘাড় থেকে মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নিচের দিকে নেমে গেল ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত। সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল ঘাড়ের লোম। সোজা আমার দিকে তাকিয়ে মাটি ভর্তি বাক্সের মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে আছেন কাউন্ট ড্রাকুলা।

ওঁর বিস্ফারিত চোখের মণি দুটো পাথরের মত নিথর, কিন্তু মড়ার মত নিষ্প্রভ নয়। জীবন্ত মানুষের মত সজীব গাল, রক্তলাল পুষ্ট দুটো ঠোঁট। কাউন্ট কি ঘুমিয়ে আছেন? কাঁপা কাঁপা হাতে ছুঁয়ে দেখলাম ওঁকে। বরফের মত ঠাণ্ডা শরীরে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই! সদর দরজার চাবিটা পাওয়া যাবে কাউন্টের পকেটে, ভেবে ওঁর পকেটে হাত দিতে যেয়েই চমকে উঠলাম। মনে হল তীব্র আক্রোশে যেন ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল ওঁর চোখদুটো।

চাবি খোঁজা আর হল না। সে নিথর চোখের তীব্র চাহনিতে আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল আমার। ছিটকে কফিনটার কাছ থেকে সরে এসে পড়িমরি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। আমার ছুটন্ত পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল সেই বদ্ধ জায়গায়। আর সেই শব্দ শুনে আমি ভাবলাম পেছন পেছন আমাকে তাড়া করে আসছেন কাউন্ট।

এভাবেই ছুটতে ছুটতে কাউন্টের ঘরে এসে ঢুকলাম। সেখান থেকে জানালা গলে কার্নিস এবং তারপর নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকেই নিজেকে ছুঁড়ে দিলাম বিছানায় বালিশের তলা থেকে টান মেরে বের করে আনলাম ক্রুশটা। যে কাজ মন থেকে কোনদিন করিনি, তাই করে বসলাম আজ। ক্রুশটা ঝুলিয়ে নিলাম গলায়।

২৯ জুন।

দক্ষিণের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আজ আবার পোশাক পরে জানালা গলে বেরিয়ে যেতে দেখলাম কাউন্টকে। টিকটিকির মত বুকে হেঁটে দেয়াল বেয়ে সে নেমে যাবার সময় হাতটা নিশপিশ করছিল আমার। এই মুহূর্তে যদি একটা বন্দুক থাকত আমার হাতে তাহলে আজই একহাত দেখে নিতে পারতাম তাঁকে। অবশ্য পারতাম কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার মনে। তিন ডাইনীর সাথে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে আজ আর বসে থাকলাম না এই ঘরে, নিজের কামরায় ফিরে এলাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ঘুম ভাঙল কাউন্টের ডাকে। কোন প্রকার ভণিতা না করে সোজা-সাপটা রায় দিল সে, 'আগামীকাল ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাচ্ছেন আপনি। অতএব আপনার সাথে আর দেখা হচ্ছে না আমার। আপনার যাবার সময়ও হাজির থাকতে পারব না আমি, তবে তাতে কোন অসুবিধে হবে না। ভোরে জিপসীরা এসে শ্লোভাক কোচোয়ানদের গাড়িতে কয়েকটা কাঠের বাক্স তুলে দেবে। ওরা চলে যাবার পর আমার ব্যক্তিগত ফিটন বোর্গো গিরিপথ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আপনাকে। সেখানে বুকোভিনা থেকে আসা কোন গাড়ি ধরে নিশ্চিন্তে পৌঁছে যেতে পারবেন বিসট্রিজে।

'তবে তার আগে কাউন্ট ড্রাকলার প্রাসাদ সম্পর্কে আপনার আরও বিস্তারিত কিছু জেনে যাওয়া দরকার। আজ রাতেই তা জানতে পারবেন এবং কানে শুনে নয়, স্বচক্ষে দেখে।'

কাউন্টের কথার ভঙ্গিতে রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল আমার। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তোর শয়তানি দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আর আমার নেই। আজই, এই মুহূর্তে এই অভিশপ্ত প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে চাই আমি।'

বিন্দুমাত্র রাগ প্রকাশ পেল না কাউন্টের চেহারায়। শান্ত স্বরে বলল সে, 'এখন, এই রাতের বেলা গাড়ি পাবেন কোথায়?'

'চুলোয় যাক গাড়ি। হেঁটেই যেতে পারব আমি।'

কুৎসিত হাসিতে ভরে গেল কাউন্টের মুখ, 'আপনার জিনিসপত্র?'

'তোকে দান করে গেলাম, হারামজাদা!'

'ভাল। তাহলে আর দেরি করে লাভ কি? চলুন, গেটের বাইরে এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এভাবে বিদায় নিলে মনে ভীষণ ব্যথা পাব আমি।'

এত সহজে আমাকে রেহাই দেবে কাউন্ট ড্রাকুলা ভাবতেও পারিনি। একমুহূর্ত দ্বিধা না করে উঠে দাঁড়ালাম। টেবিল থেকে বাতিটা তুলে নিয়ে রওনা দিল কাউন্ট। আমিও তার পিছু পিছু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। লম্বা লম্বা পা ফেলে

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল কাউন্ট। তাকে অনুসরণ করে চললাম আমি। নিচে নেমে এসে সদর দরজার কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল কাউন্ট, তার সাথে সাথে আমিও।

কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল কাউন্ট, তারপর বলল, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

শুনতে পেয়েছি আমি। হিংস্র চাপা গর্জন করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে হাজার হাজার নেকড়ে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাঁধ ভাঙা বন্যার মত বাইরে থেকে গেটের ওপর এসে আছড়ে পড়ল ওরা। আরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেকড়েগুলোর হাঁক ডাক শুনল কাউন্ট, তারপর নির্দ্বিধায় এগিয়ে গিয়ে খুলে ফেলল গেটের ভারী লোহার খিল।

ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ভারী লোহার দরজা। আরও উত্তাল হয়ে উঠেছে নেকড়ের গর্জন। দরজার ফাঁক দিয়ে থাবা ঢুকিয়ে দিয়েছে কয়েকটা নেকড়ে। আর মাত্র আধ সেকেণ্ড, তারপরই আমাদের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে জানোয়ারগুলো। পরিষ্কার বুঝলাম কাউন্টের বিরোধিতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটু একটু করে খুলেই চলেছে দরজা। দরজার সামনে পাথরের মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কাউন্ট। মাথা দেখা যাচ্ছে নেকড়েগুলোর। কাউন্টকে দেখামাত্র নিমেষে যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল নেকড়ের দল। এক ইঞ্চি এগোল না আর ওরা।

আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল কাউন্ট, 'যাবেন? যান, গেট তো খোলাই আছে।'

চকিতে বাচ্চা-হারা মায়ের পরিণতি ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। আমি কাউন্টকে পার হয়ে যাওয়া মাত্র টেনে ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে নেকড়ের দল। মনে মনে প্রচণ্ড ভয় পেলেও যথাসম্ভব শান্তভাবেই বললাম, 'না, কাউন্ট, এখন এতরাতে আর যাব না। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

'সেই ভাল,' বলে দরজাটা বন্ধ করে দিল কাউন্ট। সঙ্গে সঙ্গে আবার গর্জন করে উঠল নেকড়ের দল, আওয়াজ শুনে বুঝলাম ফিরে যাচ্ছে ওরা।

ভগ্ন হৃদয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। হতাশা আর ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে সর্বাঙ্গ। জামা-কাপড় পালটে শুতে যাব এমন সময় দরজার ওপাশে চাপা ফিসফিসানি শুনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে কান পাতলাম দরজার গায়ে। কাকে যেন বলছে কাউন্ট, 'আর একটা দিন মাত্র ধৈর্য ধরো। আগামীকাল রাতেই ওকে পাবে তোমরা।'

কাউন্টের কথা শেষ হবার পরপরই একাধিক নারীকণ্ঠের খিল খিল হাসি শুনে চমকে উঠলাম। পরিষ্কার বুঝলাম এ সেই তিন ডাইনী। রাগে তখন হিতাহিত

জ্ঞানশূন্য আমি। দেখাই যাক হারামজাদীরা কি করে আমার! ঝটকা মেরে খুলে ফেললাম দরজাটা। ঠিক দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। আমাকে দেখেই আবার হেসে উঠল ডাইনীরা। হাসি থামলে সুন্দরী মেয়েটা বলল, 'আর একটা দিন মাত্র অপেক্ষা করো, প্রিয়তম। কালই আমাদের মধুর সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারবে তুমি,' বলেই চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

বুঝতে পারলাম আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আছে আমার আয়ু। ক্রুশটাকে শক্ত করে চেপে ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলাম।

৩০ জুন।

ঘুম ভাঙতেই উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালাম। পুব আকাশে মেঘের বুকে সবে রঙের ছোপ লাগতে শুরু করেছে। এদিক-ওদিক থেকে কানে এসে বাজছে মোরগের ডাক। ভোর বেলা কর্কশ ডাকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় বলে চিরদিন মোরগকে অভিশাপ দিয়ে এসেছি আমি, আজ কিন্তু সে-ডাক মধুবর্ষণ করল আমার কানে। কারণ আপাতত নিরাপদ আমি। আঁধারের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অভিশপ্ত ডেরায় ফিরে গিয়েছে সমস্ত রক্তলোভী প্রেতাত্মার দল। পালাতে হলে এই সুযোগ।

কাল রাতেই দেখেছিলাম গেটের দরজায় তালা দেয়া নেই। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে গেটের কাছে পৌছে দু'হাত দিয়ে টেনে খুলে ফেললাম ভারী লোহার খিল। আনন্দে দুলে উঠেছে বুক। যাক শেষ পর্যন্ত পালাতে পারব তাহলে। দু'হাত দিয়ে ধাক্কা দিলাম দরজার পাল্লায়। খুলল না। জোরে, আরও জোরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলতে শুরু করলাম। কিন্তু একচুল নড়ল না কপাট। তালা ছাড়া কি করে আটকে আছে কপাটটা বুঝতে পারলাম না। কারণটা বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। যে-করেই হোক আমাকে খুলতেই হবে ওই দরজা।

খুঁজতে খুঁজতে কপাটের গায়ে একটা ছিদ্র চোখে পড়ল, চাবির ছিদ্র। দরজা খুলছে না, তার মানে তালা দিয়ে দিয়েছে কাউন্ট। তালা যখন আছে, চাবিও নিশ্চয় আছে। যেমন করেই হোক সে চাবি খুঁজে বের করতেই হবে আমাকে। দেয়ালের কার্নিস বেয়ে আগের মত কাউন্টের ঘরে এসে ঢুকলাম। যা ভেবেছিলাম, কাউন্ট নেই ঘরে। একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে খুঁজতে শুরু করলাম। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে-ঘরে পাওয়া গেল না চাবি। হয়ত কাউন্টের পকেটেই আছে ওটা। পিশাচটাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানা আছে আমার। মনস্থির করে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললাম কবরখানার দিকে।

আগের জায়গায়ই পাওয়া গেল বড় কাঠের বাক্সটা। দাঁতে দাঁত চেপে সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়ে তুলে ফেললাম বাক্সের ডালা। মনে মনে প্রস্তুত থাকা

সত্ত্বেও ভয় পেলাম। চেহারা পালটে গেছে কাউন্টের। এ কি করে সম্ভব! নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। অর্ধেক বয়স যেন কমে গেছে কাউন্টের। ধবধবে সাদা গোঁফের বেশির ভাগই কালো হয়ে এসেছে। ভাঁজ পড়া কপাল আর গালের চামড়ায় এখন আর তেমন ভাঁজ দেখা যাচ্ছে না। সবচেয়ে আশ্চর্য, ঠোঁটের এক কোণ থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে লাল টুকটুকে রক্তের একটা ধারা। যেন অল্প আগে রক্ত পান করে এসেছে পিশাচটা।

আরও উজ্জ্বল, আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওর চোখ দুটো। আজ আর সে-চোখকে ভয় পেলাম না আমি। সোজা হাত ঢুকিয়ে দিলাম কাউন্টের জামার পকেটে। নেই চাবি। এ পকেট ও পকেট, সমস্ত পকেট খুঁজেও পাওয়া গেল না চাবি। কাউন্টের চোখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই ঘৃণায় রি রি করে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। কুৎসিত হাসিতে বিকৃত হয়ে রয়েছে ওর মুখ-চোখ। আমি চাবি খুঁজে না পাওয়াতে যেন দারুণ মজা পাচ্ছে ব্যাটা। রাগে আগুন ধরে গেল যেন আমার শরীরে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বাক্সটার পাশেই মাটিতে পড়ে থাকা একটা শাবল তুলে নিয়ে ধাঁই করে বসিয়ে দিলাম শয়তানটার মাথায়। সাধারণ মানুষের মাথা হলে ওই এক বাড়িতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত, কিন্তু কিচ্ছু হল না ওর। দ্বিগুণ মজা পেয়ে নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল যেন ওর মুখ-চোখ, দু'ঠোঁটের কোণ ঠেলে বেরিয়ে এল গজদন্ত দুটো। প্রচণ্ড বিস্ময়ে আমার হাত থেকে খসে পড়ে গেল শাবলটা। আর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল সেই মুহূর্তে। দড়াম করে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল বাক্সের ডালা।

কি করা যায় এখন? সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকলাম। হঠাৎ কানে এল পাথুরে মেঝেতে চাকার ঘড়ঘড়ানি আর চাবুকের বাতাস কাটার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। চমকে উঠলাম। নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে জিপসীরা। সদর দরজা খুলে নিশ্চয়ই ভেতরে এসে ঢুকবে ওরা এখন।

মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে এলাম কবরখানা থেকে। পাগলের মত অন্ধকার ঢাকা বারান্দা, ঘোরানো সিঁড়ি, কাউন্টের ঘরের জানালা, দেয়ালের গায়ের পাথরের কার্নিস আর দক্ষিণের ঘরের জানালা ডিঙিয়ে প্রাসাদের নিচে নামার প্রধান সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছুলাম। একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে হাঁপাতে হাঁপাতে এক এক লাফে তিন-চারটে করে সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে কোনমতে নিচে এসে নামলাম। সদর দরজার কাছে এসে দেখলাম দরজা আগের মতই বন্ধ, কিন্তু জিপসীরা কোথাও নেই। ওদিকে প্রাসাদের ভেতরে কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে ভারী বস্তু টানা-হেঁচড়ার শব্দ আর বহু কণ্ঠের মিলিত আওয়াজ।

চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'কে আছ, শুনতে পাচ্ছ?'

উত্তর নেই। শুধু আমার ডাক চারপাশের পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল আমার কাছেই। বার বার চেঁচিয়ে ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেললাম, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না আমার ডাকে। ঈশ্বরের এ কি পরিহাস!

আরও কিছুক্ষণ পর আবার কানে এল চাবুকের তীক্ষ্ণ শব্দ আর চাকার ঘড়ঘড়ানি। ক্রমেই দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সে-আওয়াজ। চাকা আর চাবুকের শব্দকে ছাপিয়ে এই সময় দূর থেকে ভেসে এল সম্মিলিত জিপসী সঙ্গীতের সুর। চলে গেল জিপসীরা। আর কোন আশা নেই। এই মৃত্যুপুরীতেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে আমাকে।

কিন্তু এভাবে অসহায়ের মত চুপ করে থেকে তো মরতে পারব না। পারব না সেই তিন ডাইনীর সাথে একাকী রাত কাটাতে। চুষে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দেবে ওরা আমাকে।

মিনা, মুক্তি পাবার চেষ্টা আমি করব। কিন্তু কদ্দূর সফল হব জানি না। যদি বাঁচতে না পারি, আর এ ডায়েরী কখনও তোমার হাতে পৌছায় তাহলে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করো। না হলে আমার মত বহু লোককে এভাবে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে এনে তিলে তিলে হত্যা করবে ওই রক্তলোভী, নিশাচর পিশাচ কাউন্ট ড্রাকুলা।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই আশার আলো দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, এ-যাত্রা বেঁচে গেলেও যেতে পারি। এতক্ষণ মনে হয়নি কেন কথাটা! এখান থেকে বেরোবার গোপন পথ যদি না পাই, ওদেরকে ঠেকাবার অন্তত একটা জিনিস তো আমার সঙ্গে আছে। পরম নির্ভরতায় গলায় ঝোলানো ক্রুশটাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলাম।

ঈশ্বর, রক্ষা করো আমাকে!

চার

লুসি ওয়েস্টেনরা ও মিনা মুর, অনেক দিন থেকে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। একসাথেই লেখাপড়া করেছে, একসাথেই বড় হয়েছে ওরা দু'জনে। লেখাপড়া শেষ করে মিনা চলে গেল দূরের ছোট্ট এক শহরে, স্কুল মাস্টারির চাকরি নিয়ে। লুসি থেকে গেল হুইটবির সতেরো নং চ্যাথাম স্ট্রীটে, বাবা-মার সঙ্গে। চাকরি করার সময়ই মিনার পরিচয় ঘটে জোনাথন হারকারের সাথে। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল, হল প্রেম। দু'জনেই ঠিক করল বিয়ে করবে একে অন্যকে। যথারীতি আংটি বিনিময় করে বাগদানও হয়ে গেল একদিন। এমন সময় মি. হকিন্সের কাছ থেকে ডাক এল

জোনাথনের, এক বিশেষ জরুরী কাজ নিয়ে ট্রানসিলভেনিয়ার এক অখ্যাত দুর্গম এলাকায় যেতে হবে তাকে। এই কাজ করতে গিয়েই কাউন্ট ড্রাকুলার পাল্লায় পড়ে জোনাথন। তবে তা মিনার জানার কথা নয়। সেদিন বিকেলের ডাকে জোনাথনের কাছ থেকে ছোট্ট একটা চিঠি পেল মিনা। দিন সাতেকের মধ্যেই ফিরে আসছে জোনাথন। মনের আনন্দে লুসির কাছে জোনাথনের আসার খবর জানিয়ে চিঠি লিখে ফেলল সে। কিন্তু জোনাথনের ফিরে আসার খবরটা যে কত বড় মিথ্যে তা দুণাক্ষরেও যদি জানত মিনা!

মিনার চিঠি পেয়ে লুসিও খুশি। এদিকে তার জীবনেও আমূল পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। বিয়ে হতে যাচ্ছে তারও। একদিনেই তিন তিনটে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে সেদিন লুসির কাছে।

প্রথমটা এল দুপুরে। খাওয়া-দাওয়ার একটু আগে। ভদ্রলোক পেশায় ডাক্তার, নাম জন সেওয়ার্ড। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম জন সেওয়ার্ডের। বয়স ঊনত্রিশ। অথচ এই বয়সেই বিশাল এক পাগলা গারদের ভার দেয়া হয়েছে তার ওপর। সুন্দর চেহারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃঢ়চেতা, অথচ এত শান্ত স্থির মেজাজের মানুষ খুব কমই চোখে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই লুসির সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তার। বলি বলি করেও কথাটা এতদিন বলতে পারেনি জন লুসিকে। কিন্তু সেদিন মনস্থির করে নিয়ে সোজা গিয়ে লুসির ঘরে ঢুকল জন। লুসিকে সামনে পেয়েই ওর হাত দুটো নিজের দু'হাতে তুলে নিয়ে চোখে চোখে তাকিয়ে বলে ফেলল সে, 'লুসি, তোমাকে ভালবাসি আমি। তোমাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

লুসি ওকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে সত্য কিন্তু স্বামী হিসেবে কল্পনা করেনি কখনও। তাই মনে মনে জন দারুণ ব্যথা পাবে জেনেও তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল সে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটা এল সেদিনই বিকেলে। আমেরিকার টেকসাসে বাড়ি ভদ্রলোকের, নাম কুইনসে মরিস। অভিযানপ্রিয়, হাসিখুশি, উচ্ছল এক দুর্ধর্ষ তরুণ। বিরাট বড়লোকের একমাত্র সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা শেষ করে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে পৃথিবীর দুর্গম সব অঞ্চলে। লুসিকে দেখার পর থেকে একটা পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে। বিয়ে করে সংসারী হতে চাইছে সে এখন। বিকেলে বাগানের এক কোণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল লুসি। সেই সময় এল মরিস। লুসিকে একলা পেয়ে সোজা বিয়ের প্রস্তাব করে বসল সে। শান্ত এবং ভদ্রভাবে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল লুসি।

লুসির প্রত্যাখ্যানের পরও কিন্তু মরিসের মুখের হাসি একবিন্দু মলিন হল না।

বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর মত হেসে লুসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

তৃতীয় প্রস্তাব এল সন্ধ্যার পর, আর্থার হোমউডের কাছ থেকে। আর্থারের দীর্ঘকায় সুপুরুষ চেহারা, আর মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুল দেখলে যে-কোন মেয়েরই মন না টলে পারবে না। স্থানীয় এক কলেজের অধ্যাপক সে, লুসিদের বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসে। মনে মনে লুসিও ভালবেসে ফেলেছে তাকে। সেদিন কি যে হল আর্থারের কে জানে। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই লুসিকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। আর্থারের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ভীরু কপোতীর মত থরথর করে কাঁপতে লাগল লুসি। কয়েক মুহূর্ত পর আর্থারের আবেগের মাত্রা কিছুটা প্রশমিত হলে তার বিশাল বক্ষে মুখ লুকালো লুসি। অস্ফুটে বলল সে, 'আর্থার, আমার আর্থার।'

জন সেওয়ার্ড, কুইনসে মরিস আর আর্থার হোমউড, তিনজনেই কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লুসির কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কথাটা কিন্তু আর্থারকে জানাল না জন এবং মরিস। বরং লুসিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে হৈ-হৈ করে স্বাগত জানাল ওরা আর্থারকে।

লুসির কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পর পাগলা গারদে ফিরে গিয়ে রোগীর সেবায় মন দিল জন সেওয়ার্ড, আর আবার পৃথিবীর ভ্রমনে বেরিয়ে পড়ল কুইনসে মরিস। অবশ্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিন বন্ধুই যোগাযোগ রাখল তিন বন্ধুর সাথে। বিন্দুমাত্র ফাটল ধরল না ওদের বন্ধুত্বে।

পাঁচ

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

২৫ এপ্রিল।

গতকাল কুমারী লুসির অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানে বুকটা শূন্য হয়ে গেছে আমার। এতটুকু স্বস্তি পাচ্ছি না মনে। বার বার মনে হচ্ছে এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। অবশ্য যদি কাজের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারি তাহলেই হয়ত এ নিঃসঙ্গতার হাত থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে পারি। ভয় হচ্ছে মানসিক হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে নিজেই না আবার মানসিক রোগী হয়ে পড়ি।

সাত-পাঁচ ভেবে রোগীদের একটু দেখাশোনা করতে বেরিয়ে পড়লাম। অদ্ভুত আচরণের জন্যে একজন রোগীর প্রতি আগে থেকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছিলাম আমি। আর সব সাধারণ পাগলদের চাইতে ওর ধরন-ধারণ সবই আলাদা। পাগল

বলে মনেই হয় না ওকে। অথচ মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করে বসে যা কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

লোকটার নাম আর. এম. রেনফিল্ড, বয়স উনষাট। আত্মপ্রত্যয়ী মেজাজ, গায়ে শক্তি আর আশ্চর্য রকমের উগ্র ওর স্বভাব। রেনফিল্ডের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করে আমার এইটুকু ধারণাই হয়েছে, অলৌকিক শক্তির প্রতি ওর অগাধ বিশ্বাস। এবং আমার ধারণা এই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবার উদ্দেশ্যেই মাঝে মাঝে উদ্ভট সব কাজ কারবার করে বসে রেনফিল্ড।

মিনা মুরের ডায়েরী থেকে

২৪ জুলাই, হুইটবি।

গতকাল আমাকে নিয়ে যেতে স্টেশনে এসেছিল লুসি। আগের চেয়ে এখন অনেক সুন্দর হয়েছে সে। লুসিদের নতুন বাড়িটা দেখে দারুণ ভাল লাগল আমার। এমন জায়গায় বাড়ি বানিয়েছেন, সত্যি, রুচি ছিল লুসির বাবার। ছোটখাট একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছবির মত বাড়িটা। সামনের বিস্তীর্ণ উপত্যকার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে সাগরের দিকে চলে গেছে ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী, নদীটার নাম এস্‌ক। মোহনার মুখের উঁচু খিলানওয়ালা লম্বা সেতুটার ওপর দাঁড়ালে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া ঘন সবুজে ছাওয়া উপত্যকা চোখে পড়ে, আর কেমন যেন স্বপ্নিল মনে হয় দিগন্তকে। উপত্যকার একপাশে ছবির মত করে সাজানো রয়েছে টালির ছাদ দেয়া পুরানো লাল ইঁটের বাড়িগুলো। শহরের ঠিক মাঝখানে পড়ে আছে হুইটবি গির্জার ধ্বংসাবশেষ, এখনও আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব কারুকাজ করা গির্জার চূড়াটা। সম্পূর্ণ শ্বেত পোশাক পরা এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে নাকি চাঁদনী রাতে গির্জায় সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় আজও।

শহরের আরেক প্রান্তে, সাগরের একেবারে কোণ ঘেঁষে পড়ে আছে আর একটা বেশ বড় গির্জার ধ্বংসাবশেষ। সেটার বিশাল আঙিনার সবটাই এখন কবরখানায় পরিণত হয়েছে। হুইটবির সবচেয়ে মনোরম জায়গা এটা। ধ্বংসপ্রাপ্ত সারি সারি পুরানো সমাধিগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে হলদে কাঁকর বিছানো সরু পথ। পথের দু'পাশে সুন্দর করে লাগানো বার্চের সারি, এরই মাঝে মাঝে বসার জন্যে পাথর বসানো চওড়া বেদি তৈরি করা হয়েছে। জায়গাটা দারুণ পছন্দ হয়েছে আমার।

এখানটায় বসেই এই ডায়েরী লিখছি, আর মাঝে মাঝে উপভোগ করছি সাগর আর বনের অপূর্ব সৌন্দর্য। বার্চের পাতায় একটানা ঝির ঝির শব্দ তুলে বয়ে

চলেছে দখিনা হাওয়া। একটু দূরে ঘাসের বুকে ছুটোপুটি লাগিয়েছে কয়েকটা খরগোশ। ওহ্, জোনাথন, এ সময়ে তোমাকে কাছে পেতে কি যে ইচ্ছে করছে!

কেন যেন দূরের ওই বন্দরটাকে অত্যন্ত কাছে মনে হয় এখান থেকে। বন্দরের একপাশে চওড়া গ্র্যানিটের দেয়াল অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে সাগরকে। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বাতিঘরটা। বন্দরের ওপাশে, সাগরের বুক থেকে খাড়া উঠে গেছে পাথরের পাহাড়, দেখলে মনে হয় খামোকাই তীর থেকে সাগরের বুকে মাইল খানেক পর্যন্ত একটা দেয়াল খাড়া করে রাখা হয়েছে। পাহাড়টা যেখানে উঠে এসেছে সাগরের বুক থেকে ঠিক সেখানে, পাহাড়ের মাথায় আর একটা বাতিঘর বসানো হয়েছে। গ্র্যানিটের দেয়াল থেকে দ্বিতীয় বাতিঘরটা পর্যন্ত টেনে নেয়া হয়েছে একটা ঝোলানো সেতু, বাতিঘরে পৌছানর জন্যেই তৈরি হয়েছে সেতুটা। বাতিঘরটার সামনে ঘন্টার বাঁধা বয়া আছে একটা। ঝড় তুফানের দিনে হাওয়ার ঝাপটায় যখন ফুলে ওঠে সাগর, ফুঁসে ওঠা উথালপাতাল ঢেউয়ের বুকে তখন পাগলের মত দোল খেতে থাকে এই বয়া। ঝোড়ো বাতাসে ভর করে ভেসে আসে ওই ঘন্টার করুণ আর্তনাদ। মাঝে মাঝে কখনও সুর পাল্টায় ঘন্টাধ্বনি, কেমন যেন বিষণ্নভাবে একটানা বেজে চলে ওটা। বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায় ওই আওয়াজ। হুইটবির প্রাচীন লোকেরা তখন বার বার ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে থাকে বুকে। ওরা বলে, দূর সাগরের বুকে কোথাও জাহাজডুবি হলেই ওরকম করুণ ভাবে কেঁদে ওঠে বয়ার ঘন্টা।

যেটুকু লিখেছি, বসে বসে ভেবেছি তারচেয়ে অনেক বেশি। কখন যে বেলা শেষ হয়ে গেছে টেরও পাইনি। হঠাৎই খেয়াল করলাম দূর পাহাড়ের ওপারে অস্ত যাচ্ছে লাল সূর্য। একটু পরই কবরখানার বুকে নেমে আসবে ঘন অন্ধকার। অকারণেই ছমছম করে উঠল গা-টা। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গুছিয়ে উঠে পড়লাম। ওদিকে হয়ত আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে লুসি আর তার মা।

২০ জুলাই।

আজও এসেছি এই কবরখানায়, তবে আজ একা নই, লুসি আছে সাথে। বহুদিন পর দু'বান্ধবী মিলে মন খুলে আলাপ জমালাম। বেশিরভাগ বকবক করে চলল অবশ্য লুসিই, আবার নতুন করে আর্থার আর ওর প্রেমের কাহিনী শোনাল আমাকে। লুসির কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল, বার বার মনে পড়তে থাকল জোনাথনকে। সেই যে মাস দেড়েক আগে তার কাছ থেকে ছোট্ট একটা চিঠি পেয়েছি তারপর আর কোন সাড়া নেই। অন্য কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েছে সে? ভুলে গেছে আমাকে? অনেক কষ্টে, ঠেলে বেরিয়ে আসা অশ্রু রোধ করে লুসিকে নিয়ে উঠে পড়লাম।

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

৫ জুন।

ক্রমেই রহস্যজনক হয়ে উঠছে রেনফিল্ডের কাজ-কারবার। স্বার্থপরতা, গোপনীয়তা এবং দুরভিসন্ধি, এই তিনটে জিনিস প্রকট হয়ে উঠেছে ওর মাঝে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার বিশেষভাবে খেয়াল করেছি আমি, পশু পাখি আর পতঙ্গের প্রতি রেনফিল্ডের তীব্র আকর্ষণ। যেমন, হঠাৎ করে মাছি ধরার প্রতি সাংঘাতিকভাবে ঝুঁকে পড়েছে সে। অল্প ক'দিনেই এত বেশি সংখ্যক মাছি ধরে ফেলল সে, যে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গিয়ে রীতিমত বকাঝকা দিতে শুরু করলাম ওকে। আমার ধমকানিতে প্রথমে টু শব্দটি পর্যন্ত করল না রেনফিল্ড, পরে সুযোগ বুঝে আস্তে করে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, ডাক্তার, আমাকে অন্তত তিনটে দিন সময় দিন। এই তিন দিনেই মাছির জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব আমি।'

ভাবলাম দেখাই যাক না, কি করে ও। তাই বললাম, 'ঠিক আছে। কিন্তু ঠিক তিন দিন, মনে থাকে যেন।'

'ঠিক করলাম সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ওর ওপর।

১৮ জুন।

আমার শাসানোতে মাছির ওপর থেকে আকর্ষণ হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিবর্তে মাকড়সার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এখন রেনফিল্ড। ইতোমধ্যেই অনেকগুলো বড় সাইজের মাকড়সা ধরে একটা কাঠের বাক্সে ভরে রেখেছে সে। বাক্সটা আমিই দিয়েছি ওকে। আমার কাছে সে একটা কাঠের বাক্স চাইল, তা দিয়ে ও কি করে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটা ওকে এনে দিয়েছিলাম আমি। বেশ কিছু মাকড়সা ধরে ফেলার পর আবার মাছির দিকে ঝুঁকল রেনফিল্ড। ওর ভাগের অর্ধেক খাবারই ও ঘরের ভেতরে-বাইরে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রাখে। মাছিরা প্রলুব্ধ হয়ে ওই খাবারে এসে বসলেই কায়দা করে ওগুলোকে ধরে ফেলে সে।

১ জুলাই।

ক্রমশ বেড়েই চলেছে রেনফিল্ডের ধরা মাকড়সার সংখ্যা। ওর পাগলামি আর সহ্য করতে না পেরে আজ গিয়ে সোজা বললাম ওকে, 'এখুনি ছেড়ে দাও মাকড়সাগুলোকে।'

কথা শুনে প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম হল রেনফিল্ডের। ওর অবস্থা দেখে মায়া হল আমার। একটু নরম হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, সবগুলোকে না হোক, অন্তত অর্ধেক ছেড়ে দাও।'

একটু যেন খুশি হল রেনফিল্ড। কিন্তু হ্যাঁ-না বলল না কিছু। মাকড়সাগুলোকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আরও তিনদিন সময় দিলাম আমি ওকে। কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে যাব এমন সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল রেনফিল্ড। ঘরের এক কোণে গোশতের টুকরো ফেলে রেখেছিল সে, আমার নির্দেশেই সরানো হয়নি সেগুলো। পচে যাওয়া ওই গোশতের ওপর থেকে রেনফিল্ডের দিকে উড়ে এল একটা বড় আকারের ডাঁশ মাছি। অদ্ভুত কায়দায় থাবা মেরে মাছিটাকে ধরে ফেলেই মুখে পুরে দিল সে। পরক্ষণেই চিবিয়ে গিলে ফেলল সে মাছিটাকে। দেখে ঘৃণায় রি রি করে উঠল আমার সমস্ত শরীর।

প্রচণ্ড ধমক লাগালাম আমি রেনফিল্ডকে। আমার ধমকের উত্তরে মৃদু হেসে সে জানাল, 'আপনার হয়ত জানা নেই, ডাক্তার, একটা জীবন্ত তাজা জীব, তা সে যাই হোক না কেন, অত্যন্ত উপাদেয় এবং তা জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করে তোলে শতগুণ।'

রেনফিল্ডের কথা শুনে হঠাৎ ওর মাছি সংগ্রহের একটা কারণ আন্দাজ করলাম। মাকড়সাগুলোকে কি খাবার জন্যেই ধরেছে রেনফিল্ড? নজর রাখতে হবে, দেখতে হবে মাকড়সাগুলোকে নিয়ে ও কি করে।

আমার দিকে কিন্তু তখন আর নজর নেই রেনফিল্ডের। বালিশের তলা থেকে একটা ছোট খাতা বের করে গভীর মনোযোগের সাথে তাতে লেখা অঙ্কগুলো দেখছে সে। দেখে মনে হয় বেশ বড় আকারের একটা হিসেব লেখা আছে খাতায় কিন্তু কিসের হিসেব? তা-ও জানতে হবে আমাকে।

৮ জুলাই।

রেনফিল্ডের পাগলামিটাকে ঠিক পাগলামি বলে আর ভাবতে পারছি না এখন। সাধারণ পাগলদের চাইতে ওর রকম-সকম সম্পূর্ণ আলাদা। এটাই আরও বেশি চিন্তিত করে তুলল আমাকে। গত কয়েকদিন আড়ালে-আবডালে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি রেনফিল্ডকে। কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই ওর মধ্যে। তবে একটা কাজ সে করেছে, কথামত তিনদিনের মধ্যেই অর্ধেক মাকড়সাকে বিদায় করেছে। কিন্তু কোথায় সরাল সে মাকড়সাগুলোকে? ছেড়ে দেয়নি এ-সম্পর্কে আমি স্থির নিশ্চিত, খেয়েও ফেলেনি, তাহলে? ওদিকে কেমন করে জানি একটা চড়ুই ধরে ফেলে ওটার সাথে ইতোমধ্যেই ভাব জমিয়ে ফেলেছে রেনফিল্ড। আজ দুপুরবেলা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মাকড়সার রহস্যটা, আসলে হারানো মাকড়সাগুলো সব গেছে চড়ুইটার পেটে। আর তাইতেই রেনফিল্ডের পোষা হয়ে উঠেছে চড়ুইটা। মাকড়সা ধরা শুরু হবার পর আবার মাছির প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল পাগলটা তা-ও বুঝলাম। নিজের খাবার ছড়িয়ে মাছি ধরে রেনফিল্ড, তারপর মাছিগুলোকে ছেড়ে

দেয় মাকড়সার খাঁচায়, মাকড়সাগুলোকে আবার খাওয়ায় চড়ুই দিয়ে। এরকম অদ্ভুত পাগলামির কথা জীবনে শুনিনি আমি।

১৯ জুলাই।

ইতোমধ্যেই চড়ুই পাখিদের ছোটখাট একটা বস্তি গড়ে তুলেছে রেনফিল্ড। মাঝখানে বেশ ক'দিন ওর সাথে দেখা করিনি আমি। আজ ওর ঘরে ঢুকতেই ছুটে এসে আমার কাছে কেঁদে পড়ল রেনফিল্ড। বলল, 'যাই বলুন, ডাক্তার সাহেব, ছোট্ট একটা বিড়ালের বাচ্চা চাই আমার। ওর সাথে ভাব করব আমি। সকাল-সন্ধ্যা খেলব, সময় হলে খেতে না চাইলেও ধমক-ধামক দিয়ে খাওয়াব, দারুণ মজা হবে, তাই না?'

কথা শুনে মেজাজটা খিঁচড়ে গেল আমার। কিন্তু তা প্রকাশ করলাম না ওর কাছে। বিড়ালের বাচ্চা কেন চাইছে সে তো আমি জানি। আসলে চড়ুইদের পুরো বস্তিটা বিড়ালের পেট ভরাতে চাইছে রেনফিল্ড। মজা করার জন্যে বললাম, 'বিড়ালের বাচ্চা পুষলে তো ভালই। তা বাচ্চা হলেই চলবে, নাকি আসলে একটা বড় বিড়াল দরকার তোমার?'

'ঠিক ধরেছেন আপনি!' অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল সে, 'সাধে কি আর এতবড় হাসপাতালের ডাক্তার হয়েছেন আপনি! তা, ডাক্তার সাহেব, বিড়ালটা কিন্তু আজই চাই আমার।'

'কিন্তু আজ তো হচ্ছে না। আর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। সত্যি একটা বিড়াল তোমাকে দেয়া যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে আমাকে।'

মুহূর্তে খুশি খুশি ভাবটা চলে গেল রেনফিল্ডের চেহারা থেকে, সে-জায়গায় স্থান নিল একটা ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি। এ অভিব্যক্তি শুধু উন্মাদ খুনীদের মাঝেই দেখেছি আমি। এখন যে-কোন মানুষকে পৈশাচিকভাবে খুন করতে এতটুকু বাধবে না রেনফিল্ডের, ওই চেহারা তাই প্রমাণ করে। বুঝলাম, যতটা সহজ ভেবেছিলাম ওকে তারচেয়ে অনেক, অনেক বেশি ভয়ঙ্কর সে। এখন থেকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাকে। নাহলে যে-কোন মুহূর্তে, যে-কোন অঘটন বাধিয়ে বসতে পারে রেনফিল্ড।

রাত দশটায় আবার দেখতে গেলাম রেনফিল্ডকে। গালে হাত দিয়ে ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে ও। কিছুক্ষণ আগের ভয়ঙ্কর রূপ এখন আর তার মাঝে নেই। আমি ঘরে ঢুকতেই আবার আমার কাছে একটা বিড়ালের বাচ্চা চাইল সে। পরিষ্কার বলে দিলাম, হবে না। আর একটা কথাও বলল না রেনফিল্ড। হতাশ ভাবে ফিরে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবতে থাকল সে। আমিও আর কোন কথা না বলে ফিরে এলাম।

২০ জুলাই।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। প্রচণ্ড কৌতূহল রেনফিল্ডের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চলল আমাকে। ওর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, খোশ মেজাজেই আছে রেনফিল্ড। বেসুরো কণ্ঠে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে ঘরের এখানে ওখানে চিনি ছিটাচ্ছে সে। আবার শুরু হয়ে গেছে মাছি শিকার। ঘরের কোথাও একটা চড়ুই চোখে পড়ল না। বিদায় করে দিয়েছে পাখিগুলোকে? জানালা থেকে সরে এসে রেনফিল্ডের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'পাখিগুলোকে দেখছি না, ছেড়ে দিয়েছ নাকি?'

'ছাড়ব কেন? পাখা আছে, উড়ে গেছে।' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল রেনফিল্ড।

কথাটা বিশ্বাস হল না আমার। হঠাৎই চোখে পড়ল জিনিসগুলো। ঘরের এখানে ওখানে পড়ে আছে কয়েকটা পালক। কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগও লেগে আছে বালিশের কভার আর বিছানার চাদরে। রক্ত এল কোত্থেকে? বেরিয়ে এসে রেনফিল্ডের ওপর কঠোর নজর রাখতে বললাম নার্সকে।

বেলা এগারোটায় ছুটতে ছুটতে এল নার্স। বলল, 'সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে, স্যার, রেনফিল্ড। বমি করে করে ভরিয়ে ফেলছে ঘরের মেঝে, বিছানার চাদর,' একটু থেমে আবার বলল নার্স, 'বললে বিশ্বাস করবেন না, স্যার, বমির সাথে বেরিয়ে আসছে গাদা গাদা পালক। আমার মনে হয় সব ক'টা চড়ুইকেই গিলে ফেলেছে হতচ্ছাড়া পাগলটা।' ব্যাপারটা দেখার জন্যে ছুটলাম রেনফিল্ডের ঘরে।

রাত দশটায় আবার দেখতে গেলাম রেনফিল্ডকে। অনেকটা ভাল এখন সে, কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আস্তে করে বালিশের তলা থেকে বের করে আনলাম ওর হিসেবের খাতাটা। খাতাটা খুলেই পাগলটার স্বভাব-চরিত্র অনেকখানি প্রকাশ হয়ে পড়ল আমার কাছে। এ-ধরনের বিচিত্র পাগল কোটিতে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। কোন বই-পুস্তকে পাওয়া যায় না এসব রোগের নাম। তবে কিছু কিছু ভুডু বিশেষজ্ঞের কাছে এসব পাগলদের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এদেরকে বলে ওরা জুফাগাউস ম্যানিয়াক, অর্থৎ আত্মভুক উন্মাদ। এরা মনে করে অন্যান্য জীবের জীবনকে আত্মসাৎ করে ফেললে সেইসব জীবের জীবনীশক্তি পুঞ্জীভূত ও সঞ্চালিত হয়ে যাবে নিজের মধ্যে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল একটা বিচিত্র পদ্ধতিতে জীবনীশক্তি আত্মসাৎ করে ওরা। প্রথমে যতগুলো সম্ভব প্রাণীকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের প্রাণী দিয়ে খাওয়ায় ওরা। এর উদ্দেশ্য, ছোট প্রাণীগুলোর সমস্ত জীবনীশক্তি আত্মসাৎ করে নিল অপেক্ষাকৃত বড় প্রাণীটা। তারপর সেই প্রাণীটাকে নিজেই খেয়ে ফেলে ছোট প্রাণীগুলো আর বড়

প্রাণীটার জীবনীশক্তি একসঙ্গে আত্মসাৎ করে নেয় জুফাগাউস ম্যানিয়াক। কখনও কখনও এই আত্মসাৎ-এর প্রক্রিয়া তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি পঞ্চম স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। রেনফিল্ডের প্রক্রিয়া চতুর্থ স্তরে পৌঁছেছে, অবশ্য বিড়াল পেলে পঞ্চম স্তরেই পৌঁছে যেতে পারত সে।

এ ধরনের অন্যান্য পাগলদের চাইতে আর একটু উন্নত রেনফিল্ড। ক'টা জীবকে আত্মসাৎ করেছে তা নির্ভুলভাবে খাতায় লিখে রেখেছে সে। ক'টা মাকড়সাকে ক'টা মাছি খাওয়াল, সে-মাকসাগুলোকে আবার ক'টা চড়ুই দিয়ে খাওয়াল সবকিছু অত্যন্ত সুন্দরভাবে তারিখ দিয়ে দিয়ে লিখে রেখেছে ও। একটা পাগল কি করে এত সুন্দর এবং নির্ভুলভাবে অঙ্কের হিসেব রাখল ভেবে আশ্চর্য লাগল আমার।

জানো লুসি, ভেবেছিলাম, তোমার প্রত্যাখ্যানের পর আর কোন কাজেই মন বসাতে পারব না আমি। জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাবে আমার কাছে। কিন্তু এখন দেখছি প্রেমই মানুষের জীবনে সবকিছু নয়। ইচ্ছে করলেই সুস্থ মন নিয়ে বেঁচে থাকার অনেক অবলম্বন খুঁজে বের করতে পারে মানুষ। পাগল রেনফিল্ডের কাছে একটা বড় শিক্ষা পেলাম আমি, যে-কোন কাজে স্থির অবিচলভাবে মনপ্রাণ ডুবিয়ে দিতে পারলে শুধু তাই নিয়ে বেঁচে থাকাটা এমন কঠিন কাজ নয়।

ছয়

মিনা মুরের ডায়েরী থেকে

২৬ জুলাই।

গতকাল মি. হকিন্সের কাছে লেখা জোনাথনের একটা চিঠি পেয়েছি। কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ-দুর্গ থেকে লেখা মাত্র এক লাইনের ছোট্ট চিঠি। লিখেছে 'বাড়ি রওনা হচ্ছি।' চিঠিটা পড়ে কিছুই বুঝলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে আমার কাছে।

লুসিদের বাড়িতেই এখনও আছি আমি। ভালই আছে লুসি, কিন্তু হঠাৎ করেই ঘুমের ঘোরে হেঁটে চলার সেই পুরানো অভ্যাসটা আবার ফিরে এসেছে ওর মাঝে। লুসির মার সাথে ব্যাপারটা নিয়ে গোপনে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, রাতে আমি নিজের হাতে বাইরে থেকে ওর ঘরে তালা লাগিয়ে দিয়ে তারপর শুতে যাব। এই ঘুমের ঘোরে হাঁটা জিনিসটা ভয়ঙ্কর, এতে কখনও-সখনও প্রাণ সংশয় পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। লুসির মা'র মতে ঘুমের ঘোরে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজান্তেই

পাহাড় কিংবা ছাদের কার্নিসের একেবারে প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ায় নিশিতে পাওয়া মানুষ, তারপর সেই অবস্থায়ই হঠাৎ ঘোর কেটে গিয়ে নিজের অবস্থান দেখে চমকে গিয়ে নিচে পড়ে যায়। লুসির বাবাকেও নাকি প্রায় নিশিতে পেত।

মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন লুসির মা। ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে লুসির বিয়ে। এর মাঝে যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, ভাবনার কথাই। শিগগিরই এখানে এসে পৌঁছুবে অসুস্থ লর্ড গোডালমিং-এর একমাত্র পুত্র আর্থার হোমউড। আমার মনে হয় নিশি-টিশি কিছু না, আসলে আর্থারের প্রতীক্ষায়ই ক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে লুসি এবং সেই চিন্তায় ঘুম না আসাতে বিছানা ছেড়ে উঠে আপনমনে ভাবতে ভাবতে ঘুরে বেড়ায় সে।

২৭ জুলাই।

আর কোনরকম খবর পাইনি জোনাথনের কাছ থেকে। ওর জন্যে আমার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। ছোট্ট একটা চিঠি যদি শুধু পেতাম ওর কাছ থেকে!

ওদিকে ঘুমের ঘোরে হাঁটার অভ্যাস কিন্তু দিনকে দিন বেড়েই চলেছে লুসির। বাইরে থেকে অবশ্য ওর ঘর তালাবদ্ধ করে রাখি আমি, কিন্তু ঘরের ভেতরই ওর হাঁটার শব্দে প্রায় রাতেই ঘুম ভেঙে যায় আমার। জোনাথনের কোন খবর নেই, ওদিকে লুসির এই অবস্থা, সব মিলিয়ে দুর্ভাবনার শেষ নেই আমার। বুঝতে পারছি এ-অবস্থা আর বেশিদিন চললে অসুখে পড়ে যাব আমি। একমাত্র সান্ত্বনা, লুসির স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি এখনও। এই সময় তারবার্তা এল আর্থারের কাছ থেকে, ওর বাবার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটেছে, কাজেই ওর আসতে আরও ক'দিন দেরি হবে।

৩ আগস্ট।

আরও সপ্তাহখানেক কেটে গেল। এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই জোনাথনের। কি হল ওর? সাংঘাতিক কোন অসুখে পড়েছে? ওর চিন্তায় রাতে ভাল ঘুম হয় না আমার। ঘুমের ঘোরে হাঁটা একটু কমেছে লুসির, কিন্তু নতুন আরেক পরিবর্তন টের পাওয়া যাচ্ছে ওর মাঝে। আগের চেয়ে অনেক শান্ত হয়ে গেছে ও। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে একটার উত্তর পাওয়া যায়। আর রাতের বেলা ঘর থেকে বেরোবার এক উদগ্র ইচ্ছে জেগে উঠেছে ওর মাঝে, অবশ্য কখনই রাতের বেলা ওকে ঘর থেকে বেরোতে দিই না আমি। এ কি ভয়ঙ্কর কোন বিপদের পূর্বলক্ষণ?

৬ আগস্ট।

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও তিনটে দিন, অথচ কোন খবর নেই জোনাথনের। শুধু যদি জানতাম কোথায় আছে ও, তাহলে নিজে গিয়ে দেখা

করতে পারতাম তার সাথে। জানি না যখন, দুর্বিষহ হলেও অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

লুসির মনের অস্বস্তির ভাবটা আরও বেড়ে গেছে। রাতে বলতে গেলে আর বিছানায় পিঠই লাগায় না সে এখন।

আজ একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম স্থানীয় লোকদের মুখে। গত রাতে নাকি প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল দূর সাগরে। কথাটা অবশ্য মিথ্যে ভাববার কোন কারণ নেই। এখন পর্যন্ত কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ, সূর্যের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিস্মিত হবার কারণ সেটা নয়, কারণ হল আশ্চর্য ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গিয়েছিল দিগন্ত। আর বন্দরের কোলাহল ছাপিয়ে ভেসে এসেছিল একটা বিষণ্ন চাপা গুম গুম শব্দ, সেই বয়ায় বাঁধা ঘন্টার শব্দ। জেলেরা বলছে নিশ্চয়ই কোন না কোন জাহাজ ডুবেছে দূর সাগরে।

একটু আগে লুসির মা'র সাথে দেখা করতে এসেছিলেন মি. সোয়ালেজ। ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় ফুলে ওঠা সাগরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে উঠেছিলেন বৃদ্ধ, 'জানো, মিনা, কেন যেন মনে হচ্ছে সাংঘাতিক কোন দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে হুইটবিকে কেন্দ্র করে। বাতাসে পৈশাচিকতার গন্ধ পাচ্ছি। সামান্য ব্ল্যাক ম্যাজিক শিখেছিলাম এক সময়। তাই অদ্ভুত কিছু ঘটতে যাবার আগে তা ঠিকই টের পাই আমি।'

কথাগুলো বলতে বলতেই মন খারাপ হয়ে গেল মি. সোয়ালেজের। এরপরই উঠে চলে গেলেন তিনি।

৮ আগস্ট।

অদ্ভুত একটা খবর বেরিয়েছে আজ 'দি ডেইলিগ্রাফ' পত্রিকায়। খবরটা আমার মনকে এত নাড়া দিয়েছে যে খবরের বিষয়বস্তুটুকু লিখে রাখছি ডায়েরীর পাতায়।

মিথ্যে বলেনি জেলেরা, সত্যিই প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল আগের রাতে। ডেইলিগ্রাফ পত্রিকার মতে হুইটবি বা তার আশেপাশের এলাকায় এত প্রচণ্ড ঝড় নাকি আর কখনও হয়নি। সেদিন সকাল থেকেই গুমোট ভাব ছিল আবহাওয়ায়, কিন্তু আগস্ট মাসে তা এমন কিছু অভিনব নয়। বাতাসে গুমোট ভাব থাকলেও আকাশ কিন্তু ছিল পরিষ্কার। সেদিন শনিবার, অতএব হুইটবির আশপাশের মালগ্রেভ উড, রবিনহুড উপসাগর, রিগ মিল, রানসৃউইক প্রভৃতি দ্বীপ ভ্রমণে বের হয়ে পড়ে হুইটবির অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় লোকেরা। বিকেলের একটু পরই বাতাসের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে বইতে শুরু করে ঝিরঝিরে দখিনা হাওয়া। কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ করেই ঘন মেঘে ছেয়ে যায়

আকাশ। ভয় পেয়ে তীরে ফিরে আসে অধিকাংশ জেলে নৌকা।

রাত দশটার পরই প্রবল হাওয়া বইতে শুরু করে, ফুঁসে ওঠে সাগর। পাহাড়ের মত বিশাল সব ঢেউ প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে আছড়ে পড়তে থাকে হুইটবির উপকূলে। যে দু'একটা জেলে নৌকা সাঁঝের বেলায় ফিরে না এসে তখন পর্যন্ত খোলা সাগরে মাছ ধরছিল তারা আর ফিরে আসতে পারেনি। গ্রাস করে নিয়েছে তাদের উত্তাল সাগর।

ভয়ঙ্কর সে-ঝড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে হুইটবির প্রাচীন নাবিকেরা বলেছে এমন ঝড় নাকি জীবনে আর দেখেনি ওরা। এমনকি তাদের বাপ-দাদাদের মুখেও কখনও শোনেনি। সূর্য ডোবার পর থেকে যেমন হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল ঝড়, ভোরবেলা মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি হঠাৎ করেই থেমে যায় আবার।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, ভোরবেলা হুইটবির উপকূলে রহস্যজনকভাবে পড়ে ছিল একটি অচেনা পরিত্যক্ত জাহাজ।

৯ আগস্ট।

খবরের শেষ অংশটুকু লিখে রাখছি আজ। খোঁজখবর করে জানা যায় পরিত্যক্ত জাহাজটির নাম 'ডিমেটার'। কিছুদিন আগে ভার্না বন্দর থেকে মাল নিয়ে রওনা দেয় এই ছোট্ট রাশিয়ান জাহাজটি। জাহাজটিতে করে হুইটবির জনৈক আইনজীবী মি. এস. এফ. বিলিংটনের নামে কয়েকটা বড় বড় কাঠের বাক্স পাঠানো হয়। রাশিয়ান বাণিজ্যদূত এবং স্থানীয় বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ডিমেটারে গিয়ে ওঠে কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিক। জাহাজের ভেতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে সাংবাদিকরা। শেষ পর্যন্ত এঞ্জিনরুমে একটিমাত্র মৃতদেহ আবিষ্কার করে ওরা। জাহাজের হুইলের সাথে শক্ত করে বাঁধা ছিল লাশের ডান হাতটা, অন্য হাতে ধরা একটা কাঠের ক্রুশ। লাশের সারা মুখে স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। পুলিশ সার্জেন জে. এম. কাফিনের মতে দু'দিন আগেই মারা গেছে লোকটা। একটা লগবুক পাওয়া গেছে লাশের পকেট থেকে। লগবুকটা পড়ে জানা গেছে ডিমেটার জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন মৃত লোকটা।

লগবুকে অদ্ভুত সব ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন ডিমেটারের ক্যাপ্টেন। ভয়ঙ্কর, অবিশ্বাস্য ওই ঘটনাগুলোর যথাযথ বিবরণ ডায়েরীতে লিখে রাখছি আমি।

৬ জুলাই।

কয়েকটা বড় বড় বাক্স ভর্তি বালি আর মাটি নিয়ে দুপুরের দিকে রওনা হল আমাদের মালবাহী জাহাজ ডিমেটার। আবহাওয়া পরিষ্কার। আমি বাদে আর পাঁচজন নাবিক, দু'জন খালাসী, একজন বাবুর্চি এবং একজন প্রধান সহকারী সহ আরও মোট ন'জন লোক আছে জাহাজে।

১১ জুলাই।

তুরস্কের সীমান্ত অঞ্চল বসফরাসে এসে প্রবেশ করলাম ভোর হবার আগেই। একটু পরই তদন্তের উদ্দেশ্যে জাহাজে এসে উঠল শুল্ক বিভাগের কয়েকজন লোক। ওদের তদন্ত শেষ হল বিকেল চারটে নাগাদ। ছাড়পত্র পেয়ে আবার চলতে শুরু করল জাহাজ।

১২ জুলাই।

দারদালেস-এ এসে অল্পক্ষণের জন্যে আরও ক'বার ঝামেলা পোহাতে হল উপকূলরক্ষী ও জলপুলিশের হাতে। আর্কি-পেলাগো পার হয়ে এলাম মাঝরাতে।

১৩ জুলাই।

মাতাপান অন্তরীপ ছাড়িয়ে আসার পরপরই একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জাহাজে। কেন যেন একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে নাবিকেরা। কারণটা জানতে পারলাম না।

১৪ জুলাই।

ক্রমশ বেড়েই চলেছে উত্তেজনা। বলিষ্ঠ, কর্মঠ ওই লোকগুলোর এই ব্যবহারের সঠিক কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারলাম, জাহাজে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে সন্দেহ করছে নাবিকেরা। কথায় কথায় বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে ওরা। এসব নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে করতে দু'জন তো প্রায় মারামারিই বাধিয়ে দিল। কিন্তু অন্যেরা ধরে শান্ত করে দিল ওদের।

১৬ জুলাই।

পেত্রোফস্কি নামে একজন নাবিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মাঝরাতের পর থেকেই। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে পুরোপুরি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে নাবিকেরা। একরম কিছু ঘটার আশঙ্কা নাকি আগে থেকেই করছিল তারা। ওদের সন্দেহ, সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসছে ডিমেটারের ওপর।

১৭ জুলাই।

অদ্ভুত একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে গতকাল নাবিক ওলগারেন। আগের রাতে পেছনের ডেকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল সে। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছিল তখন। হঠাৎ খেয়াল করল ওলগারেন, কালো আলখাল্লায় ঢাকা লম্বা মত কে যেন একজন সামনের ডেকের দিকে হালকা পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটা জাহাজের কেউ নয় এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ওলগারেন। আড়ালে থেকে ওকে লক্ষ্য করতে থাকল নাবিক। ওর চোখের সামনে হঠাৎই কোথাও উধাও হয়ে গেল আগন্তুক। কোথায় গেল লোকটা? সামনের ডেকে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে চট করে লুকিয়ে পড়তে

পারে সে। কেন যেন ভয় ভয় করতে লাগল ওলগারেনের। ডিউটি শেষ হবার পরপরই কথাটা আমাকে এসে জানিয়ে গিয়েছিল সে।

ওলগারেনের কথায় জাহাজটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখার আদেশ দিলাম সবাইকে। প্রথমে আমার সহকারী তো খেপেই গেল কিন্তু ওকে বুঝিয়ে বলতেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও খুঁজতে গেল সে। জাহাজের প্রত্যেকটি ইঞ্চি খুঁজে দেখার পরও সন্দেহজনক কিছু না দেখে আবার সাহস ফিরে এল নাবিকদের মনে। খুশি মনেই আবার কাজ করতে লাগল ওরা।

২২ জুলাই।

সাংঘাতিক খারাপ আবহাওয়া যাচ্ছে গত তিনদিন ধরে। জাহাজ সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে সবাই, অতএব আর ভয় পাবার সময় পায়নি কেউ। বহু কষ্টে জিব্রাল্টার প্রণালী পেরিয়ে আসার পর আবহাওয়ার একটু পরিবর্তন হয়েছে।

২৪ জুলাই।

আবার দ্বিগুণ আতঙ্ক এসে ভর করেছে নাবিকদের মনে। বিস্‌কে উপসাগরে পড়ার পর থেকেই আর একজন নাবিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবারও রাতের বেলা জাহাজের ডেকে পাহারা দিতে গিয়ে হারিয়ে গেছে সে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, কেউই আর রাতের বেলা ডেকে একলা দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে সাহস পাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই দু'জন করে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবার নির্দেশ দিতে হল। এবার কি ঘটবে কে জানে।

২৮ জুলাই।

জিব্রাল্টার প্রণালী পেরোবার পর একটু পরিষ্কার হলেও রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েছিল আবহাওয়া। সেই থেকে ক্রমেই আবহাওয়ার অবস্থা খারাপের দিকে চলেছিল। আজ এমন অবস্থা, খোলা ডেকে গিয়ে দাঁড়ানই যাচ্ছে না। ক্রমাগত জাহাজের গায়ে এসে ঝাপটা দিচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। নিচে ফুঁসছে অশান্ত সাগর। বিশাল সাগরের বুকে চীনাবাদামের খোসার মত দুলছে ডিমেটার। আতঙ্কে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে নাবিকেরা।

২৯ জুলাই।

দু'জন করে পাহারা দিয়েও এড়ানো গেল না তৃতীয় দুর্ঘটনা। গত রাতে একসাথে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল দু'জন নাবিক। ভোরের দিকে অল্পক্ষণের জন্যে বাথরুমে গিয়েছিল একজন, ফিরে এসে দেখে অপরজন নেই ডেকে। সাথে সাথেই চেঁচামেচি শুরু করে সে। শুরু হল খোঁজা। কিন্তু সেই পুরানো ইতিহাস। সারা জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না ওকে। বিন্দুমাত্র সূত্র না রেখে গায়েব হয়ে গেল তিন তিনটে লোক। আশ্চর্য!

৩০ জুলাই।

রাত শেষ হবার আগেই ইংল্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে পড়ল জাহাজ। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে সবাই। জাহাজের পালগুলো আবার তুলে দেয়া হয়েছে, তরতর করে পানি কেটে স্বচ্ছন্দ গতিতে ক্রমেই ইংল্যাণ্ডের উপকূলের আরও কাছে চলে যাচ্ছে জাহাজ। সবাই নিশ্চিন্ত, এমন সময় ঘটল চতুর্থ দুর্ঘটনা। আরও একজন নাবিক গায়েব। হারাধনের দশটি ছেলের মত অবস্থা হয়েছে যেন।

১ আগস্ট।

ঝড় থেমেছে ঠিকই। কিন্তু কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে ঘন কুয়াশা। এত ঘন যে দু'হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যায় না। এ-অবস্থায় জাহাজ পথ ভুল করতে বাধ্য। কয়েকবারই বিপদে পড়ার সংকেত পাঠালাম বাইরের পৃথিবীতে, কিন্তু কোন কাজ হল না। কেন যেন মনে হচ্ছে এক অজানা ভয়ঙ্করের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে আমাদের কোন অশুভ শক্তি।

২ আগস্ট।

মধ্যরাত্রি—হঠাৎ কার আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। একলাফে উঠে বিছানা থেকে নেমে ছুটে বেরিয়ে এলাম ডেকে। খুব কাছে থেকেই এসেছিল চিৎকারটা, কিন্তু বাইরে এসে কিছুই চোখে পড়ল না। অবশ্য ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে, ঘন কুয়াশার ভেতরে কোনকিছু চোখে পড়াটাই অস্বাভাবিক। চেঁচিয়ে ডাকতেই উত্তর দিল দু'জন নাবিক। আমার মত ওরাও আর্তচিৎকার শুনেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সারা ডেক খুঁজেও পাহারারত নাবিকটির খোঁজ পাওয়া গেল না। এই নিয়ে হারাধনের দশটি ছেলের পাঁচটি নিখোঁজ।

৩ আগস্ট।

মধ্য রাত্রি—ক্লান্ত নাবিকটিকে ছুটি দেবার উদ্দেশ্যে এঞ্জিন ঘরে এসে ঢুকলাম। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। গেল কোথায়? এমনিতেই কুয়াশার জ্বালায় অস্থির, ওদিকে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে। এ-অবস্থায় এঞ্জিন ঘরে লোক নেই, ভারি আশ্চর্য তো? এ-সময় তো এঞ্জিন ঘর ছেড়ে যাবার কথা নয় এঞ্জিন চালকের। চেঁচিয়ে সহকারীকে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গেই স্ক্রু ড্রাইভার হাতে ছুটে এল সে। ওর চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। যেন ভূত দেখেছে সে। আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর দু'চোখ। আমাকে দেখেই কানের কাছে ঝুঁকে এল সে। ভয়চকিত দৃষ্টিতে আশপাশটা দেখতে দেখতে ফিসফিস করে বলল, 'এখানেই কোথাও আছে ও, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। একটু আগে নিজের চোখে দেখেছি আমি ওকে। ঢ্যাঙা, রোগা,

মরা মানুষের মত বিবর্ণ পাংশুটে মুখ। পেছন থেকে মাংস কাটার বড় ছুরিটা ওর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম আমি। বললে বিশ্বাস করবেন না, ক্যাপ্টেন, সোজা ওকে ভেদ করে ওপাশের দেয়ালে গিয়ে ঠং করে বাড়ি খেল ছুরিটা, যেন ছায়ার ভেতর দিয়ে ওপারে চলে গেল,' বলেই শ্বাস নেবার জন্যে একটু থামল সহকারী। যদি ছুরি ও সত্যিই মেরে থাকে তাহলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন উপায় নেই, এটা ঠিক। কারণ ওকে চিনি আমি। বিশ ফুট দূর থেকে ছুরি ছুঁড়ে মেরে একটা পাখির চোখে বিঁধিয়ে দেয়াটা ওর পক্ষে কিছুই না।

আবার বলতে শুরু করেছে সহকারী, 'আমি এখন জানি, ক্যাপ্টেন, কোথায় আছে ও। লোকজনের সাড়া পেলেই ওই বাক্সগুলোর কোন একটায় গিয়ে লুকায় ব্যাটা। কাজেই প্রত্যেকটা বাক্সের ডালা খুলে দেখতে যাচ্ছি আমি এখন,' বলেই ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

বিমূঢ়ের মত এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। নিচ থেকে ভেসে আসছে হাতুড়ির ঠুকঠাক আর বাক্সের ডালা খোলার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল আমার। চেঁচাতে চেঁচাতেই এঞ্জিনরুমে এসে ঢুকল সহকারী। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে ওর সারা গা। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারাবে এখুনি। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে বলল সে, 'ক্যাপ্টেন, ওকে খুঁজে পেয়েছি আমি। মানুষ না ও। এ-জাহাজে থাকলে নির্মমভাবে ওর হাতে মরতে হবে আমাকে। তারচেয়ে সত্যিকার নাবিকের মত সাগরে ডুবে মরা অনেক ভাল। তাই করতে যাচ্ছি আমি এখন। বিদায়, ক্যাপ্টেন।' আমি ভালমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। মুহূর্ত পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ওর পিছু পিছু ছুটে গেলাম আমিও। কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্যে ও কোনদিকে গেল ঠাহর করতে পারলাম না। ঝড়ো বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে কানে এল শুধু ওর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মৃদু ছলাৎ শব্দ।

আমার চোখের সামনেই শেষ হয়ে গেল আর একটা জীবন। কয়েকটা মুহূর্ত এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নাবিকদের কেবিনের দিকে এগিয়ে চললাম। কেবিনের দরজার কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াতে হল। দমকা বাতাসে এদিক-ওদিক বাড়ি খাচ্ছে খোলা দরজা। ভেতরে কেউ নেই। কেবিনের দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনটা খুলে নিয়ে খুঁজতে বেরোলাম ওদের। সারাটা জাহাজ খুঁজেও পাওয়া গেল না কাউকে। নিষ্ঠুর সত্যটা আর চাপা থাকল না আমার কাছে। হারাধনের দশটি ছেলের নয়টিই সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে।

ওদের ঝাঁপ দেয়ার কারণটা স্পষ্ট না হলেও আবছা মত আন্দাজ করলাম। ভয়ঙ্কর কোনকিছু দেখে আতঙ্কে জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে আমার সহকারীর মতই পানিতে

ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডিমেটারের প্রত্যেকটি নাবিক।

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কোনদিন আর বন্দরে পৌঁছতে পারব না আমিও।

৪ আগস্ট।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ হল। কিন্তু গাঢ় কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারছে না এখানে। গত রাত থেকে ঠায় বসে আছি এঞ্জিনরুমে। শেষে আবার আমার নাবিকের মত বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি এ-ভয়ে হুইলের কাছে কেউ নেই জেনেও এঞ্জিনরুম ছেড়ে যাবার সাহস পাচ্ছি না। বাঁচব না ঠিকই, কিন্তু ক্যাপ্টেনের সম্মানকে ক্ষুণ্ন করে জাহাজ ছেড়ে যেতে পারব না আমি।

গত রাতে এঞ্জিন ঘরের এক কোণে অস্পষ্ট আলো-ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি ওকে। এত ভয়ঙ্কর চেহারা জীবনে দেখিনি আমি। ওকে দেখে মনে হয়েছে নরক থেকে উঠে এসেছে যেন সাক্ষাৎ শয়তান।

বার বার মনে হচ্ছে, যাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি সাগরে। কারণ এ-চেহারা আর দ্বিতীয়বার দেখার সাহস নেই আমার। জাহাজে থাকলে আজ রাতেও আবার দেখব ওকে, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু না, পরাজিত হতে পারব না ওর কাছে। জাহাজে থেকেই মরব আমি। অসচেতন মুহূর্তে যাতে কিছু করে বসতে না পারি সেজন্যে ডান হাতটাকে শুক্ত করে বেঁধে রাখব হুইলের সাথে।

কিন্তু রাত যতই এগিয়ে আসছে মনে মনে ততই দুর্বল হয়ে পড়ছি। আর দেরি করা যায় না। এখনই হাতটা হুইলের সাথে বেঁধে ফেলা দরকার।

আমার এ-লগবুক যদি কারও হাতে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কর্তব্যের খাতিরেই হুইলের সাথে হাত বেঁধে রেখেছি আমি। আমার আরও একটা অনুরোধ থাকল তার কাছে, সম্ভব হলে সে যেন দুনিয়ার বুক থেকে ধ্বংস করে দেয় এই রক্তলোভী পিশাচকে। না হলে নিরপরাধ দশজন নাবিকের আত্মা শান্তি পাবে না কোনদিন। বিদায় হে পৃথিবী, বিদায়।

ঈশ্বর,স্বর্গে দ্বার খুলে রাখো আমার জন্যে। তোমার পদপ্রান্তে ঠাঁই নিতে আসছি আমি।

মিনা মুরের ডায়েরী থেকে

১০ আগস্ট।

ঘুমের ঘোরে হাঁটার অভ্যাসটা অনেক কমে এসেছে লুসির, কিন্তু তার পরিবর্তে আরেকটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, ঘুমের মধ্যেই অস্বাভাবিকরকম ছটফট করে সে। গতকাল লুসির সাথে একই ঘরে রাত কাটিয়েছি। ওর ছটফটানিতে একটুক্ষণের জন্যেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি আমি। সারারাত ছটফট

করে ভোরের দিকে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে লুসি।

ঘুম ভাঙলে ওকে নিয়ে সাগরের ধারে বেড়াতে বেরোলাম। ঝকঝকে পরিষ্কার নীল আকাশের এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। ভোরের কচি রোদ এসে পড়েছে বিচিত্র রঙা মেঠো ফুলের গায়ে। ফুলগুলোর কোন কোনটায় রাতের ঝরে পড়া দু'এক ফোঁটা শিশিরবিন্দু এখনও লেগে আছে। সূর্যের সোনালী আলো পড়ে রামধনুর সাত রঙ সৃষ্টি করছে ওই শিশিরবিন্দুগুলো। সাগরের বুক থেকে বয়ে আসছে ঝিরঝিরে দখিনা হাওয়া। শান্ত ওই সাগরের দিকে চেয়ে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না মাত্র কয়েকদিন আগে ঝড়ের দাপটে ওর বুকেই উথালপাতাল নেচে বেড়িয়েছে পাহাড়-প্রমাণ বিশাল সব ঢেউ।

হাঁটতে হাঁটতে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গির্জাটার কাছে চলে এলাম গির্জার আঙিনায় লোকের ভিড়। ডিমেটারের সেই হতভাগ্য ক্যাপ্টেনের লাশ দাফন করতে আনা হয়েছে আজ, তার শোকমিছিলে অংশ গ্রহণ করছে আঙিনার ওই লোকগুলো। কি যেন এক অজানা কারণে অস্থির হয়ে আছে লুসি, বারবার জিজ্ঞেস করেও তার কাছ থেকে সদুত্তর পেলাম না আমি। গতরাতের দুঃস্বপ্নের ঘোর বোধহয় এখনও ছায়াপাত করে রেখেছে ওর মনে।

এখানে, এই লোকের ভিড়ে লুসির ভাল লাগছে না ভেবে, দূরের ফাঁকা জায়গাটার দিকে রওনা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে প্রথমদিন যে-বেদিটায় বসে ডায়েরী লিখেছিলাম সেটার কাছে চলে এলাম। এখানেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে জনাকয়েক লোক। ওদের মাঝে আমার একজন পরিচিত লোকও আছে। আমাদের দেখেই এগিয়ে এসে বলল সে, 'জানেন, মিস মুর, আজ ভোরে এই বেদির ওপর মরে পড়ে ছিল বৃদ্ধ মি. সোয়ালেজ। ডাক্তার রায় দিয়েছেন, অস্বাভাবিক আতঙ্কজনিত কারণে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন বৃদ্ধ।' শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবতে ভাবতেই রবিনহুড উপসাগরের পাহাড়ী উপত্যকার দিকে এগিয়ে চললাম আমি আর লুসি।

১১ আগস্ট।

গতকাল শেষ করতে পারিনি লেখাটা, আজ যেভাবেই হোক শেষ করে ফেলব; এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই লিখতে বসেছি। রবিনহুড উপসাগরের কাছাকাছি পৌঁছেই মুখের বিষাদ ভাবটা কেটে গেল লুসির। চারপাশের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে খুশি মনেই এগোতে থাকলাম আমরা।

উপসাগরের একেবারে তীরের কাছের পাহাড়টার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ছোট্ট একটা সরাইখানা। প্রায় নির্জন সেই সরাইখানার খোলা একটা জানালার ধারে চা খাওয়ার জন্যে বসলাম আমরা। দূরের ঢেউ খেলানো চারণভূমি

থেকে ভেসে আসছে পশুর গলায় বাঁধা ঘন্টার সুরেলা মৃদু টুংটাং আওয়াজ। চা খেয়ে নিয়ে সরাইখানার আশপাশটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ঘুরে ঘুরে সেই পাহাড়ী অঞ্চলেই সারাটা দিন কাটিয়ে দিলাম, খিদে পেলেই এসে খেয়ে নিচ্ছিলাম সেই সরাইখানাটায়।

বিকেল গড়িয়ে আসতেই রওনা দিলাম বাড়ির দিকে। গতরাতের নিদ্রাহীনতা আর সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে ভেঙে আসছিল সারা শরীর। বাড়ি ফিরে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল লুসি। ঘুমোলে অদ্ভুত সুন্দর লাগে লুসিকে। হলপ করে বলতে পারি এসময় ওকে দেখলে চুমু খাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যেত আর্থার।

এই সময় হঠাৎ জোনাথনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। অনুভব করছি দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে তপ্ত অশ্রুর ধারা। ঈশ্বর, যেখানে, যে অবস্থায়ই থাকুক ও, তুমি ওকে দেখো।

কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার। নিজের অজান্তেই চমকে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। লুসির বিছানার দিকে চোখ পড়তেই অজানা আশঙ্কায় ধড়ফড় করে উঠল বুক। বিছানা খালি। বিদ্যুৎ বেগে ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে চাইলাম, দরজা খোলা। ব্যাপারটা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না আমার। ঘুমের ঘোরেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে লুসি। একলাফে বিছানা থেকে নেমে আলনা থেকে একটা শাল টেনে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবলাম এত রাতে নিশ্চয়ই বাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না লুসি। তাই নিচে নেমে নিচের সব ক'টা ঘর খুঁজে দেখলাম। পাওয়া গেল না ওকে। বাগানেও নেই। মাথাটা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হল আমার। কোথায় গেল লুসি? হঠাৎ খেয়াল হল বৈঠকখানার ঘরটা দেখা হয়নি এখনও। একছুটে এসে ঢুকলাম বৈঠকখানায়, নেই লুসি; কিন্তু ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা খোলা। যতদূর মনে পড়ে, প্রতিরাতেই শুতে যাবার আগে বৈঠকখানার ওই দরজাটা বন্ধ করে যায় দারোয়ান। আন্দাজ করলাম, ওই পথেই বেরিয়ে গেছে লুসি। কোনকিছু বিবেচনা না করেই ওই দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পথে এসে নামলাম।

যতদূর চোখ যায় জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ল না পথের কোথাও। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় দূরের গির্জায় চূড়াটা চোখে পড়ছে। ঢং করে একটা বাজার ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল এই সময়, ওটা গির্জার বিশাল ঘড়ির ঘন্টার আওয়াজ। কেন যেন মনে হল ওই গির্জার দিকেই গেছে লুসি, হয়ত

এতক্ষণে গিয়ে শুয়ে পড়েছে ওই প্রাচীন বেদিগুলোর একটায়। বেদিগুলোর প্রতি লুসির আকর্ষণের কথা জানা আছে আমার।

দ্রুত এগিয়ে চললাম গির্জার দিকে। অস্বাভাবিক থমথমে চারদিকটা। একটু ভয় ভয় করতে লাগল। তবু মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে হাঁটতে থাকলাম। গির্জার সমাধিভূমির কাছে পৌছে প্রথম কয়েকটা বেদি পেরিয়ে আসার পরই চোখে পড়ল সেই বেদিটা। যেটায় বসে ডায়েরী লিখেছিলাম আমি, যেটায় মরে পড়ে ছিলেন বৃদ্ধ মি. সোয়ালেজ।

চাঁদের আলোয় দূর থেকেই বেদিটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেদিটার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লুসি।

ওর ওপর ঝুঁকে আছে কালো মত কি যেন একটা। ওটা মানুষ না পশু? আশঙ্কায়, ভয়ে ধুকপুক করছে বুকের ভেতরটা। এগিয়ে যাব কি যাব না ভাবছি। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে না থেকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলাম লুসিকে।

মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল কালো মূর্তিটা। মানুষই। কিন্তু মানুষের এমন চেহারা জীবনে দেখিনি আমি। মরা মানুষের মুখের মত পাংশুটে ফ্যাকাসে মুখ, চোখ দুটো রুবী পাথরের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এক মুহূর্তের জন্যে আমার দিকে চেয়ে থাকল ওই অদ্ভুত মানুষটা, তারপরই দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে গায়ের কালো আলখাল্লার দুটো প্রান্ত ডানার মত করে মেলে বিশাল একটা বাদুড় হয়ে যেন উড়ে গেল আকাশে।

দেখে একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত শিরশির করে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল নিচের দিকে, বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল হৃৎপিণ্ডের গতি। ভুল দেখলাম না তো! কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, পায়ের কাছে সরসর শব্দ হতেই চেঁচিয়ে উঠে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ালাম। নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম আমার চেঁচানিতে আমার চেয়ে দ্বিগুণ ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছে একটা মেঠো ইঁদুর।

আর দেরি না করে বেদিটার কাছে এগিয়ে গেলাম। অচেতনের মত বেদির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে লুসি। অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট দুটো। লুসিকে নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলাম কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ওর শ্বাসপ্রশ্বাস। থরথর করে কাঁপছে সারা গা। ভাবলাম শীত করছে লুসির। তাড়াতাড়ি গা থেকে শালটা খুলে নিয়ে ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। জড়ানর সময় ওর গলার কাছে আমার হাতের চাপ লাগায় মনে হল খানিকটা ব্যথা পেয়েই অস্ফুট শব্দ করে উঠল লুসি। আস্তে করে গায়ে ঠেলা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে সাড়া দিল না লুসি, শেষে অচেতন লোকের চেতনা ফিরে পাবার মত ধীরে ধীরে চোখ মেলল

সে। আমাকে দেখে একটুও অবাক হল না লুসি, যেন নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে সে, আর আমি ওর ঘুম ভাঙাচ্ছি। কোন কথা না বলে বাচ্চা মেয়ের মত দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আবার চোখ মুদল লুসি। বুঝতে পারলাম, গভীর ঘোরের ভেতর আছে এখন সে।

জোর করে ওকে বেদি থেকে তুলে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। নিঝুম জ্যোৎস্নায় খাঁখাঁ করছে চারদিক। দমকা হাওয়ায় মাথার ওপর এক ধরনের ঝিরঝিরে ভৌতিক শব্দ করছে বার্চের পাতা। এছাড়া বাড়ি ফেরার পথে আর কোনরকম শব্দ বা কোন জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়ল না। লুসির জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। পথ চলতে চলতেই স্থির করলাম লুসি নিজে থেকে না বললে ওর এই নিশীথ অভিসারের কথা কাউকে বলব না, এমনকি ওর মা'কেও না। আর চাঁদের আলোয় গির্জার ওই প্রাচীন বেদির কাছে যে ঘটনাটা ঘটল তা তো কাউকেই বলা যাবে না, কারণ বললে বিশ্বাস তো করবেই না কেউ, উল্টে পাগল ঠাওরাবে আমাকে।

ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুইয়ে দিলাম লুসিকে। সাথেসাথেই ঘুমিয়ে পড়ল ও। আমার কিন্তু সহজে ঘুম এল না। পুবদিকের জানালাটার দিকে চেয়ে চেয়ে একটু আগে দেখা ঘটনাগুলোর কথা ভাবতে লাগলাম আমি। হঠাৎ মনে হল কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে আসছে চাঁদের আলো। বুঝলাম, ভোর হয়ে গেছে।

১২ আগস্ট।

সকাল থেকেই দিনটা আজ ভারি সুন্দর। ভোরের দিকে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল লুসি। শিশিরভেজা ফুলের পাপড়ির মত চোখ মেলল ও একসময়। সারা মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্নমাত্র নেই। অন্যান্য দিনের চাইতে আজ ওকে বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে, অস্থিরতাও যেন কমে গেছে একটু। ওর গলার কাছে চোখ পড়তেই দেখলাম একপাশে কণ্ঠনালীর খুব কাছে সুচ ফোটানর মত ছোট ছোট দুটো ক্ষতচিহ্ন, ধবধবে সাদা রাতের পোশাকেও দু'এক ফোঁটা রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। কেমন করে আঘাত পেল লুসি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কিছুই বলতে পারল না ও।

নাস্তা সেরে দু'জনেই মালগ্রেভ উডের দিকে বেড়াতে বেরোলাম। সারাটা সকাল আর দুপুর মালগ্রেভ উডের আশপাশে কাটিয়ে বিকেলের দিকে ঘরে ফিরে এলাম। কিছু খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার। সন্ধ্যায় ক্যাসিনো টেরাসে গিয়ে উপভোগ করলাম ম্যাকেঞ্জির অনন্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। ওখান থেকে ফিরে একটু সকাল সকালই খেয়েদেয়ে বেডরুমে এসে ঢুকলাম দু'জনেই। লুসি তখন কাপড় বদলাতে ব্যস্ত, ওর অলক্ষ্যে ভেতর থেকে দরজায় তালা আটকে দিয়ে চাবিটা

রেখে দিলাম নিজের কাছে।

মাঝ রাতে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখলাম ঘর অন্ধকার। পরিষ্কার মনে আছে বাতি জ্বালিয়ে রেখেই বিছানায় শুতে গিয়েছিলাম, তাহলে বাতিটা নেভাল কে? লুসি? টের পেলাম কে যেন দরজা খোলার চেষ্টা করছে, কিন্তু তালা মারা থাকায় খুলতে পারছে না। সেদিকে তাকিয়ে সাদা রাত্রিবাস পরা লুসির অবয়ব আবছাভাবে চোখে পড়ল। উঠে গিয়ে ওকে জোর করে দরজার কাছ থেকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম, প্রায় সাথেসাথেই ঘুমিয়ে পড়ল লুসি। একটু পরই আবার উঠে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোনর চেষ্টা করল সে। কিন্তু দরজায় তালা দেয়া থাকায় এবারও বেরোতে পারল না। সারা রাতে দুই দুইবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ভোরের দিকে ঢলে পড়লাম দু'জনেই। ঘুম ভাঙতে দেখলাম জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে সকালের মিষ্টি রোদ।

১৩ আগস্ট।

নিরুদ্বিগ্নভাবেই কেটে গেল আরও একটা দিন। আজও শোবার আগে দরজায় তালা মেরে চাবিটা নিজের কাছে রেখে দিলাম। মাঝরাতে অকারণেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে দেখলাম বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসে জানালার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লুসি। একটু অবাক হয়ে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে খোলা জানালার দিকে চাইলাম। কিছু চোখে পড়ল না। বিছানা থেকে উঠে ভাল করে দেখার জন্যে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। রূপালী জ্যোৎস্নায় আকাশ আর পৃথিবীটাকে কেমন যেন রহস্যঘন এক নিস্তব্ধ নতুন জগৎ বলে মনে হচ্ছে। ঠিক সেই সময় দেখলাম ওটাকে। আমার ঠিক মাথার ওপরের আকাশে পাক খেতে খেতে উড়ছে একটা প্রকাণ্ড বাদুড়। সাঁ করে হঠাৎ আমার দু'হাত দূরে চলে এল বাদুড়টা। এত কাছে থেকে ওর জ্বলজ্বলে লাল অদ্ভুত চোখ দুটো দেখে কেন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। আরও বারদু'য়েক আমার কাছাকাছি উড়ে এল বাদুড়টা। মনে হল জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে চাইছে ওটা, কিন্তু আমার জন্যে পারছে না। আরও কয়েকবার পাক খেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে গির্জার দিকে গেল বাদুড়টা, তারপর গির্জার চূড়া পেরিয়ে সোজা চলে গেল সাগরের দিকে। বাদুড়টা চলে যেতেই বিছানায় লুটিয়ে পড়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল লুসি। ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগল আমার কাছে।

১৪ আগস্ট।

বিকেলে ওয়েস্ট পিয়ের থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে সেই বেদিটার ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথে হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা করছিল। হালকা সাদা মেঘগুলোকে রক্তের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে পশ্চিম আকাশে এখন অস্ত

যাচ্ছে সূর্য। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে তাই দেখছিলাম। পাশে বসা লুসির হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠে ওর দিকে ফিরে চেয়ে দেখলাম, হুইটবি গির্জার চূড়ার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সে। গির্জার চূড়ার কাছটায় ছোট্ট জানালার রঙিন কাঁচে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা পড়ে এক অপূর্ব বর্ণালীর সৃষ্টি করেছে! আমি লুসির দিকে চাইতেই সেই রঙিন কাঁচের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল সে, 'ঠিক ওর চোখ দুটোর মতন রঙিন আর জ্বলজ্বলে।'

ঠিক বুঝতে পারলাম না লুসির কথা। কার চোখের কথা বলছে সে? অকারণেই দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকলাম।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ফিরেই মাথা ধরেছে বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল লুসি, আমি চলে এলাম বাগানে। এই সন্ধ্যা বেলায়ই ঘুম আসবে না আমার, তাছাড়া মন জুড়ে ভিড় করে আছে নানারকম চিন্তা। এগিয়ে গিয়ে কোণের দিকে একটা বেঞ্চিতে বসে জোনাথনের কথা ভাবতে থাকলাম। ততক্ষণ সেখানে বসে বসে ভেবেছি জানি না, চমক ভাঙল যখন মাথার ওপর উঠে এসেছে চাঁদ। হলুদ জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে সারাটা বাগানে।

লুসিকে একলা ঘরে ফেলে এসেছি। কথাটা মনে হতেই লাফ দিয়ে উঠে ওর ঘরের দিকে ছুটলাম। দূর থেকেই দেখলাম জানালার সামনে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লুসি, ওর সামনে কালো মত একটা কি যেন বসে আছে। ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়েও দাঁড়ালাম না। পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম। ওই কালো মত জিনিসটা কী দেখতেই হবে আমাকে। দু'গজের ভেতরে চলে যাবার পরেও আমার উপস্থিতি টের পেল না লুসি, কিন্তু নড়ে উঠল কালো জিনিসটা। এবার বুঝলাম আমার অচেনা কালো রঙের একটা বিশাল পাখি ওটা। চেঁচিয়ে ডাকলাম লুসিকে, কোনরকম সাড়া দিল না লুসি, কিন্তু তড়িতাহতের মত লাফ দিয়ে উঠল পাখিটা। পরমুহূর্তে ডানা মেলে ভেসে গেল বাতাসে। স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম পাখিটা একটা বাদুড়। চিরদিন জেনে এসেছি মাথা নিচু করে নিচের দিকে ঝুলে থাকে বাদুড়েরা, কিন্তু আজ নিজের চোখে আর সব সাধারণ পাখিদের মত জানালার চৌকাঠে বসে থাকতে দেখলাম একটা বাদুড়কে। আসলে বাদুড় কিনা ওটা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। বাদুড়টা চলে যেতেই এগিয়ে গিয়ে লুসির কাঁধে হাত রাখলাম, চমকে আমার দিকে ফিরে চাইল সে। কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর চেহারা। খোলা জানালা দিয়ে হিমেল হাওয়ায় ভর করে হুহু করে ঘরে ঢুকছে হাস্নাহেনার মিষ্টি গন্ধ, সেই গন্ধকে ছাপিয়ে লুসির গা থেকে কেমন যেন একটা বোঁটকা গন্ধ ছড়াচ্ছে। জীবিত কোন মানুষের গা থেকে আসতে পারে না ওরকম বোঁটকা পচা গন্ধ। তাহলে? ওই রহস্যময় বাদুড়টাই কি এর কারণ?

১৭ আগস্ট।

কিছু লিখতে পারিনি গত তিনদিন। অবশ্য লেখার মত মানসিকতাও ছিল না। আজও নেই, তবু জোর করেই লিখতে বসেছি। জোনাথনের খবর নেই, এদিকে লুসিও দিন দিন কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওর চিন্তায় লুসির মা-ও প্রায় শয্যাশায়ী হতে চলেছেন। ওদিকে লুসির বিয়ের দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে। সবদিকেই কেমন যেন একটা গোল পাকানো ভাব।

সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে লুসি। যতই দিন যাচ্ছে মরা মানুষের মত কেমন যেন বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ওর গায়ের রঙ, অথচ কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

কাল রাতে জানালার ধারে আবার দেখেছি সেই রহস্যময় বাদুড়টাকে। সেদিনের মত ঠিক তেমনিভাবে জানালার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লুসি, আর ওর কাছে বসে ছিল বাদুড়টা। আমার সাড়া পেয়েই আকাশে উড়ে যায় ওটা। জানালার কাছ থেকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলাম লুসিকে। শোয়ানর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল লুসি। কম্বলটা ওর গায়ে টেনে দিতে গিয়েই ওর গলার পুরানো ক্ষতটার ওপর চোখ পড়ল আমার। ঘা-টা তো শুকোয়ইনি, বরং বেড়েছে। ডাক্তার না দেখালে আর চলছে না।

১৮ আগস্ট।

অকারণেই সকাল থেকে মনটা ভাল লাগছে আজ। লুসিকেও অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে গির্জার সেই বেদিটায় বসে একটানা বকবক করে চললাম দু'জনে। গত কয়েক রাতে ওর আশ্চর্য ব্যবহারের কথা জিজ্ঞেস করলাম লুসিকে। প্রথমে সে ভাল মত স্মরণ করতে পারল না কিছু। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও প্রশ্ন করতেই বলল, 'ঠিক বলতে পারব না, মিনা, তবে মনে হয় স্বপ্ন ওগুলো। সবকিছুই স্পষ্ট, অথচ কেমন যেন দুর্বোধ্য। সারাক্ষণ খালি মনে হয়, এই বেদিটায় এসে বসি, কিন্তু কেন বলতে পারব না। সব সময় একটা অজানা ভয় ভর করে থাকে আমাকে, অথচ কিসের ভয় বোঝাতে পারব না। রাতের বেলা হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বসি বিছানায়। আশ্চর্য, হাজার হাজার নেকড়ের হিংস্র গর্জন শুনতে পাই তখন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজোড়া লাল টকটকে উজ্জ্বল চোখ, সেদিন সূর্যাস্তের সময় গির্জার রঙিন কাঁচগুলো যেমন দেখাচ্ছিল, ঠিক তেমনি প্রচণ্ড আকর্ষণে কাছে টানতে থাকে আমায় ওই চোখ দুটো। ওই চোখ দুটোর ডাকে সাড়া দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত টলতে টলতে এগিয়ে যাই, তারপর আর কিছু মনে থাকে না। হঠাৎই তীব্র নাড়া খেয়ে ঘোর কেটে যায়, দেখি পাশে দাঁড়িয়ে আছিস তুই।

মনটা গভীর চিন্তায় ছেয়ে গেলেও 'ও কিছু না' বলে লুসিকে সান্ত্বনা দিলাম আমি। একটু পরে খুশি মনেই বাড়ি ফিরে এলাম দু'জনে। আমাদের দু'জনকে হাসতে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন লুসির মা-ও। বহুদিন পর সন্ধ্যাটা চমৎকারভাবে কাটল আজ।

১৯ আগস্ট।

দারুণ খুশিতে লাফাতে ইচ্ছে করছে আজ। কারণ একটু আগে জোনাথনের খবর পেয়েছি। যা ভেবেছিলাম তাই, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়েছিল সে। বুদাপেস্টের সেন্ট জোসেফ হাসপাতালের সিস্টার আগাথার লেখা চিঠিটা ঠিকানা পাল্টে লুসিদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন মি. হকিন্স। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়ে নাকি গত ছ'সপ্তাহ ধরেই হাসপাতালে পড়ে আছে জোনাথন, এখন অবশ্য অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। শীঘ্রিই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে যাচ্ছে সে। ছাড়া পাবার পর নাকি সব সময় কাউকে না কাউকে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছি, পোশাকটা শুধু পাল্টানো বাকি আছে। এখান থেকে সোজা যাব লণ্ডনে, সেখান থেকে বুদাপেস্ট। জোনাথন, আমার জোনাথন। ওকে চোখে না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাব না এখন। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে, তাই ডায়েরীর পাতায় সেঁটে রাখার আগে আর একবার পড়লাম চিঠিটা।

সেন্ট জোসেফ হাসপাতাল,
বুদাপেস্ট।
১২ আগস্ট।

ডিয়ার ম্যাডাম,

মি. জোনাথন হারকারের ইচ্ছানুসারেই জানাচ্ছি আপনাকে, প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়ে গত মাস দেড়েক ধরে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে আছেন তিনি। সেন্ট জোসেফ এবং মেরী মায়ের কৃপায় এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি, কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে নিজ হাতে চিঠি লিখেও আপনাকে জানাতে পারছেন না।

অহেতুক বিলম্বের জন্যে মি. হারকার ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভারপ্রাপ্ত কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন তিনি, একথা আগেই চিঠি লিখে এগজিটারের মি. হকিন্সকে জানিয়েছি আমি।

মি. হারকারের এই দুঃসময়ে আপনার সাহচর্য বিশেষভাবে কামনা করছেন

উনি। অনেক আগেই আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতাম, কিন্তু মি. হারকারের স্মৃতিশক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনার ঠিকানা আমরা জানতে পারিনি। অবশ্য জানা সম্ভবও ছিল না, যদিও সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টাই আমরা করেছি।

আশা করছি, পত্র পাওয়ামাত্র এখানে চলে আসবেন আপনি। মি. হারকারের রোগমুক্তি এবং আপনার শুভাগমন কামনা করে শেষ করছি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে,
সিস্টার আগাথা।

—

সাত

হুইটবির স্যামুয়েল এফ বিলিংটন এণ্ড সলিসিটরস-এর লেখা একটা চিঠি পায় লণ্ডনের মেসার্স কার্টার প্যাটারসন অ্যাণ্ড কোং। চিঠিটা এই রকমঃ

১৭ আগস্ট।

ডিয়ার স্যার,

গ্রেট নরদার্ন রেলওয়ে কর্তৃক প্রেরিত মালপত্রের চালান দলা করে গ্রহণ করুন। মক্কেলের ইস্থানুসারে, কিংস ক্রস রেলস্টেশন থেকে কাঠের বাক্সগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে পারফ্লিটের কাছে কারফাক্সে পৌঁছে দেবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওখানকার প্রাচীন গির্জা সংলগ্ন বাড়িটা খালিই পড়ে আছে এখন। চালানের সঙ্গে বাড়ির দুটো চাবির একটা পাঠালাম। পারিশ্রমিক বাবদ দশ পাউণ্ডের চেকের প্রাপ্তিস্বীকার করে চিঠির জবাব দেবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্যামুয়েল এফ বিলিংটন অ্যাণ্ড কোং।

চিঠি পাওয়ার পরপরই জবাব পাঠালেন মেসার্স কার্টার প্যাটারসন অ্যাণ্ড কোং।

২১ আগস্ট।

ডিয়ার স্যার,

নির্দেশ মোতাবেক আপনার মক্কেলের পঞ্চাশটা কাঠের বাক্স যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আমাদের পারিশ্রমিক রেখে দশ পাউণ্ডের

চেক থেকে উদ্ধৃত এক পাউণ্ড সতেরো শিলিং নয় পেন্স ফেরত পাঠালাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
কার্টার প্যাটারসন অ্যাণ্ড কোং।

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

১৯ আগস্ট।

গতরাত থেকেই অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে রেনফিল্ডের মধ্যে। রাত আটটার পর থেকেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে বেড়াতে থাকে চারদিকে। ওর এই আচরণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় তখনকার হাসপাতালে ডিউটিরত নার্স। রেনফিল্ডের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে সে। এমনিতে নার্সদের সাথে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না রেনফিল্ড, কিন্তু গতরাতে ডিউটিরত নার্সের সাথে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছে সে। তার দুর্ব্যবহার গায়ে না মেখে বার বার প্রশ্ন করে গেছে নার্স। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছে রেনফিল্ড, 'দেখ, তোমার সাথে অযথা বকবক করবার এখন সময় নেই আমার। দেখছ না, স্বয়ং প্রভু এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে?'

এর পরপরই আমাকে এসে খবর দিল নার্স। ন'টা নাগাদ রেন-ফিল্ডকে দেখতে গেলাম আমি। পাত্তাই দিল না আমাকে সে। আমিও ওকে না খুঁচিয়ে চুপচাপ ওর ভাবগতিক লক্ষ করতে থাকলাম। আমি যাবার পরও প্রায় আধঘন্টা পর্যন্ত অস্বাভাবিক উত্তেজিত ভাবটা ছিল রেনফিল্ডের মধ্যে, তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে থাকে সে। আলতোভাবে মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাতে দোলাতে বিছানার কাছে গিয়ে শান্তভাবে বিছানার এক প্রান্তে বসে পড়ে বোবা দৃষ্টি মেলে জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল রেনফিল্ড। কোনকিছুর গতিবিধি লক্ষ্য করছে যেন সে।

ওর সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম, অবশ্য ওর প্রিয় পশু-পাখি পোকা-মাকড় দিয়েই। কিন্তু খেপে উঠে বলল রেনফিল্ড, 'বাজে বকবেন না, ডাক্তার। এখন ওসব কথা শুনতে চাই না আমি।'

'বলছ কি, রেনফিল্ড!' অবাক হবার ভান করে বললাম, 'এরই মাঝে মাকড়সা আর চড়ুইগুলোর কথা বেমালুম ভুলে গেলে?'

'ওদের জন্যে এখন আমার আর কিছুই করার নেই।' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল রেনফিল্ড। একটু মুচকে হেসে আবার বলল, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, কনে বিয়ের আসরে না পৌছানো পর্যন্ত হাসি আনন্দে উচ্ছল হয়ে থাকে

তার সখীরা, কিন্তু কনে পৌছামাত্র বিষাদে ভরে যায় তাদের মন।'

রেনফিল্ডের এ হেঁয়ালিপূর্ণ কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না। এখন আর ওর কাছ থেকে কোন সঠিক জবাব পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে নার্সকে ওর প্রতি কড়া নজর রাখতে বলে ফিরে এলাম আমি।

কেন জানি বড় ক্লান্ত, বড় বিষণ্ন লাগছে আজ, লুসি। বারবার মনে পড়ছে তোমার কথা। বুঝতে পারছি ঘুম না এলে আজও মরফিয়া নিতে হবে, অবশ্য তোমার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পর রোজ রাতেই মরফিয়া নিতে হয়, নাহলে দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না সারারাত। কিন্তু আমি ডাক্তার, আমি জানি এটা অত্যন্ত বাজে অভ্যাস। ভাবছি আজ আর কিছুতেই নেব না ওটা, তাতে যদি ঘুম না আসে না আসুক।

বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করতে করতে দীর্ঘ বিনিদ্র প্রহরগুলো কেটে যেতে থাকল। যেন এক এক যুগ পর পর ঘন্টা বাজিয়ে সময় ঘোষণা করছে দেয়ালঘড়িটা। এভাবেই রাত একটা বাজল, তারপর দুটো। এই সময় এসে খবর দিল নাইট গার্ড, রেনফিল্ড পালিয়েছে। একলাফে বিছানা থেকে উঠে রেনফিল্ডের ওয়ার্ডের দিকে ছুটলাম। আমার জন্যেই অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছিল নার্স। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি, কি করে পালাল রেনফিল্ড?'

'মাত্র দশ মিনিট আগেও তার বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছি রেনফিল্ডকে, স্যার। হঠাৎ একটা সন্দেহজনক শব্দ কানে যেতেই সেদিকে তাকিয়ে দেখে নাইট গার্ড, জানালার গরাদ বাঁকিয়ে সে-পথে বেরিয়ে যাচ্ছে রেনফিল্ড,' একটু থেমে বলল নার্স, 'সাথে সাথে আমাকে এসে খবর দিল গার্ড।' বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ছুট লাগালাম রেনফিল্ড যেদিকে গেছে সেদিকে। বাঁ দিক ঘুরে বাগানের মধ্যে ঢুকে সারি সারি গাছের মাঝখান দিয়ে ছুট লাগাল রেনফিল্ড। প্রাণপণে অনুসরণ করে চললাম ওকে। ছুটতে ছুটতে একসময় হাসপাতাল আর কারফাক্সের বাড়িটার মাঝখানে পাঁচিলের কাছে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল রেনফিল্ড। তারপর দেয়াল বেয়ে উঠে লাফিয়ে পড়ল ওপাশে। ফিরে এসে চার-পাঁচজন লোক নিয়ে নাইট গার্ডকে আমাকে অনুসরণ করতে বলেই আবার ছুটলাম। কোনমতে সেই পাঁচিলটা ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে দেখলাম ধীর পায়ে কারফাক্সের বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে রেনফিল্ড। ওর অজান্তে আমিও অনুসরণ করে চললাম তাকে। পরিত্যক্ত, জীর্ণ বিশাল বাড়িটার শেষপ্রান্তের পুরানো গির্জাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল রেনফিল্ড, তার সাথে সাথে আমিও। আরাধনার ভঙ্গিতে গির্জার বিশাল এক কাঠের দরজার কাছে গিয়ে দরজার গায়ে মুখ ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে ভেতরের কার সাথে যেন কথা বলছে রেনফিল্ড, একটু দূরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে

লাগলাম আমি। ভক্তিভরে মন্ত্রোচ্চারণের মত ভরাট গলায় বলে চলেছে রেনফিলডঃ প্রভু, তোমার আদেশ পেয়েই এখানে এসেছি আমি। তোমার এ দীন-হীন ক্রীতদাসকে কৃতার্থ করো। দীর্ঘদিন ধরে তোমারই সাধনা করেছি আমি। আজ ডেকেছই যদি, পায়ে ঠেলে দিও না। তোমার করুণা ভিক্ষা চাইছি, শুধু তোমার করুণা পেলেই বর্তে যাব আমি।

'এতক্ষণে লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেছে নাইট গার্ড। আমার নির্দেশে দু'দিক থেকে গিয়ে রেনফিল্ডকে চেপে ধরল ওরা। কিন্তু ক্রুদ্ধ সিংহের মত গা ঝাড়া দিয়ে ওদের সব ক'জনের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রেনফিল্ড। ওর মত স্বাস্থ্যের একজন লোক এত শক্তি কোথায় পেল বুঝতে পারলাম না।'

'কিন্তু কোথায় এখন ও?' অধৈর্য হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হাতে-পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে হাসপাতালের ওদিককার একটা কয়েদখানায় আটকে রেখেছি।' আঙুল তুলে ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দিল নার্স। তারপর আবার বলল, 'ওকে বেঁধে নিয়ে আসার সময়ওঃ প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। করুণা করো, যতদিন না তোমার সময় হয় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করব আমি।—বলতে বলতে এসেছে রেনফিল্ড।'

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

বুদাপেস্ট, ২৪ আগস্ট।

হামবুর্গ পর্যন্ত জলপথে এসে ট্রেন ধরে শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয় বুদাপেস্টে এসে পৌঁছেছি। বুদাপেস্ট হাসপাতালে পৌঁছে জোনাথনের অবস্থা দেখে দু'চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে আমার। সাংঘাতিক রোগা হয়ে গেছে জোনাথন, শুধু ওর অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটো আমার চেনা না থাকলে চিনতেই পারতাম না ওকে। ওর শরীর আর মনের ওপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তা দেখলেই অনুমান করা যায়। অতীতের কোনকিছুই এখন স্পষ্ট স্মরণ করতে পারছে না সে। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে, এখন ওকে জোর করে কিছু ভাবানর চেষ্টা করলে ওর মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীতে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। হাসপাতালের নার্স সিস্টার আগাথাকে জোনাথনের মানসিক আঘাতের কারণ যতবার জিজ্ঞেস করেছি ততবারই বুকে ক্রুশ এঁকে চোখ বড় বড় করে বলেছেন, কোনকিছুর বিনিময়েই তা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সিস্টার আগাথার মত মিষ্টি স্বভাবের মহিলার এ-আচরণ যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

এক সময় একলা পেয়ে ওর এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে একটা ছোট্ট খাতা আমার হাতে তুলে দিয়ে ম্লান কণ্ঠে বলল জোনাথন, 'মিনা, এটা পড়ে দেখো,

অনেক অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ঘটনা জানতে পারবে। কিন্তু পড়ে আর সবার মত তুমিও ভুল বুঝো না আমাকে। ইচ্ছে করে ওই ভয়ঙ্কর তিন ডাইনীর সাথে প্রেম করিনি আমি, করেছি শুধু প্রাণের দায়ে। না হলে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে আমাকে ছিবড়ে বানিয়ে নেকড়েদের মুখে ছেড়ে দিত পিশাচ কাউন্ট ড্রাকুলা।'

জোনাথনের হাত থেকে ছোট্ট খাতাটা নিয়ে সেখানে বসেই পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠতে থাকলাম। পড়া শেষ হলে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে জিজ্ঞেস কারলাম, 'কিন্তু, জোনাথন, কাউন্ট ড্রাকুলা তোমাকে দিয়ে কি করিয়ে নিতে চেয়েছিল?'

'চেয়েছিল নয়, মিনা, বলো, করিয়ে নিয়েছে। ওর আকাঙ্ক্ষিত ইংল্যাণ্ডের সব ক'টা বাড়ি দালালি করে আমি ওকে কিনে দিয়েছি। ঈশ্বরই জানেন, কোন্ ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে ওই পুরানো পোড়ো বাড়িগুলো কিনেছে শয়তানটা।' কথাগুলো বলে জিরিয়ে নেবার জন্যে একটু থামল জোনাথন। তারপর হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে বলল, 'মিনা, আমি আর দেরি করতে চাই না। চলো, তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলি।'

জোনাথনের কথায় বেশ কয়েক সেকেণ্ড কোন জবাব দিতে পারলাম না। তারপর ধীরে ধীরে উবু হয়ে চুমো খেলাম ওর রক্তশূন্য শুকনো খসখসে ঠোঁটে।

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

২০ আগস্ট।

দিন দিন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে রেনফিল্ডের কেসটা। সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে প্রায় সপ্তাহখানেক পরে যখন-তখন সাংঘাতিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অসহ্য চেঁচামেচি জুড়ে দিত সে। কিন্তু তারপর গত পূর্ণিমার রাত থেকে হঠাৎ করেই একেবারে চুপ হয়ে গেছে সে, শুধু মাঝে মাঝে আপনমনেই বিড়বিড় করে 'আর চেঁচাব না আমি, প্রভু, এখন থেকে তোমার নির্দেশের অপেক্ষাই করব। তাতে যদি আমাকে আজীবন অপেক্ষা করতে হয়, তাও সই।'

রেনফিল্ডের এই হঠাৎ শান্ত হয়ে যাওয়ার খবর শুনে সেদিন তাকে দেখতে গেলাম। আচ্ছন্ন ভাবটা ওর চেহারা থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে, তার পরিবর্তে সেখানে ফুটে উঠেছে প্রসন্ন উজ্জ্বলতা। ওর এই অবস্থা দেখে খুশি হলাম, ভাবলাম বোধহয় সেরে যাচ্ছে ওর পাগলামি। নার্সকে ডেকে ওর পায়ের শেকল খুলে দিতে বললাম। আমার কথা শুনে রীতিমত আশ্চর্য হল নার্স। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল। শেকল খোলা হলে শান্ত ধীর পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এল রেনফিল্ড। নার্সের বিস্মিত মুখের দিকে ইঙ্গিত করে মৃদু হেসে বলল, 'ও ভেবেছে

বাঁধন খুলে দিলেই পালাব আমি, ব্যাটা বুদ্ধু কোথাকার।'

রেনফিল্ডের মত বদ্ধ পাগল চেহারা দেখে লোকের মনের কথা বলে দিতে পারে ভেবে অবাক লাগল। প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করে বললাম, 'রেনফিল্ড, বেড়াল চেয়েছিলে না তুমি? ভেবে দেখলাম আসলেই একটা বেড়াল তোমাকে দেয়া দরকার। তা ওটা কি আজই চাও নাকি?'

আগের মত মৃদু হেসেই জবাব দিল রেনফিল্ড, 'না, ডাক্তার, বেড়ালের আর প্রয়োজন নেই আমার। এখন অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছি আমি। ওসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভাবার চেয়ে ধৈর্য ধরে শুধু অপেক্ষা করব এখন আমি।'

কিসের অপেক্ষা করবে রেনফিল্ড? ভাবলাম, এটাও ওর এক ধরনের পাগলামি। আর কথা না বলে নিজের কামরায় ফিরে এলাম।

দিন দু'য়েক আর কোন খবর নেই। তার পরদিন সকালে ছুটতে ছুটতে এল নার্স। আবার পাগলামি শুরু করেছে রেনফিল্ড, এবার আগের চেয়েও খেপে গেছে। জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত একটানা চেঁচিয়ে লাফিয়ে হাসপাতালের কামরায় তুফান তুলে রাখে সে। পর পর তিন দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ওর এই আকস্মিক মানসিক পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। ক্ষণে ক্ষণে এই রূপ বদলানর পেছনে কি কোন ভয়ঙ্কর অশুভ অদৃশ্য শক্তির হাত আছে? ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করলাম। রেনফিল্ডের সাথে একটু অভিনয় করতে হবে। ওকে পালানর সুযোগ করে দিতে হবে। তারপর আড়ালে থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে ও কোথায় যায়, কি করে।

২৩ আগস্ট

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে, পালানর সব রকম সুযোগ পেয়েও পালাল না রেনফিল্ড, অথচ হাসপাতাল কক্ষে থেকে থেকে তার উপদ্রব বেড়েই চলল। খোলা দরজা দিয়ে হঠাৎ করেই ধাঁ করে বেরিয়ে এসে ডিউটিরত নার্সকে আক্রমণ করে বসে সে। ওর এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবার ওকে জানালা বন্ধ করে কয়েদ করে রাখার আদেশ দিলাম। এবং তারপরই আরেক অবাক কাণ্ড করে বসল সে। 'অপ্রত্যাশিত ঘটনাও কখনও কখনও ঘটে।'—ডিসরেইলির এই উক্তি সত্যি প্রমাণিত করে আবার পালাল রেনফিল্ড। এতদিন তাকে পালাবার সমস্ত সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও পালাল না, অথচ এখন জোর করে পালাল। এটাও কি এক ধরনের পাগলামি? নাকি আমরা যে ওকে ইচ্ছে করে পালাবার সুযোগ দিয়ে অনুসরণ করার তালে আছি এটা আগে থেকেই কোন রহস্যময় উপায়ে জেনে যায় সে?

নার্সের কাছে পরে শুনলাম, ঘরের কোণে চুপচাপ তৈরি হয়ে বসে ছিল রেনফিল্ড, নার্স ঘরে ঢুকতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে খোলা দরজা দিয়ে

একছুটে বাইরে বেরিয়ে যায় পাগলটা।

রেনফিল্ড পালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এসে আমাকে খবর দিল নাইট গার্ড। একমুহূর্ত দেরি না করে কয়েকজন লোক নিয়ে রেনফিল্ডকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। খুঁজতে খুঁজতে কারফাক্সের সেই পুরানো বাড়িটায় গিয়েই পাওয়া গেল ওকে। আগের বারের মতই গির্জার বিশাল কাঠের দরজায় মুখ চেপে দাঁড়িয়ে আছে রেনফিল্ড। আমাদের দেখেই প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ল সে। দাঁত খিঁচিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসতেই ওকে ধরে ফেলল আমার লোকেরা। আবার ওর হাতে-পায়ে লোহার শেকল পরিয়ে হাসপাতালে রওনা দিলাম। লাফিয়ে চেঁচিয়ে আমাদের কান ঝালাপালা করতে করতে চলল রেনফিল্ড। চলতে চলতেই হঠাৎ যেন কার অঙ্গুলি হেলনে আচমকা থমকে দাঁড়াল রেনফিল্ড, চেঁচানোও বন্ধ হয়ে গেল ওর। অবাক হয়ে ওর দিকে চাইতেই দেখলাম মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে আকাশের একদিকে চেয়ে আছে রেনফিল্ড। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় বিশাল একটা বাদুড় পশ্চিম আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। রাতের বেলা বাদুড়েরা আকাশে উড়বে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু এ বাদুড়টার কাজকারবার অন্যান্য সাধারণ বাদুড়ের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ডানা ঝটপট করার মৃদু শব্দ তুলে এঁকেবেঁকে উড়ে যাচ্ছে না ওটা। অনেক উঁচুতে চিল যেভাবে বাতাসে ডানা মেলে ভেসে থাকে তেমনি করে নিঃশব্দে উড়ে চলেছে বাদুড়টা। আর প্রায় অস্পষ্ট একটা হালকা ধোঁয়ার রেখা রেখে যাচ্ছে পেছনে। এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখা তো দূরের কথা, কখনও কারও কাছে শুনিনি পর্যন্ত। আস্তে আস্তে পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে গেল বাদুড়টা। যতক্ষণ দেখা গেল ওটা, স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রেনফিল্ড।

আশ্চর্য! তারপর কিন্তু আমাদের সাথে যেতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করল না রেনফিল্ড। কোন অশুভ শক্তির প্রভাব পড়েছে ওর ওপর, ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হল আমার মনে। চিন্তিতভাবে ফিরে এলাম হাসপাতালে।

আট

একত্রিশে আগস্ট আর্থার হোমউডের একটা চিঠি পেল ডাক্তার সেওয়ার্ড।

প্রিয় জন,

একটা বিশেষ উপকারের আশায় তোর হাসপাতালে এসেছিলাম। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও তোকে না পেয়ে এই চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। দিন কয়েক ধরে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে লুসি। দিনকে

দিন কেমন যেন দুর্বল আর রোগা হয়ে যাচ্ছে সে। লুসিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে কোন সদুত্তর পাইনি। ওর মা-ও বলতে পারছেন না কিছু। অথচ কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে রাজি হচ্ছে না ও। অনেক সাধ্য-সাধনা করে শেষ পর্যন্ত রাজি করানো গেছে ওকে, কিন্তু এক শর্তে, তুই ছাড়া আর কোন ডাক্তারের সাহায্য নেবে না সে। অতএব এবারের মত লুসিকে বাঁচা। হয়ত লুসির সামনে আসতে সঙ্কোচ বোধ করবি তুই, তোর অবস্থায় হলে আমিও তাই করতাম। কিন্তু অন্তত লুসির দিকে চেয়ে একবার আয়। কাল দুপুর নাগাদ তোর আগমন প্রত্যাশা করতে পারি কি?

তোর আর্থার।

পহেলা সেপ্টেম্বর আর্থারের কাছ থেকে আরেকটা ছোট্ট সংবাদ পেল সেওয়ার্ড।

প্রিয় জন,

বাবার অসুখ সাংঘাতিক রকম বেড়ে গেছে। অতএব এক্ষুণি বাড়ি রওনা হচ্ছি। লুসির ভার রইল তোর ওপর—

আর্থার।

যথাসময়েই লুসির বাড়িতে এসে পৌঁছল ডাক্তার সেওয়ার্ড। ভালমত ওকে পরীক্ষা করে দেখার পর সেদিনই আর্থারকে একটা চিঠি লিখে জানাল সে।

১ সেপ্টেম্বর, হুইটবি।

আর্থার,

যথাসময়েই লুসিদের বাড়ি এসে পৌঁছেছি। লুসিকে বার বার পরীক্ষা করেও ওর শরীরে কোন রোগের লক্ষণ আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু তবু কেন জানি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। গতবার ওকে যেমন দেখে গিয়েছিলাম তেমনটি আর নেই এখন ও। সন্দেহ হচ্ছে ওর রোগটা শরীরে নয়, মনে।

বার বার ওকে প্রশ্ন করে কিছু অদ্ভুত কথা জানতে পারলাম। মাঝে মাঝে শ্বাস নিতে নাকি ভীষণ কষ্ট হয় ওর, ক্লান্তিতে বুজে আসে দু'চোখের পাতা। ঘুমের মাঝে প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে, কিন্তু কি দেখেছে ঘুম ভাঙার পর তা আর মনে করতে পারে না। ছেলেবেলায় নাকি কখনও কখনও নিশিতে পেত ওকে, মাঝখানে বহুদিন ওটা আর হত না, বলতে গেলে সেরেই গিয়েছিল। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে আবার ফিরে এসেছে পুরানো অভ্যাসটা।

সবদিক ভেবে স্থির করেছি ওকে সুস্থ করে তোলা আমার একার সাধ্যে কুলাবে না। কাজেই আমার ওস্তাদ প্রফেসর ভ্যান হেলসিংকে খবর পাঠাচ্ছি। জানিসই তো, নানারকম জটিল ব্যাধি—বিশেষ করে মানসিক রোগ সারাতে আজকের পৃথিবীতে ওঁর জুড়ি মেলা ভার।

অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ প্রফেসর, তাঁর সময়ের অনেক দাম। কিন্তু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন উনি, আমি বললে তিনি না এসে পারবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে। কিচ্ছু ভাবিস না তুই! এসে যখন একবার পড়েছি চেষ্টার ত্রুটি রাখব না।

তোর জন।

ডাক্তার সেওয়ার্ডের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব পাঠালেন প্রফেসর অব্রাহাম ভ্যান হেলসিং।

২ সেপ্টেম্বর, আমস্টারডাম।

ডিয়ার জন,

কয়েক মিনিট আগে তোমার চিঠি পেলাম। চিন্তা করো না, এখুনি হুইটবির উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ছি আমি। ক্রিসেন্টের গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আমার জন্যে একটা ঘর ঠিক করে রেখো। আশীর্বাদান্তে,

ভ্যান হেলসিং।

৩ সেপ্টেম্বর আর্থারকে আর একটা চিঠি লিখল সেওয়ার্ড।

আর্থার,

বলেছিলাম না, আমি বললে আসবেনই প্রফেসর ভ্যান হেলসিং। আজ এখানে এসে পৌঁছেছেন তিনি, লুসিকে পরীক্ষাও করেছেন। লুসিকে দেখেই তার মুখ কেমন যেন থমথমে গম্ভীর হয়ে গেছে, যেন ভয়ঙ্কর কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছেন তিনি। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে শুধু বলেছেন লুসিকে আরও ভাল করে পরীক্ষা না করে কিছু বলতে পারবেন না উনি।

তবে আশার কথা, প্রফেসর এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটু সুস্থ মনে হচ্ছে লুসিকে। ডাক্তারের সংস্পর্শে এলেই রোগীর রোগ অর্ধেক সেরে যায়, লুসির ব্যবহার বোধহয় তাই প্রমাণ করছে।

অযথা দুশ্চিন্তা করবি না। তোর আব্বা এখন কেমন আছেন জানাবি।

তোর জন।

প্রথমবারের মত লুসিকে দেখা শেষ করে কিছু জরুরী কাজ সারতে

আমস্টারডামে ফিরে গেছেন প্রফেসর হেলসিং। সেওয়ার্ডকে বলে গেছেন, লুসির অবস্থা সম্পর্কে রোজ যেন টেলিগ্রাম করে তাঁকে জানানো হয়। কর্তব্যকাজে বিন্দুমাত্র গাফিলতি না করে যথারীতি প্রফেসরকে তারবার্তা পাঠিয়েছে সেওয়ার্ড। পাঠানো তারবার্তাগুলোঃ

৪ সেপ্টেম্বরঃ আজ রোগীর অবস্থা অনেকটা ভাল।

৫ সেপ্টেম্বর ঃ অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। ঘুম স্বাভাবিক। ক্রমশ কেটে যাচ্ছে চেহারার বিবর্ণ ভাবটা।

৬ সেপ্টেম্বরঃ হঠাৎ আজ অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। এক্ষুণি চলে আসুন।

এই দিনে আর্থারকেও একটা চিঠি লিখল জন।

আর্থার,

খবর ভাল না। হঠাৎ করে আজ সকাল থেকেই লুসির অবস্থা খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রফেসর হেলসিংকে আসতে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। তোকে কথাটা না জানালেও পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয় অবস্থার চাপ সহ্য করার মত মানসিক শক্তি তোর আছে। ঠিক করেছি, লুসির ব্যাপারে যাই কিছু করি তোকে না জানিয়ে করব না। হাজার হোক, ও তোর ভাবী স্ত্রী। ওর ভালমন্দের দায়িত্ব আমাদের চেয়ে তোর অনেক বেশি।

তোর জন।

নয়

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

৭ সেপ্টেম্বর।

ঘরে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং, 'লুসির রোগের কথা বিস্তারিত লিখে জানিয়েছ মি. হোমউডকে?'

'না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। তবে লুসি অসুস্থ এ-কথাটা জানিয়েছি ওকে।'

'বেশ করেছ। ওকে বিস্তারিত জানানর সময় আসেনি এখনও।'

'আসলে ব্যাপারটা কি, স্যার?'

'ব্যাপার একটা নিশ্চয়ই আছে। তবে আগে শিওর হয়ে নিই আমি, তারপর

বলব।'

'এখনই বললে হয় না? আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে...' প্রফেসরের মুখের দিকে চেয়েই থেমে গেলাম আমি।

'দেখো, সবকিছু জানারই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। তার আগে জানাও যেমন উচিত নয়, পরে জেনেও লাভ নেই। অতএব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে তোমাকে।'

বুঝলাম, সময় না এলে সারাক্ষণ চাপাচাপি করেও এর বেশি একটা কথা বের করা যাবে না প্রফেসরের মুখ থেকে। অগত্যা আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাকলাম।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন প্রফেসর, 'চলো, লুসিকে এবার দেখে আসি।'

সম্মতি জানিয়ে উঠে পড়লাম। কথা বলতে বলতে লুসিদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। আমার মুখে লুসির রোগের উপসর্গগুলোর বিস্তারিত বিবরণ শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর। এরপর সারা পথটায় আর একটা কথাও বললেন না তিনি। গভীর চিন্তান্বিতভাবে পথ চলতে লাগলেন।

লুসির ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলাম ওর চেহারা দেখে। গতকালও তো এমন ছিল না ও। বিবর্ণ পাংশুটে মুখ, শুকনো ম্লান দুটো ঠোঁট, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চিবুকের হাড়। ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। প্রফেসরের দিকে চেয়ে দেখলাম পাথরের মত কঠিন দেখাচ্ছে ওঁর মুখ, লোমশ ভ্রূ দুটো কুঁচকে লেগে রয়েছে একটার সাথে আর একটা। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি লুসির রোগজীর্ণ শরীরটার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন তিনি।

বাইরের ঝুল-বারান্দাটায় বেরিয়েই নিচু, গম্ভীর গলায় আমাকে বললেন, 'এক্ষুণি, এই মুহূর্তে ওকে রক্ত দিতে হবে, জন। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে রক্তের অভাবে মৃত্যু ঘটতে পারে ওর।'

'এত তাড়াতাড়ি তো বাইরে কোথাও থেকে রক্ত জোগাড় করা যাবে না। আমার রক্তের গ্রুপ ওর সাথে মেলে কিনা একবার দেখে নিন, স্যার।'

'এটা এমন একটা কেস, জন, যে এসব রোগীকে রক্ত দিতে হলে রক্তের গ্রুপ মেলাবার দরকার পড়ে না। যে-কোন গ্রুপের মানুষের রক্ত হলেই হল। এখন এসো আমার সাথে। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিচে রেখে এসেছি।'

'চলুন।'

নিচে নেমেই বুঝলাম কে যেন ড্রইংরুমে দরজার কড়া নাড়ছে। এগিয়ে গিয়ে

দরজা খুলে দিয়েই চমকে উঠলাম, চেহারায় গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর্থার। আমাকে দেখেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'খবর কি, জন। লুসি কেমন আছে?' বলেই আমার পেছনে দাঁড়ানো প্রফেসরের দিকে চোখ পড়তে বলল, 'ইনিই বোধহয় প্রফেসর হেলসিং?'

আমি সম্মতি জানাতেই প্রফেসরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওঁর একটা হাত চেপে ধরল আর্থার, 'আঃ, বাঁচালেন আমাকে, প্রফেসর। আপনি এসে পড়ায় সত্যিই নিশ্চিন্ত হচ্ছি আমি।'

'ঠিক সময়েই এসে পড়েছ দেখছি তুমি। ভালই হল,' বললেন প্রফেসর। কিন্তু মুখ দেখে আমার মনে হল আর্থারের উপস্থিতিতে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না প্রফেসর। বোধহয় তাঁর কাজে বাধার আশঙ্কা করছেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্থারের উদ্বেগ লক্ষ্য করে বললেন, 'এসময়ে তোমার সহযোগিতার দরকার আছে লুসির।'

'কি করতে হবে শুধু আদেশ করুন, প্রফেসর। লুসির জন্যে শরীরের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু পর্যন্ত দিতে রাজি আছি আমি।'

'ভেরি গুড। তবে আপাতত সবটুকু রক্তের দরকার নেই, খানিকটা হলেই চলবে,' বলে হাসলেন প্রফেসর।

প্রফেসরের কথাটা ঠিক বুঝেতে পারল না আর্থার। বুঝতে পেরে বললেন প্রফেসর, 'লুসিকে রক্ত দেয়া প্রয়োজন, আর্থার। একটু আগে জনই রক্ত দিতে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তুমি যখন এসেই পড়েছ...'

'আমি রাজি। এক্ষুণি কি দরকার?'

'এক্ষুণি দরকার। চলো, আর দেরি না করে প্রয়োজনীয় কাজটুকু সেরে ফেলি।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আর্থারকে সতর্ক করে দিলেন প্রফেসর, 'সাবধান, আর্থার। অযথা হৈ-চৈ করে লুসির ঘুম ভাঙাবে না। আর যদি নিজে নিজেই ও জেগে ওঠে তাহলেও উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে এমন কোন কথা বলবে না লুসির সাথে।'

'নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন আপনি, প্রফেসর।'

'গুড।'

তিনজনেই এসে দাঁড়ালাম লুসির ঘরের সামনের ঝুল-বারান্দায়। প্রফেসরের নির্দেশে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল আর্থার। আমরা দু'জনে ঘরে ঢুকলাম। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তখন লুসি। আমাদেরকে ঘরে ঢুকতে দেখেও তার চেহারায় কোন ভাবান্তর হল না। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে শুধু আমাদের দিকে চেয়ে থাকল।

ব্যাগ হাতে ধীরেসুস্থে এগিয়ে লুসির বিছানার পাশে বসলেন প্রফেসর। ব্যাগ থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করে তাতে ওষুধ ভরে ইঞ্জেক্ট করে দিলেন লুসির শরীরে। কয়েক সেকেণ্ড পরই অতি ধীরে চোখের পাতা মুদে ফেলল লুসি। ভারি হয়ে এল ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। আবার গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল সে।

আর্থারকে ডাকতে বললেন আমাকে প্রফেসর। আর্থার ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'কোটটা খুলে ফেলো, আর্থার।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'জন, এসো, ওই টেবিলটা ধরে লুসির বিছানার পাশে নিয়ে আসি।'

টেবিলটা বিছানার পাশে এনে রাখতেই, আর্থারকে তাতে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন প্রফেসর। আর্থার নির্দেশ পালন করতেই নিপুণ হাতে রক্ত বিনিময়ের পালা শেষ করলেন তিনি। আর্থারের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে দেখলাম একটা সরু লিকলিকে কালো রেশমী ফিতে লুসির গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছেন প্রফেসর। ফিতেটায় লকেটের মত কি একটা বাঁধা। লকেটটা পরিয়ে দেবার সময় লুসির গলার কাছের কাপড়টা একটু সরিয়ে ছিলেন প্রফেসর। তখন পরিষ্কার চোখে পড়ল লুসির গলার কাছের ছোট্ট দু'টো ক্ষত।

লকেটটা ঝোলানো শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন প্রফেসর, তার সাথে সাথে আমরাও। একটু একটু করে লুসির গালের লালিমা আবার ফিরে আসছে। আরও কিছুক্ষণ পর লুসির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আর্থারের দিকে চেয়ে বললেন প্রফেসর, 'লুসিকে আজ নতুন জীবন দিলে, আর্থার। এবার পাশের ঘরে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নাও। জন, ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

কিন্তু বিশ্রাম নিল না আর্থার। কারণ রাতের গাড়িতেই আবার অসুস্থ বাবার কাছে ফিরে যাবে ও। আর্থারকে নিচে পৌঁছে দিয়ে আবার লুসির ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, তখনও লুসির বিছানার পাশে বসে স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন প্রফেসর। আমাকে ঢুকতে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'লুসির গলার ওই দাগগুলো দেখেছ?'

'দেখেছি, তবে আজই প্রথম।'

'হুঁ, এবং ওই দাগগুলোর জন্যেই আজ রাতে আমস্টারডামে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে। কয়েকটা বই আর দরকারি জিনিসপত্র আনতে হবে। আমি না আসা পর্যন্ত সারাক্ষণ এ-ঘরে থেকে লুসিকে পাহারা দিতে হবে তোমাকে, বিশেষ করে রাতের বেলা।'

'এক-আধজন নার্সের দরকার আছে?'

'আছে। তবে সে-কাজটা আপাতত তোমাকেই করতে হবে। তোমাকে সতর্ক

করে দিচ্ছি, রাতের বেলা মুহূর্তের জন্যেও এ-ঘর ছেড়ে কোথাও যাবে না, বা ঘুমুবে না। চোখ-কান খোলা রাখবে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আমি। এসেই আবার নতুন করে চিকিৎসা শুরু করতে হবে লুসির।'

'আবার নতুন কি করবেন?' একটু অবাক হয়েই জানতে চাইলাম।

'পরে বলব,' বলেই ব্যাগটা হাতে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। দরজার গোড়ায় পৌঁছেই আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লুসিকে তোমার হাতে রেখে গেলাম, জন। মনে রেখো, লুসির যদি কিছু ঘটে তাহলে আমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে তোমাকে,' বলেই চলে গেলেন প্রফেসর।

৮ সেপ্টেম্বর।

সারাটা রাত লুসির পাশে জেগে বসে থাকলাম। দিন-রাতের প্রায় সারাক্ষণই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল লুসি। শুধু সাঁঝের দিকে একবার একটুক্ষণের জন্যে ঘুম ভেঙেছিল ওর। সে-সময় পরিচারিকাকে ডেকে ওকে রাতের পোশাক পরিয়ে দিতে এবং আমি না ফেরা পর্যন্ত লুসির পাশে থাকতে বলে নিচে নেমে এলাম লুসির মায়ের সাথে দেখা করার জন্যে। ওঁর সাথে কয়েক মিনিট কথা বলে লুসির অবস্থা জানিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে কিছু খেয়ে নিলাম।

লুসির ঘরে ফিরে আসতেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটো মেলে আমার দিকে চাইল ও। ওষুধের প্রক্রিয়ায় আবার ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছে ও, চোখের পাতার সঙ্কোচন দেখেই তা আন্দাজ করা যায়। আমাকে দেখে প্রাণপণে চোখের পাতা খুলে রাখার চেষ্টা করল ও। মাথাটাকে এপাশ-ওপাশ নাড়িয়ে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল বার দু'য়েক।

মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না, লুসি?'

'না, কেন যেন ভয় ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

'ঠিক বোঝাতে পারব না তোমাকে, জন। রাতের বেলা, বিশেষ করে গভীর রাতে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখি আমি, আশ্চর্য, তখন ওগুলোকে সত্যি বলে মনে হয়।'

'আরে না, ওসব কিছু না। আসলে দুর্বল হয়ে পড়েছ তো, অল্পতেই ভয় পেয়ে যাও। শরীরে একটু বল ফিরে আসলেই দেখবে দুঃস্বপ্নটা কিচ্ছু থাকবে না।'

'আমার তা মনে হয় না, জন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন ঘুমাও। তোমার পাশে বসেই পাহারা দেব আজ সারারাত। ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে গেলে দেখবে ঠিক তোমার কাছেই বসে আছি আমি।'

'আহ্, বাঁচালে জন,' বলেই ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুদল লুসি। কয়েক সেকেণ্ডেই ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

তারপর সারারাতে একবারের জন্যেও চোখ মেলেনি লুসি, এমনকি নড়েনি পর্যন্ত। বুঝলাম, সারারাতে একবারও দুঃস্বপ্ন দেখেনি সে।

ভোরবেলা মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে পরিচারিকা এসে ঘরে ঢুকল। ওর হাতে লুসির ভার দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। প্রথমেই প্রফেসর এবং আর্থারকে দুটো তারবার্তা পাঠালাম। তারপর গোসল করে খেয়ে-দেয়ে কাজে মন দিলাম। কয়েকদিনের জমানো অজস্র কাজ আর নানান টুকিটাকি গোছগাছ করতে করতেই দিনটা কেটে গেল। কয়েকদিন ধরে রেনফিল্ডের খোঁজ নেয়াও হয় না, তাই বিকেলের দিকে একবার দেখতে গেলাম ওকে। মোটামুটি ভালই আছে রেনফিল্ড। রাতে খেতে বসে আমস্টারডাম থেকে পাঠানো প্রফেসরের তারবার্তা পেলাম, আজ রাতেও আমাকে লুসির পাশে বসে কাটাতে অনুরোধ করেছেন তিনি। রাতের গাড়িতেই রওনা দিচ্ছেন প্রফেসর, আগামীকাল ভোর নাগাদ পৌঁছে যাবেন এখানে।

৯ সেপ্টেম্বর।

পরপর দু'রাত জেগে কাটিয়ে দারুণ ক্লান্তি বোধ করছি আজ। প্রায় টলতে টলতে এসে পৌঁছুলাম লুসিদের বাড়িতে। আজ বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে লুসিকে। আমার মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন হল লুসি, বলল, 'আজ অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে, জন। আজ আর মিছিমিছি আমার পাশে জেগে বসে থেকে কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। তার চেয়ে তুমি ঘুমাও, আমিই বরং তোমার পাশে জেগে বসে থাকি।'

ওর কথায় আমার মন থেকে অনেকখানি দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। ওর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিয়ে নিচে নেমে এলাম। খাওয়া-দাওয়ার শেষে পরপর দু'কাপ গরম কফি খেয়ে বেশ চাঙা হয়ে ওঠল শরীরটা। আবার ফিরে এলাম লুসির ঘরে। ওর পাশের ঘরটা দেখিয়ে লুসি বলল, 'ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো তুমি। মাঝখানের দরজাটা খোলাই থাক। দরকার হলে ডাকব তোমাকে।'

প্রতিবাদ করলাম না। অবশ্য প্রতিবাদ করার মত মন বা শরীরের অবস্থাও আমার নেই। সোজা পাশের ঘরে এসে একটা বড় সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখের পাতায় নেমে এল রাজ্যের ঘুম।

১০ সেপ্টেম্বর।

ঘুম ভাঙল প্রফেসরের হাতের স্পর্শে। যে-কোন রকম অবস্থায়ই অবাক না হয়ে নিঃশব্দে জেগে ওঠার অভ্যাস আমার বহুদিনের, সেই প্রথম মেন্টাল

হাসপাতালে কাজ করার সময় থেকে।

আমাকে চোখ মেলাতে দেখেই উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'লুসি, লুসির খবর কি?'

'ভাল।'

'চলো, ওকে দেখে আসি একবার।'

'চলুন,' বলে উঠে পড়লাম সোফা থেকে। মাঝখানের দরজার পর্দা সরিয়ে লুসির ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘর অন্ধকার। এগিয়ে গিয়ে পর্দাগুলো সরিয়ে জানালার পাল্লা খুলে দিতেই ঘরের মেঝেয় এসে ছড়িয়ে পড়ল ভোরের সোনালী রোদ। এমন সময় প্রফেসরের অস্ফুট অথচ ক্রুদ্ধ আর্তস্বরে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম। লুসির দিকে চাইতে ধক্ করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা, মনে হল হাঁটু ভেঙে পড়ে যাব। লুসির বিছানার পাশে পাথরের মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর। অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেছে ওঁর মুখ।

বিছানার সাথে প্রায় মিশে গেছে লুসি। ঠোঁট দু'টো মোমের মত সাদা, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চোয়ালের হাড়। এক রাতের মাঝেই দীর্ঘদিনের রোগজীর্ণ অবস্থা হয়েছে ওর। অবিশ্বাস্য! এমন তো হবার কথা নয়। কাল রাতে তো দিব্যি সুস্থ দেখলাম ওকে।

প্রচণ্ড মানসিক শক্তির বলে কয়েক মুহূর্তেই দুর্দমনীয় ক্রোধকে সামলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'জলদি যাও, এখুনি ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসো একটু।'

সাথেসাথেই ছুটলাম আমি। একছুটে নিচ থেকে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল এনে প্রফেসরের হাতে তুলে দিলাম। বোতলের মুখ খুলে লুসির রক্তশূন্য ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে ভেতরে একটু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিলেন প্রফেসর। তারপর নাড়ি ধরে হৃৎপিণ্ডের কম্পন অনুভব করলেন, 'অবস্থা খুব খারাপ, তবে এখনও সময় আছে। আবার রক্ত দিতে হবে ওকে। জন, এবার তোমার পালা।'

কথা বলতে বলতেই হাতের আস্তিন গুটিয়ে ব্যাগ থেকে যন্ত্রপাতি বের করে ফেললেন। তারপর আগের দিনের মত টেবিলটা লুসির বিছানার পাশে টেনে এনে আজ আর্থারের পরিবর্তে তাতে শুয়ে পড়লাম আমি। দক্ষ হাতে রক্ত বিনিময়ের কাজ শেষ করলেন প্রফেসর। আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে ক্ষতি হতে পারে, সে-আশঙ্কায় আগের মতই লুসিকে একটা মরফিয়া দিলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'শরীরের ওপর প্রচণ্ড ধকল গেছে তোমার গত দু'দিন। নিচে নেমে নাস্তা সেরে আরেকটু বিশ্রাম নাওগে।'

টেবিল থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে দোরগোড়ায় পৌছুতেই পেছন থেকে

ডাকলেন প্রফেসর, 'আর্থার যদি আজ এসে পড়ে ওকে কিন্তু আবার এসব কথা বলো না। তাতে লাভ হবে না কিছু, মাঝে থেকে শুধু শুধু ভয় পেয়ে যাবে ও।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিচে নেমে এলাম। নাস্তা খাওয়া হলে আর বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করল না, তাছাড়া গত পুরো রাতটাই নাক ডেকে ঘুমিয়েছি। তাই আবার ওপরে ফিরে এলাম। মৃদু হেসে বললেন প্রফেসর, 'তোমাকে না শুয়ে থাকতে বলেছি। এইমাত্র রক্ত দিয়েছ, এখন নড়াচড়া করলে ক্ষতি হবে। যাও, ওঘরে সোফাটায় বসে থাকোগে কিছুক্ষণ। দরকার হলে ডাকব তোমাকে।'

প্রায় জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিলেন আমাকে প্রফেসর। অবশ্য ওঁর আদেশ অমান্য করার মত সাহসও আমার নেই। অগত্যা পাশের ঘরে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু সহজে ঘুম এল না। এক রাতের মধ্যে লুসির দেহের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হল কি করে, ভেবে দারুণ অবাক লাগল। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই একটু তন্দ্রা মত এল, আর তন্দ্রার ঘোরে লুসির গলার দাগটা কেবলই ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগল আমার অবচেতন মনে।

বিকেলে প্রফেসরের ডাকে ঘুম ভাঙল আমার। লুসির ঘরে এসে দেখি ওরও ঘুম ভেঙেছে। অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সে। লুসিকে আমার জিম্মায় রেখে একটু বেড়াতে বেরোলেন প্রফেসর। নিচের হলঘর থেকে ভেসে এল ওর গলা—পোস্ট অফিসটা কোনদিকে, কাকে যেন জিজ্ঞেস করছেন উনি।

লুসির সাথে আলাপ করতে করতে বুঝতে পারলাম সকালের দুর্ঘটনার কথা জানে না লুসি। একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন লুসির মা। আমাকে দেখে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন ভদ্রমহিলা, 'তোমাকে কিন্তু সত্যি অত্যন্ত ক্লান্ত আর রোগা লাগছে, ডাক্তার,' তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আসলে এখন একটা বিয়ে করা উচিত তোমার, দেখাশোনার তো কেউ নেই।'

ওঁর কথায় হেসে উঠেই লুসির দিকে চাইলাম। চকিতে লুসির গালে একটা রক্তিমাভা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এই রকম হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়েই সাঁঝ ঘনিয়ে এল। এই সময় বাইরে থেকে ফিরে এলেন প্রফেসর। এসেই বললেন, 'জন, আজ রাতে তোমার ছুটি। খেয়েদেয়ে ভাল করে ঘুমাওগে। লুসিকে আজ আমিই পাহারা দেব,' একটু থেমে বললেন, 'আর একটা কথা, এই সময়ে তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কাজেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে কাহিল হয়ে পড়ব আমি। আর তুমি ছাড়া আমার গোপন চিকিৎসার কথা কাউকে জানতে দেয়া চলবে না, বুঝেছ? যাও এখন, গুড নাইট।'

১২ সেপ্টেম্বর।

গত রাত আর আজ সারাটা দিন কষে ঘুমিয়েছি। বিকেলে ঝরঝরে শরীর

নিয়ে লুসিদের বাড়িতে এসে হাজির হলাম। লুসির ঘরে ঢুকে দেখলাম লুসির সাথে গল্প করছেন প্রফেসর। আমি ঢুকতেই হেসে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে, 'এসো, জন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

আমি একটা চেয়ারে বসতেই টেবিলের ওপর রাখা একটা কাগজের প্যাকেট খুলে কয়েকটা জিনিস বের করলেন প্রফেসর। ধবধবে সাদা জিনিসগুলো দেখেই লুসি বলল, 'একটু আগে ওগুলোর কথাই বলছিলেন আমাকে?'

'হ্যাঁ।' চাপা কৌতুকে চিকচিক করছে প্রফেসরের দুই চোখ। 'কিন্তু ভেবো না এগুলো সাধারণ জিনিস। অবশ্য অসাধারণ বলছি না। কিন্তু তোমার রোগের পক্ষে শুধু অসাধারণই নয়, দুর্মূল্য। এগুলোর একটার সাথে একটা গেঁথে মালা বানিয়ে আজ রাতে তোমার গলায় পরিয়ে রাখব। দেখবে, সমস্ত দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে গেছে তোমার।'

'বাহ্, আমার সাথে আবার ঠাট্টা করছেন আপনি। ওই সাধারণ রসুনের মালা গলায় ঝুলিয়ে দিলেই রোগ সেরে যায় নাকি?'

'কারও সঙ্গেই ঠাট্টা করি না আমি, লুসি।' একটু গম্ভীর শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠস্বর। 'আমার প্রত্যেকটা কাজের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, আমার কোন কাজকেই হেলার চোখে দেখবে না। তাহলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়।' হঠাৎ খেয়াল করলেন, তাঁর কথায় একটু মনমরা হয়ে গেছে লুসি। হেসে পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা করে বললেন প্রফেসর, 'একটু কঠিন কথাই বলে ফেলেছি, লুসি, কিন্তু পরে বুঝবে তোমার ভালর জন্যেই বলেছি।'

'না বুঝে বলে ফেলেছিলাম, প্রফেসর, আমাকে মাফ করবেন।'

'গুড, এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা,' বলে আমার দিকে ফিরে বললেন প্রফেসর, 'জন, তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুণি আসছি,' বলে রসুনগুলো তুলে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

একটু পরই একটা রসুনের মালা বানিয়ে ফিরে এলেন প্রফেসর। নিজ হাতে লুসির গলায় পরিয়ে দিলেন ওটা। জানালাগুলো ভালমত বন্ধ করে চৌকাঠে ছড়িয়ে দিলেন রসুনের কোয়া। শার্সিগুলোতে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিলেন রসুনের রস। কাজ শেষ করে লুসির কাছে ফিরে এসে বললেন, 'লুসি, রাতের বেলায় দেখবে অত্যন্ত অস্বস্তি লাগছে তোমার। কিন্তু কিছুতেই গলা থেকে মালাটা বা কোন দরজা জানালা সামান্যতম সময়ের জন্যেও খুলবে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে আমাকে সহ লুসির কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন

প্রফেসর। হোটেলে ফেরার পথে বেশ খুশি খুশি গলায় বললেন তিনি, 'একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারব আজ রাতে। ট্রেন্ যাতায়াত, পড়াশুনা আর প্রচণ্ড উদ্বেগের জন্যে গত কয়েকটা দিন চোখের পাতা এক করতে পারিনি।'

১৩ সেপ্টেম্বর।

আজ সকালটা ভারি চমৎকার। ভোরের বাতাসে শরতের মিঠে আমেজ। অবশ্য পাতা ঝরার মৌসুম শুরু হতে দেরি আছে এখনও।

সকাল আটটায় হোটেলের কামরা থেকে বেরিয়েই দেখলাম সদর দরজায় গাড়ি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। গতকালই গাড়ি তৈরি রাখার জন্যে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম হোটেলের মালিককে।

গাড়ি করে অল্পক্ষণেই লুসিদের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। বাড়িতে ঢুকতেই একগাল হেসে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন লুসির মা। জানালেন, 'গত রাতে গভীরভাবে ঘুমিয়েছে লুসি। এখন পর্যন্ত ঘুম ভাঙেনি ওর।'

'মনে হচ্ছে, ওষুধ ধরেছে,' বললেন প্রফেসর।

'আমারও তাই মনে হয়, প্রফেসর। কাল রাতে লুরিস জন্যে অত্যন্ত ভাবনা হচ্ছিল, তাই মাঝ রাতের দিকে উঠে একবার দেখতে গিয়েছিলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম গভীরভাবে ঘুমাচ্ছে লুসি, আমার পায়ের শব্দেও ঘুম ভাঙল না ওর। ঘরের ভেতর অসহ্য গুমোট, আর রসুনের অসহ্য গন্ধে বমি আসতে লাগল আমার। দরজা জানালাগুলোও দেখলাম সব বন্ধ। চাকর-বাকরগুলোর ওপর ভয়ানক রাগ হল আমার। অসুস্থ মেয়েটার ঘরটাও একটু পরিষ্কার রাখতে পারে না ওরা। অগত্যা নিজেই জানালাগুলো খুলে দিয়ে লুসির কপালে চুমো খেতে গেলাম। দেখে আরও বিরক্ত লাগল, একটা রসুনের মালা গলায় পরেছে সে। কি বিচ্ছিরি ব্যাপার দেখুন তো! মালাটা খুলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি আমি।'

কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল প্রফেসরের মুখে, লুসির মা'র কথা শুনে দপ করে নিভে গেল ওঁর মুখের হাসি। ধপ করে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন তিনি। প্রফেসরকে এত ভেঙে পড়তে জীবনে দেখিনি। কয়েক মিনিট গুম মেরে বসে থেকে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর, 'বুঝেছি, সেই শয়তানই লুসির মা'র হাত দিয়ে দরজা জানালা খুলিয়েছে। কিন্তু হারামজাদার কাছে তো পরাজয় স্বীকার করতে পারব না আমি। চলো, কাজ শুরু করে দিই আমরা,' বলেই এক এক লাফে দুটো করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে ওপরে উঠতে শুরু করলেন তিনি। পেছন পেছন আমিও।

লুসির ঘরে ঢুকে আবার মরার মত রক্তশূন্য অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখলাম লুসিকে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন প্রফেসর, 'এবার রক্ত দেবার

পালা আমার। জন, তৈরি হয়ে নাও।'

এবার রক্ত বিনিময়ের কাজ শেষ করলাম আমি। প্রফেসরের হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিতেই উঠে বসলেন তিনি। উঠেই চোখ পড়ল লুসির মা'র ওপর। আমরা রক্ত বিনিময় নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ই কোন এক ফাঁকে ঘরে এসে ঢুকেছেন তিনি। তাঁকে দেখতে পেয়েই গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন প্রফেসর, 'দেখুন, মিসেস ওয়েস্টেনরা, যদি মেয়েকে বাঁচাতে চান, তাহলে আমার কথার একটু এদিক-ওদিক করতে পারবেন না। আমার বিনানুমতিতে লুসির ঘরেও ঢুকতে পারবেন না, জানালা দরজা বন্ধ থাকলে তা খুলতে পারবেন না। আর রসুনের মালা কেন, সারা ঘর রসুনে ভরে থেকে অসহ্য গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসলেও তা সরাতে যাবেন না। কারণ ওই রসুনই লুসির রোগের একমাত্র প্রতিষেধক, আর একমাত্র রসুনের গন্ধই দূরে সরিয়ে রাখতে পারে ওই ভয়ঙ্কর পিশাচটাকে।'

ড্রাকুলা ২

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৭৯

এক

লুসি ওয়েস্টেনরার ডায়েরী থেকে

১৭ সেপ্টেম্বর, সকাল।

একে একে শান্তিতেই কেটে গেল চারটে দিন আর রাত। আগের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ মনে হচ্ছে আজ নিজেকে। ভোর হয়েছে একটু আগে। জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে ভোরের সোনালী রোদ। ঝিরঝিরে বাতাসে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর মন। গত চারদিন সমানে রাত জেগে আমাকে পাহারা দিয়েছেন ডা. ভ্যান হেলসিং। আজ রাত থেকে আমাকে আর কারও পাহারা দেবার দরকার নেই ভেবেই বোধহয় আমস্টারডামে ফিরে গেছেন তিনি। ধীরে ধীরে সাহস ফিরে পাচ্ছি আমিও। বুঝতে পারছি রাতের বেলা একা থাকতে আর ভয় করবে না আমার। রসুনের উগ্র গন্ধটার সাথেও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বিশেষভাবে জন্মানো এই রসুনের আর একটা নতুন মোড়কও গতকাল হারলেম থেকে এসে গেছে, অতএব চিন্তা কি?

গভীর রাত।

আজ রাতের প্রত্যেকটি ঘটনা হুবহু লিখে রাখছি। ঈশ্বর, চরম দুর্ঘটনা ঘটার আগেই যেন শেষ করতে পারি লেখাটা। আশা করছি, আমি বলে না দিলেও লেখাটা চোখে পড়বে সবার। ভীষণ দুর্বল আর অসহায় বোধ করছি। বুঝতে পারছি ধীর পায়ে আমাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। ঈশ্বর, শক্তি দাও—যেন মরার আগেই শেষ করে যেতে পারি লেখাটা।

যথারীতি রসুনের কোয়াগুলো জানালা আর দরজার চৌকাঠে রেখে মালাটা গলায় পরে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ অদ্ভুত একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। এরকম শব্দ শুনেই প্রথমবার ঘুমের ঘোরে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, আর মিনা ধরে নিয়ে এসেছিল আমাকে। আশ্চর্য, এখন সব মনে পড়ছে আমার। হঠাৎ করেই জনের কথা মনে পড়লো, কেন যেন মনে হচ্ছে এখন পাশের ঘরে ওর থাকা উচিত ছিল। পাশ ফিরে কোল বালিশটা আঁকড়ে ধরে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। অকারণেই ভয় ভয় করছে, অথচ সকালে ভেবেছিলাম বিন্দুমাত্র ভয় পাব না আজ রাতে। মনে ভয়

ঢুকতেই আর ঘুমোবার চেষ্টা করলাম না। এবং তা করতে গিয়েই প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এতক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারিনি। অথচ এখন জেগে থাকতে গিয়ে টেনে খুলে রাখতে পারছি না দু'চোখের পাতা। হঠাৎ বারান্দায় একটা অদ্ভুত শব্দ হতেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে, কে ওখানে?' সাড়া দিল না কেউ, কিন্তু হলপ করে বলতে পারি ওখান থেকেই এসেছে ওই অদ্ভুত শব্দটা।

মনে মনে একটু অস্বস্তি নিয়েই ফিরে এলাম বিছানায়। হঠাৎ বাগানের দিক থেকে ভেসে এল নেকড়ের ভয়ঙ্কর হিংস্র গর্জন। অবাক কাণ্ড! শহরের এই এখানটায় নেকড়ে এল কোত্থেকে! উঠে গিয়ে জানালার বদ্ধ কাঁচের শার্সি দিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। আবছা চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল বাগানের ওপরের আকাশে চক্কর মারছে একটা বাদুড়। কিন্তু নেকড়ে বা ওই জাতীয় কিছুর ছায়াও চোখে পড়ল না বাগানের কোথাও। আমি জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই সাঁই করে একপাক ঘুরে জানালার ধারে উড়ে এল বাদুড়টা। ওটার জ্বলজ্বলে লাল দুটো চোখের দিকে চাইতেই পুরনো ভয়টা ফিরে এলো আবার আমার মনে। বাদুড়টার দিকে চাইতে আর সাহস হল না, ফিরে এলাম বিছানায়। প্রতিজ্ঞা করলাম কিছুতেই ঘুমোবো না আজ রাতে।

এমন সময় দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকলেন মা। আমাকে স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কি রে, অমন করে বসে বসে কি ভাবছিস? ঘুম আসছে না?'

'কি জানি কেন ভয় করছে, মা।'

'ঠিক আছে, বাকি রাতটা আজ তোর কাছেই কাটাব।' এগিয়ে এসে আমার বিছানায় বসে ডাকলেন মা, 'আয় শুয়ে পড়।'

আমি শুতেই আমার পাশে শুয়ে পড়লেন মা। হঠাৎ জানালার কাঁচের শার্সিতে ডানা ঝাপটানোর শব্দ হতেই চমকে উঠে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'এই রাতের বেলা আবার মরতে এল কোন্ পাখি?' বলেই কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে আবার পাশ ফিরে শুলেন মা।

ঠিক তার পর পরই ঘটল ভয়ঙ্কর ঘটনাটা। বাগানের লতা ঝোপের ওপার থেকে ভেসে এল হাজার হাজার নেকড়ের ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন। ঝন ঝন শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের শার্সিগুলো। ভাঙা শার্সির মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বইতে শুরু করল দমকা হাওয়া, থর থর করে কেঁপে উঠল খড়খড়িগুলো। একলাফে বিছানার ওপর উঠে বসলাম আমি আর মা।

জানালার দিকে চোখ পড়তেই প্রচণ্ড আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। ভাঙা শার্সির মধ্যে দিয়ে আমাদের দিকেই ভয়ঙ্কর হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা বিশাল নেকড়ে। আশ্চর্য! খাড়া দেয়াল বেয়ে দোতলার জানালার কাছে নেকড়ে উঠল কি

করে বুঝতে পারলাম না। চেঁচিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন মা। আর তার হাতের ঝটকা লেগে আমার গলা থেকে ছিঁড়ে পড়ে গেল প্রফেসর হেলসিং-এর পরিয়ে দেয়া রসুনের মালাটা। মালাটা ছিঁড়ে যেতেই হা হা শব্দে কুৎসিত হাসি হেসে উঠল কেউ। সেই হাসির শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে ঝিক করে জ্বলে উঠল একটা চোখ-ধাঁধান তীব্র নীল আলো। সাথে সাথে বুক ভাঙা আর্তনাদ করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন মা। বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে দেখতে লাগলাম অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলো।

মা মেঝেতে পড়ে যেতেই জানালা হতে অদৃশ্য হয়ে গেল নেকড়েটা। তার বদলে হু হু করে তীব্র বাতাস ঢুকতে শুরু করল ঘরে। সেই বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে অজস্র চকচকে রূপালী ধূলিকণা। ঘরে ঢুকেই পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল কণাগুলো। চোখের সামনে ওই ধূলিকণার ভেতর থেকে রূপ নিচ্ছে একটা বিশাল কালো মূর্তি। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ঘুমে জড়িয়ে এল দু'চোখ। কিছুতেই খুলে রাখতে পারছি না চোখের পাতা। বহু চেষ্টা করেও আর বসে থাকতে না পেরে লুটিয়ে পড়লাম বিছানায়।

ঠিক কতক্ষণ পরে জানি না, আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলাম। দূরের গির্জার ঢং ঢং ঘন্টাধ্বনি কানে এসে বাজছে। বাগানের ওপাশে এসে একসাথে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে পাড়ার কুকুরগুলো। আর বাগানেরই কোন ঝোপের ভেতর বসে সমানে গান গেয়ে চলেছে একটা পাপিয়া।

উঠে বসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। বিন্দুমাত্র জোর পাচ্ছি না শরীরে। চেঁচিয়ে চাকরদের ডাকার চেষ্টা করলাম, ভালমত স্বর ফুটল না গলায়। বার কয়েক ডেকেও কারও সাড়া না পেয়ে অসহায়ভাবে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকলাম। আরও কিছুক্ষণ পর বাইরের বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, তাহলে আমার ডাক কানে গিয়েছে কারও। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে ঘরের ভেতর উঁকি দিল একটা চাকর। এবং দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

জানালার ভাঙা কাঁচের শার্সি দিয়ে ঘরে ঢুকছে দমকা হাওয়া। বার বার একটার সাথে আরেকটা বাড়ি খেয়ে বিশ্রী শব্দ করছে খড়খড়িগুলো। কুৎসিত ভঙ্গিতে মেঝেতে পড়ে আছেন মা, মড়ার মত বিছানায় শুয়ে আছি আমি, এতসব দেখে ভয় পাবারই কথা চাকরটার।

চাকরটার চেঁচামেচিতে আরও একটা চাকর এসে হাজির হল। ঘরের অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে-ও। ওদের সাহায্যে বিছানার ওপর উঠে বসলাম। মা'কেও মেঝে থেকে তুলে পাশের বিছানায় শুইয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল ওরা। কাজ ঠিকই করছে কিন্তু আতঙ্ক দূর হচ্ছে না ওদের মন থেকে। অগত্যা নিচে থেকে

খানিকটা করে ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আসতে বললাম ওদেরকে, ভাবলাম তাহলে কিছুটা ধাতস্থ হবে। নিচে চলে গেল ওরা। কিন্তু আর ফিরে এল না। ব্যাপার কি? গায়ের জোর দিয়ে গলা ফাটিয়ে বার কয়েক ডেকে কোন সাড়া পেলাম না চাকর দুটোর কাছ থেকে। কোনমতে বিছানা থেকে নেমে দেখতে চললাম। নিচে গিয়েই পাওয়া গেল ওদেরকে, তবে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা অবস্থায়। ভুল করে ব্র্যাণ্ডির বদলে মা'র ঘুমের ওষুধের বোতল থেকে ওষুধ খেয়ে ফেলেছে ওরা। বুঝতে পারছি এসবই ভয়ঙ্কর কোন দুর্যোগের পূর্বাভাস।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম। মায়ের জ্ঞান ফিরেছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়েই টের পেলাম দুর্যোগটা কি। বুকের ভেতর থেকে একসাথে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চাপ চাপ কান্না। শেষ পর্যন্ত আর সইতে না পেরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমাকে ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেছেন মা।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবার শোনা গেল বিশ্রী অট্টহাসির শব্দ। আবার বাগানের দিক থেকে একসাথে গর্জন করে উঠল হাজারো নেকড়ের দল। আবার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে শুরু করল সেই আশ্চর্য রূপালী ধূলিকণা। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সময় শেষ হয়ে আসছে আমারও। কিন্তু তা বাইরের পৃথিবীটাকে জানিয়ে যাওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি ড্রয়ার হাতড়ে ডায়েরী, খাতা আর কলম বের করে লিখতে বসলাম।

চোখের সামনে আবার কাল মূর্তির রূপ নিচ্ছে ধূলিকণাগুলো এখন থেকে যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে যা খুশি। ঈশ্বর, মৃত্যুর পর তোমার পায়ে ঠাঁই দিও আমাকে।

দুই

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

১৭ সেপ্টেম্বর।

রাতের খাওয়ার পর পড়ার ঘরে বসে কয়েকদিনের জমান চিঠিপত্রগুলো দেখছিলাম। গত কয়েকদিনের কাজের চাপে ওগুলোর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এক মনে চিঠি পড়ছি, হঠাৎ ঝটকা মেরে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ঘরে এসে ঢুকল রেনফিল্ড। তরকারি কাটার ধারাল একটা ছুরি ওর হাতে। চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। ভয়ঙ্কর কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এ ঘরে এসে ঢুকল সে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল রেনফিল্ড, তারপর ছুরি বাগিয়ে ধরে সোজা ছুটে এল আমার দিকে।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই এসে পড়ল রেনফিল্ড। প্রচণ্ড জোরে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিতে গেল সে আমার পেটে। হাত দিয়ে ঠেকোবার চেষ্টা করলাম। পেটটা বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ঢুকে গেল ওটা আমার কনুইয়ের কাছে মাংসে। টান মেরে ওখান থেকে ছুরি বের করে নিল রেনফিল্ড। সাথে সাথেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল ক্ষতস্থান থেকে। আবার ছুরি মারার চেষ্টা করল রেনফিল্ড, কিন্তু আর সুযোগ দিলাম না ওকে। গায়ের জোর দিয়ে একটা ঘুসি মারলাম ওর চোয়ালে। ঘুসি খেয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল রেনফিল্ড, উঠে বসল পরমুহূর্তে। মেঝেতে পড়ে যাওয়া ছুরিটা তুলতে গিয়েই আমার হাত থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তের দিকে চোখ পড়ল ওর। সাথে সাথেই পৈশাচিক উল্লাসে চিক চিক করে উঠল ওর দুই চোখ। হামাগুড়ি দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তটুকুর দিকে এগিয়ে এল সে, তারপর উবু হয়ে বসে জিভ বের করে চাটতে লাগল সেই রক্ত। ব্যাপার দেখে রি রি করে উঠল আমার সারা শরীর।

ততক্ষণে এক এক করে দারোয়ানগুলোও এসে পড়েছে। রেনফিল্ডকে চিৎ করে মেঝেতে ফেলে ওর হাত পা বেঁধে ফেলল। নিয়ে যাবার সময় বিড় বিড় করতে করতে গেল সে, 'কি শান্তি, কি শান্তি। আসলে রক্তই জীবন, রক্তেই প্রাণ।'

আর দেরি না করে ক্ষতস্থানটা ব্যাণ্ডেজ করে নিলাম। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে সারা শরীর। ঘুমোতে যেতে হবে এখন।

১৮ সেপ্টেম্বর।

আজ সকালে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং-এর পাঠান তারবার্তা পেলাম। তারবার্তার কথাগুলোঃ 'অবশ্যই ক্রিসেন্টে থাকবে আজ রাতে। লক্ষ্য রাখবে রসুনের কোয়াগুলো যেন ঠিক জায়গায় থাকে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৌছানর চেষ্টা করছি আমি।'

লুসিদের বাড়ি পৌছে গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সদর দরজার কড়া নাড়লাম। কেউ সাড়া দিল না। বার কয়েক কড়া নেড়েও কেউ সাড়া না দেয়ায় অগত্যা ঘন্টা বাজালাম। কিন্তু তবু কারও সাড়া নেই। এত বেলায় চাকরগুলো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে নাকি? আরও কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করেও কারও সাড়া পেলাম না। একটু শঙ্কিত হলাম মনে মনে। কিছু ঘটেনি তো? অন্য কোন পথে বাড়িতে ঢোকা যায় কিনা খুঁজে দেখলাম, কিন্তু পেলাম না। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়, এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল সেখানে। লাফ দিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে নামলেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং।

নেমেই আমাকে প্রশ্ন করলেন প্রফেসর, 'জন, এখন এলে নাকি? কেবল

পাওনি ঠিকমত?'

'পেয়েছি। আজ সকালে। পেয়েই ছুটে এসেছি এখানে।' আসার পর কি ঘটেছে বললাম ওঁকে। একবারও বাধা না দিয়ে আমার কথা শুনলেন প্রফেসর। তারপর মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে দোলাতে দোলাতে বললেন, 'যেভাবেই হোক বাড়ির ভেতর ঢুকতেই হবে আমাদের। এসো তো দেখি।'

একচক্কর বাড়িটা ঘুরে রান্নাঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা লোহা কাটা করাত বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন প্রফেসর, 'জানালার শিক ক'টা কেটে ফেলো তো।'

প্রফেসরের হাত থেকে করাতটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। জানালার পাল্লাগুলো ভেতর দিকে, কাজেই বাইরে থেকে শিক কাটতে কোন অসুবিধে হল না। অল্পক্ষণেই গোটা তিনেক শিক কেটে ফেললাম। শিক কাটা হলে একটা পাতলা ছুরির সাহায্যে দরজার খিল খুলে ফেললেন প্রফেসর। জানালা গলে ঘরের ভেতর ঢুকলাম আমরা। ঘরের মেঝেতে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে একটা চাকর। বেশ কয়েকবার জোরে ধাক্কা দেবার পর আস্তে করে চোখ মেলল সে, যেন খুলতে পারছে না চোখের পাতা। আমাদেরকে দেখেই বার কয়েক চোখ মিট মিট করে উঠে বসল সে। এত বেলায়ও এমনভাবে ঘুমোচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করেও কোন সন্তোষ-জনক উত্তর পেলাম না ওর কাছ থেকে। শুধু বলল, 'কি জানি, কখনোই তো এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাই না। আজ যে কি হলো।' ওকে আর কিছু না বলে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

খাবার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। আফিমের আরকের গন্ধে ভুর ভুর করছে সারাটা ঘর, আর জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে আছে পরিচারক দু'জন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রফেসরের মুখের দিকে চাইতেই দেখলাম থমথম করছে তাঁর মুখ। গম্ভীর ভাবে বললেন তিনি, 'জলদি ওপরে চল।' বলেই ছুটতে শুরু করলেন। তাঁর পিছু পিছু এসে ঢুকলাম দোতলায় লুসির ঘরে।

চিৎ হয়ে মড়ার মত বিছানায় পড়ে আছে লুসি। পাশের খাটে আপাদমস্তক সাদা চাদরে মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কে যেন, বোধহয় লুসির মা। একপাশে বিছানার ওপর ছিঁড়ে পড়ে আছে লুসির গলার রসুনের মালাটা। শয্যার পাশে কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রফেসর। তারপর আর একটু এগিয়ে গিয়ে শয্যায় শায়িত চাদরে মোড়া দেহের ওপর থেকে টান মেরে চাদরটা সরিয়ে ফেললেন। যা ভেবেছিলাম। চাদরের তলায় শুয়ে আছেন লুসির মা-ই। একনজর দেখলেই বোঝা যায়—মৃত। তবু সন্দেহ নিরসনের জন্যে একবার লুসির মা'র নাড়ী পরীক্ষা করে নিয়ে লুসির দিকে মন দিলেন প্রফেসর। ভুরু কুঁচকে

কিছুক্ষণ লুসির হাতের নাড়ীটা টিপে ধরে রেখে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'নিচ থেকে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে এসো, জলদি!'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ছুটলাম। ব্র্যাণ্ডির বোতল এনে প্রফেসরের হাতে দিতেই বললেন, 'এক কাজ করো তো। ঠাণ্ডা পানির ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার ব্যবস্থা করোগে চাকর দুটোর। আর তাড়াতাড়ি একটু পানি গরম করে নিয়ে আসতে বলো রান্নাঘরের চাকরটাকে।'

প্রায় ঘন্টাখানেক চেষ্টা করে রীতিমত গলদঘর্ম হয়ে জ্ঞান ফেরালাম চাকর দুটোর। গরম পানি নিয়ে আগেই লুসির ঘরে চলে গেছে তৃতীয় চাকরটা। সদ্য জ্ঞান ফিরে পাওয়া চাকর দুটোকে আমার পেছন পেছন আসতে বলে ওপরে চলে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে সারা গায়ে ঘষে ঘষে লুসির শরীরের উত্তাপ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন প্রফেসর।

তখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি লুসির, হঠাৎ সদর দরজায় ঘন্টা বাজার শব্দ শুনলাম। খানিকক্ষণ পরই চাকর এসে জানাল, আর্থার হোমউডের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে একজন লোক। লোকটাকে নিচের হলঘরে বসাবার জন্যে নির্দেশ দিলাম চাকরকে। বেরিয়ে যাচ্ছিল চাকরটা, ওকে ডেকে বললেন প্রফেসর, 'পাশের ঘরের বিছানাটা ঠিক করতে বলো তো কাউকে। আর লুসিকে পরাবার জন্যে শুকনো কাপড় নিয়ে এস।'

চাকরটা পোশাক এনে দিতেই চাদরের তলায় রেখে কোনমতে লুসির পোশাক পালটে দিলেন প্রফেসর। তারপর দুজনে মিলে ধরা-ধরি করে পাশের ঘরে নিয়ে এলাম তাকে। চাকরটাকে লুসির কাছে থাকতে আদেশ দিয়ে আমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর। নিচে নামতে নামতে বললেন, 'কি যে করব এখন বুঝতে পারছি না। চল, দুজনে মিলে ভেবেচিন্তে যাহোক একটা কিছু উপায় বের করা যায় কিনা দেখি।'

বলতে বলতেই খাবার ঘর থেকে ড্রইংরুমে এসে ঢুকলাম। ঘরের সবকটা জানালা বন্ধ। আবছা আলোয় ঘরের কিছুই ঠিকমত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। চিন্তিত ভাবে বললেন প্রফেসর, 'আমাদের দু'জনের শরীর থেকেই রক্ত দেয়া হয়ে গেছে। অথচ এই মুহূর্তে রক্ত না পেলে লুসিকে বাঁচান যাবে না। এখন রক্ত কোথায় পাই...'

প্রফেসরের কথা শেষ হবার আগেই ঘরের কোণের সোফা থেকে ভেসে এল একটা ভারি কণ্ঠস্বর, 'অত ভাবনা কিসের, প্রফেসর, আমি তো এসে গেছিই।' একটু আগে হোমউডের খবর নিয়ে এসেছিল লোকটা, অথচ ওর কথা বেমালুম ভুলে বসে আছি আমরা। ওর কণ্ঠস্বর শুনে আশায় আনন্দে দুলে উঠল বুকটা।

কারণ, ওই কণ্ঠস্বরের মালিককে ভাল মতই চিনি আমি। আমার প্রিয় বন্ধু— কুইনসে মরিস।

ছুটে গিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ান মরিসের হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'খবর কি, মরিস? আর্থারের বাবা কেমন আছেন?'

'ভাল না। অবস্থা খুবই খারাপ। তা লুসি কেমন আছে, জন? গত তিন দিন নাকি ওর কোন খবরই জানে না আর্থার।'

কথার উত্তর দিলেন প্রফেসর, 'লুসির অবস্থাও খুবই খারাপ, মরিস। তুমি সময় মত এসে না পড়লে বোধহয় বাঁচানই যেত না ওকে।'

'চিরদিনই সাধ্যমত বিপন্নকে সাহায্য করে এসেছি, প্রফেসর। আজও না হয় আর একজনকে করলাম। তা এখন কি করতে হবে আমাকে?'

'এস আমার সাথে,' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর, তার পিছু পিছু মরিস। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ভাল কথা, জন, লুসির সাংঘাতিক অসুস্থতা আর ওর মায়ের মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে একটা তার করে দাও আর্থারকে। একটা গাড়ি নিয়ে যেয়ো পোস্টাফিসে, তাহলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে,' বলেই মরিসকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সময় নষ্ট না করে পোস্ট অফিসের দিকে চললাম আমি।

১৯ সেপ্টেম্বর।

অত্যন্ত ছটফট করে কাটিয়েছে লুসি গত রাতটা। কিছুক্ষণ পর পরই বোধহয় সাংঘাতিক কোন দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে জেগে উঠেছে। সারাটা রাত পালা করে লুসিকে পাহারা দিয়েছি আমি আর প্রফেসর। ঘুরে ঘুরে বাড়ি পাহারা দিয়েছে কুইনসে মরিস। একটা জিনিস ভাল করে খেয়াল করেছি আমরা, জেগে থাকার চাইতে ঘুমিয়ে থাকলেই যেন অনেকটা স্বাভাবিক মনে হয় লুসিকে। আর ঘুমের মধ্যে কোন কারণে লুসির ঠোঁট দুটো ফাঁক হলেই ঠোঁটের দু'পাশের ঝকঝকে সাদা তীক্ষ্ণ ধার দুটো দাঁত স্পষ্ট নজরে পড়েছে, অথচ হলপ করে বলতে পারি ওই দাঁত দুটো এর আগে কখনও দেখিনি।

সারারাত ছটফট করে বোধহয় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েই ভোরের দিকে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল লুসি। তার সেই ঘুম ভাঙল একেবারে বিকেল বেলা। ঘুম ভাঙলে প্রথমেই আর্থারের কথা জিজ্ঞেস করল সে। সকালবেলাই আর্থারকে আনতে মরিসকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রফেসর, সে কথাই এখন জানালেন লুসিকে।

বিকেলের অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো জানালার কাঁচের শার্সি ভেদ করে ঘরে এসে পড়েছে। সে আলো লুসির ম্লান চিবুকে এসে পড়ায় আরো রোগাটে দেখাচ্ছে তাকে। অল্প পরেই গির্জা থেকে ভেসে এল ছ'টা বাজার সময় সঙ্কেত,

আর ঠিক এই সময় ঘরে এসে ঢুকল আর্থার। আমাদের কারও দিকে একটি বারের জন্যেও না তাকিয়ে আশ্চর্য শান্ত পায়ে লুসির বিছানার কাছে এগিয়ে গেল সে। ওকে লুসির কাছে একটু একলা থাকতে দিয়ে ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এলাম আমরা।

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

১৭ সেপ্টেম্বর।

গতকাল হঠাৎ করেই রহস্যজনক ভাবে মারা গেলেন মিস্টার হকিন্স। মোটামুটি সেরে উঠলেও এখনও অত্যন্ত দুর্বল জোনাথন। মাত্র দিন কয়েক আগে ওকে নিয়ে মিস্টার হকিন্সের বাড়ি এসে উঠেছি। অসংখ্য এলম গাছ দিয়ে ঘেরা তাঁর গির্জা সংলগ্ন বাড়িটা সত্যিই চমৎকার। আমরা এসে তাঁর বাড়িতে ওঠায় দারুণ খুশি হয়েছিলেন নিঃসন্তান আর একেবারে নিরাত্মীয় মিস্টার হকিন্স। জোনাথন কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গ থেকে ফিরে আসার পর পরই তাকে নিজের ব্যবসার অংশীদার করে নিয়েছিলেন মিস্টার হকিন্স, অবশ্য জোনাথন অসুস্থ থাকায় ওর হয়ে সবটা ব্যবসা একাই দেখাশোনা করেছিলেন তিনি। এহেন পিতৃস্থানীয় লোকের মৃত্যুতে সত্যিই ব্যথা পেয়েছে জোনাথন। আর সত্যি বলতে কি, ওই স্নেহময় লোকটার কথা মনে হলেই চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে আমারও।

কি করে যে মারা গেলেন মিস্টার হকিন্স তা বুঝতে পারছি না। গত রাতেও খাওয়ার সময় তাঁকে দিব্যি সুস্থ মনে হয়েছে, অথচ আজ সকালবেলা নিজের ঘরের বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাঁকে।

আর কেন জানি আজ বার বার লুসির কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন তার খোঁজখবর নেয়া হয়নি। ডায়েরীটা লেখা শেষ করেই তার কাছে চিঠি লিখতে হবে একটা।

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

২০ সেপ্টেম্বর।

চাকরটার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে হাতঘড়িতে দেখলাম ভোর ছ'টা বাজে। আমি উঠে বসতেই চাকরটা জানাল আমাকে ডাকছেন প্রফেসর। ব্যাপার কি দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি লুসির ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের সব ক'টা জানালা বন্ধ। পর্দাগুলো পর্যন্ত টাঙান থাকায় ভোরের আলো ঢুকতে পারছে না সে ঘরে। রসুনের অসহ্য তীব্র গন্ধে ভারি হয়ে আছে ঘরের আবহাওয়া।

আমি ঘরে ঢুকতেই জানালাগুলো খুলে দিতে বললেন আমাকে প্রফেসর। এগিয়ে গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিতেই ঘরে এসে পড়ল ভোরের সোনালী রোদ। খোলা জানালা দিয়ে আসা নির্মল হাওয়ার ঝাপটা কয়েক মুহূর্তেই ঘর থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে নিয়ে গেল রসুনের অসহ্য গন্ধ।

এতক্ষণ ঘর অন্ধকার থাকায় প্রফেসরকে ভালমত দেখতে পাইনি, এখন ওঁর দিকে তাকাতেই দেখলাম, লুসির বিছানার পাশে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ওঁর চেহারা দেখেই অনুমান করা যায় খবর ভাল না। লুসির দিকে চেয়ে বুঝলাম ঠিকই অনুমান করেছি। আরো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর গায়ের রঙ। চোয়াল বসে গিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চিবুকের হাড়। শ্বাস নিতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে ওর। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, গতকাল কথা বলার সময়ই শুধু তীক্ষ্ণ দাঁত দুটো দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আজ বন্ধ ঠোঁটের দু'কোণ থেকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে দাঁত দুটো। গলার দগদগে ক্ষতচিহ্ন দুটোও যেন রাতারাতি মিলিয়ে গেছে। দেখে আদৌ বোঝা যাবে না মাত্র গতকালও ক্ষত ছিল ওর গলার ওই জায়গায়।

স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম লুসির দিকে, চমক ভাঙল প্রফেসরের কথায়। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, 'লুসির সময় ঘনিয়ে এসেছে, জন। আর্থারকে জলদি ডেকে নিয়ে এস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আর্থারের কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙালাম ওর। শুয়ে শুয়েই বার কয়েক চোখ রগড়াল সে, তারপর চাইল আমার মুখের দিকে। সেখানে কি দেখল কে জানে, তড়াক করে উঠে বসল বিছানার ওপর। বসে থেকেই আমার হাত দুটো চেপে ধরে থর থর করে কেঁপে উঠল একবার। আমার মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে।

আস্তে করে ওর হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার সুরে বললাম, 'নিয়তির ওপর তো মানুষের কোন হাত নেই, আর্থার। তুই, আমি, আমরা পুরুষ মানুষ। যত দুঃখই আসুক না কেন ভেঙে পড়লে চলবে না আমাদের। আয়, ওঠ, দেরি করলে হয়ত লুসির সাথে শেষ দেখাটাও করতে পারবি না।'

প্রায় জোর করে ওকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে চললাম। লুসির সামনে গিয়ে স্থির থাকতে পারবে না ভেবেই বোধহয় যেতে চাইছে না ও। লুসির ঘরে ঢুকে দেখলাম, নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন প্রফেসর। যদ্দূর সম্ভব ঘরটাকেও গোছগাছ করে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, লুসির অগোছালো চুলগুলোকে পর্যন্ত হাত দিয়ে একটু ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। আর্থারকে দেখেই ম্লান কণ্ঠে বলে উঠল লুসি, 'এস আর্থার। এ সময়ে তোমাকেই কামনা করছিলাম মনে মনে। তুমিও

বোধহয় বুঝতে পারছ, সময় শেষ হয়ে এসেছে আমার।'

ধীরে ধীরে বিছানার পাশে এগিয়ে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল আর্থার। দু'হাতে তুলে নিল লুসির রোগজীর্ণ দুটো হাত। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে কপালের নিচে বসে যাওয়া কোটর থেকে স্থির দৃষ্টিতে আর্থারের দিকে চেয়ে আছে লুসির গভীর প্রেমপূর্ণ কিন্তু বেদনার্ত বড় বড় চোখ। কয়েক সেকেণ্ড একভাবে তাকিয়ে থেকে একটুক্ষণের জন্যে চোখের পাতা মুদে বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস নিল লুসি। ধীরে ধীরে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন আসতে থাকল লুসির চেহারায়। কেমন যেন একটু কঠোর মনে হচ্ছে এখন ওর চেহারা। ঠোঁটের কোণ থেকে আরও বেরিয়ে এসেছে সেই দাঁত দুটো। একটু পরই আবার চোখ মেলল সে। কিন্তু প্রেম আর বেদনার পরিবর্তে সে চোখে এসে ভর করেছে এখন রাজ্যের লালসা। আবার কথা বলল লুসি, 'এস আর্থার, শুধু একবার, একবার চুমো খাও তোমার লুসিকে।' কামনা মদির সে কণ্ঠে আশ্চর্য ব্যাকুলতা। এমন তো হবার কথা নয়। লুসির মত মৃত্যু পথ যাত্রিণীর মুখে কথাটা, আর তার বলার ধরন কেমন যেন বেমানান মনে হল আমার কাছে।

আমার মতই লুসির কথা শুনে চমকে উঠলেন প্রফেসরও। ধীরে ধীরে লুসির মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর্থারের মুখ। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে লুসি। উত্তেজনায় ফাঁক হয়ে গেছে ওর দুটো ঠোঁট, আর সে ঠোঁটের ফাঁক থেকে হিংস্র ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে অমানবিক তীক্ষ্ণ দাঁত দুটো।

আর্থারের মুখের সাথে লুসির মুখ লাগে লাগে এমন সময় বাঘের মত লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। খপ করে আর্থারের চুলের মুঠি ধরে টেনে ওর মাথাটা সরিয়ে আনলেন পেছনে, যেন লুসিকে চুমো খেতে না পারে।

প্রফেসরের ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। আর্থারও। ওর বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বললেন প্রফেসর, 'দুঃখ পেয়ো না, আর্থার। তোমার ভালর জন্যেই করলাম কাজটা। এখনকার লুসি আর তোমার সেই আগের প্রেমিকা নেই। শয়তানের ছোঁয়ায় এখন একটা ডাইনীতে রূপান্তরিত হয়েছে সে। এই মুহূর্তে ওকে চুমো খেলে তোমাকেও হারাতে হবে আমাদের।'

প্রফেসরের কথা শুনে একবারের জন্যে দপ করে জ্বলে উঠল লুসির দুই চোখ। যেন চোখের দৃষ্টি দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিতে চাইছে সে প্রফেসরকে। তারপরই আস্তে করে দ্বিতীয়বারের জন্যে চোখ মুদলো লুসি। শ্বাস টানার তালে তালে বার কয়েক জোরে জোরে দুলে উঠেই একেবারে থেমে গেল বুকের ওঠানামা। উবু হয়ে লুসিকে একবার পরীক্ষা করেই বিড়বিড় করে রায় দিলেন প্রফেসর, 'সব শেষ।'

সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে মানুষের মত-হুকরে কেঁদে উঠল আর্থার। জোর করে ঠেলে ওকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে চলে এলাম পাশের ঘরে। একটা সোফায় বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। অসহ্য বেদনায় টন টন করে উঠল আমারও বুকের ভেতরটা। আমিও তো ভালবেসেছিলাম লুসিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর লুসির ঘরে ফিরে এসে দেখলাম শয্যার ওপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লুসিকে পরীক্ষা করছেন প্রফেসর। মৃত্যু যেন লুসির দেহের সমস্ত লাবণ্য আবার অকৃপণ হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আমার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। এগিয়ে এসে সস্নেহে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'ব্যথা হয়ত পেয়েছ, জন, কিন্তু যদি জানতে কত বড় দুঃসহ যন্ত্রণা আর বীভৎসতার হাত থেকে ও মুক্তি পেয়েছে আজ তাহলে ও মারা গেছে ভেবে দুঃখ না করে বরং খুশিই হতে।'

'কিন্তু, স্যার, এভাবে হঠাৎ করে আমাদের মাঝ থেকে সে চলে যাবে ভাবতেই প্যারিনি।'

'চলে গেছে? কে বলল চলে গেছে?'

প্রফেসরের কথার ধরনে আশ্চর্য হলাম। বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, 'যায়নি?'

'না যায়নি। গেছে শুধু তার কোমল রূপটা। আবার সে আমাদের মাঝে ফিরে আসবে, কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক হিংস্ররূপে।'

'কি বলছেন, স্যার, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবে, সময় হলে ঠিকই বুঝতে পারবে সব। কিন্তু তার আগেই আমাদের তৈরি হতে হবে, জন। না হলে আরো বড় সর্বনাশ ঘটে যাবার আশঙ্কা আছে।'

২১ সেপ্টেম্বর।

একটু আগে ওর বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাড়ি চলে গেছে আর্থার। অতএব লুসির কোন আত্মীয়স্বজন না থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই ওর আর ওর মা'র শেষকৃত্যের দায়িত্বটা এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। সারাক্ষণ পাশে পাশে থেকে আমাকে সাহায্য করছেন প্রফেসর। ওদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কাকে কাকে আমন্ত্রণ জানাব, কোথায় কবর দেব ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না, উদ্ধার করলেন প্রফেসর। তিনি বললেন, 'এত ভাবাভাবির কি আছে। লুসিদের পারিবারিক চিঠিপত্র দেখলেই ওসব অনুমান করা যাবে। ওদের উকিলকেও খবর দেয়া দরকার। তার আগে চল তো ঘরগুলো একবার খুঁজে দেখি।'

'ওদিকে, আমস্টারডামে আপনার কোন জরুরী কাজ পড়ে নেই তো?'

'না, নেই। আর থাকলেই বা কি? এখানকার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে শত কাজ থাকলেও আমি ফিরে যেতে পারব না।'

লুসির ঘরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন প্রফেসর। উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'কি হল, স্যার?'

প্রফেসরের মুখে হালকা হাসির ছাপ। আমাকে একটা খাতা দেখিয়ে বললেন তিনি, 'এটা পেয়ে যাওয়ায় ভালই হল, আমাদের অনেক উপকারে লাগবে।'

'কি ওটা?' অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

'লুসির ডায়েরী।'

'কোথায় পেলেন ওটা?'

'লুসির বালিশের তলায়।' বলে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, 'একটা কথা, জন, আমরা যদি এভাবে লুসিদের বাড়ি তল্লাশি করতে থাকি কারও কিছু বলার নেই তো?'

'না, না, কার কি বলার থাকবে? আর আপনি বোধহয় জানেন না, প্রফেসর, বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হবার পর পরই তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আর্থারের নামে উইল করে দিয়েছিল লুসি। অবশ্য লুসির মৃত্যুর পরই সমস্ত সম্পত্তির অধিকার পাবে আর্থার, দলিলে একথাই লেখা ছিল। এখন আইনতঃ লুসির সমস্ত সম্পত্তির মালিক আর্থার। আমাদেরকে কিছু বলার অধিকার একমাত্র আর্থারেরই আছে। আর প্রাণ গেলেও আমাদের কাজে বাধা দেবে না সে, একথা হলপ করে বলতে পারি আমি।'

আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন প্রফেসর। খুব একটা কষ্ট করতে হল না। অল্প পরেই মিসেস ওয়েস্টেনরার ঘরের একটা আলমারির ভেতর পেয়ে গেলাম যা খুঁজছিলাম। কাজ সেরে ঘর থেকে বেরোবার সময় বললেন প্রফেসর, 'উহ্, কি ধকলটাই না গেল! এবার একটু বিশ্রাম দরকার আমাদের। কাল ভোরে উঠেই তো আবার খাটুনি শুরু হবে।' ফেরার আগে আর একবার লুসিকে দেখতে গেলেন প্রফেসর, তাঁর সাথে সাথে আমিও। চামেলির মিষ্টি গন্ধ ঘরের বাতাসে। তার সাথে এসে যোগ হয়েছে ধূপের সুবাস। অর্থাৎ এক কথায় যদ্দূর সম্ভব শুচিশুদ্ধ করে তোলা হয়েছে লাশ রাখা ঘরটাকে। ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা লুসির সর্বাঙ্গ। এগিয়ে গিয়ে আস্তে করে চাদরের এক প্রান্ত উন্মোচিত করলেন প্রফেসর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম লুসির মুখের অপূর্ব সৌন্দর্য। যেন মরেনি লুসি, দীর্ঘদিন একটানা রোগভোগের পর শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ওর মুখের লাবণ্য কঠোর হাতে ছিনিয়ে নেয়নি মৃত্যু। বরং দু'হাতে মুঠো ভরে দিয়েছে। এমন আজব কথা দেখা তো দূরের কথা, কখনো কারও মুখে শুনিনি পর্যন্ত।

কিন্তু ওই রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মত চেহারার দিকে তাকিয়ে কিন্তু খুশি হতে পারলেন না প্রফেসর। থমথমে গম্ভীর ওঁর মুখের চেহারা। পাথরের মত রুক্ষ কঠিন। তাহলে আর সব সাধারণ লাশের মত লুসির লাশ পচতে গলতে শুরু করলেই খুশি হতেন তিনি? বেশ কিছুক্ষণ একভাবে লুসির দিকে তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুললেন প্রফেসর। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে একটু অপেক্ষা কর তুমি, আমি এক্ষুণি আসছি,' বলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলেন প্রফেসর। হাতে এক মুঠো রসুন। রসুনগুলো লুসির বিছানার চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন তিনি। নিজের গলা থেকে ছোট্ট একটা সোনার ক্রুশ খুলে নিয়ে রাখলেন লুসির বুকের ওপর। একটা অদ্ভুত জিনিস পলকের জন্যে চোখে পড়ল তখনই, কিংবা আমার চোখের ভুলও হতে পারে। ক্রুশটা লুসির বুক স্পর্শ করতেই মনে হল চকিতের জন্যে একবার কুঞ্চিত হয়েই সোজা হয়ে গেল লুসির কপালের চামড়া। ব্যাপারটা প্রফেসরের চোখে পড়েছে কিনা তা তাঁর মুখ দেখে আন্দাজ করতে পারলাম না। কাজ শেষ করে ধীরে ধীরে চাদরটা দিয়ে আবার লুসির মুখ ঢেকে দিলেন প্রফেসর। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'চল, এখনকার মত কাজ শেষ। তবে কাল রাতের বেলা আবার একবার লুসিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমার।'

'কাল রাতে!' অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ঘরে চল, বলছি।'

ঘরে এসে জামা কাপড় বদলে দুটো চেয়ারে সামনাসামনি বসার পর বললেন প্রফেসর, 'আগামীকাল রাতের আগে অস্ত্রোপচারের এক সেট যন্ত্রপাতি জোগাড় করে দিতে পার আমাকে?'

আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'যন্ত্রপাতি দিয়ে কি হবে? কার শরীরে অস্ত্রোপচার করবেন আপনি?'

'লুসির শরীরে।'

যা ভাবা উচিত নয় তাই ভেবে বসলাম। পাগল হয়ে গেলেন নাকি প্রফেসর? বোধহয় আমার মনের ভাব টের পেয়েই মৃদু হাসলেন তিনি। বললেন, 'এতে অবাক হবার কিছু নেই, জন। অস্ত্রোপচার ঠিকই করব, কিন্তু প্রচলিত ডাক্তারী পদ্ধতিতে নয়। এ অন্য বিদ্যে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার সাহায্য যখন দরকার, তোমাকে খুলেই বলি ব্যাপারটা। কিন্তু, খবরদার ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ কথাটা জানতে না পারে। প্রথমে লুসির মাথাটা কেটে শরীর থেকে আলাদা করে ফেলব আমি। এরপর বুক চিরে ছিঁড়ে বের করে আনব হৃৎপিণ্ড। ওকি, ওরকম শিউরে উঠলে কেন? তুমি না ডাক্তার? মানুষ কাটার বিদ্যে না তুমি

রীতিমত সাধনা করে শিখে এসেছ? তাছাড়া এর আগে একাধিক জীবন্ত মানুষের শরীরে কি তুমি স্থির নিষ্কম্প হাতে ছুরি চালাওনি? মরা মানুষের বেলায় তোমার এত ভয় কেন?'

'চালিয়েছি, স্যার, তবে সে জীবন বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু আপনি যা করতে বলছেন, এ যে রীতিমত পৈশাচিকতা।'

'পিশাচের হাত থেকে বাঁচতে হলে পৈশাচিকতার দরকার আছে, জন। হ্যাঁ, এখন মন দিয়ে শোন আমার কথা। তোমার ভয় পাওয়ার বা মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ কাজটা করব আমি। নিজের হাতে। তুমি শুধু সাহায্য করে যাবে আমাকে। সম্ভব হলে আজই করতাম। কিন্তু কাল সমাধি অনুষ্ঠানের আগে এসে নিশ্চয়ই লুসিকে দেখতে চাইবে আর্থার। তখন তাকে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝান সম্ভব নাও হতে পারে। তোমাকে যা বলেছি, যেভাবেই হোক এক সেট যন্ত্রপাতি জোগাড় কর তুমি। কাল লুসির সমাধি অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে রাতের বেলায় চুপি চুপি তুমি আর আমি কবরখানায় ঢুকে আমাদের কাজ শেষ করে আসব। বুঝেছ?'

'না,' একটু ক্ষুণ্ন হয়েই জবাব দিলাম। 'আসলে কি করতে চাইছেন আপনি, স্যার? লুসির ওই সুন্দর মৃতদেহটাকে শুধু শুধু কাটাছেঁড়া করে কি লাভ? বিজ্ঞান বা মানুষের কোন উপকারেই তো এটা লাগবে না।'

'লাগবে,' স্থির শান্ত গলায় জবাব দিলেন প্রফেসর। তারপর আমার কাঁধে একটা হাত রেখে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তিনি, 'কিন্তু তা বোঝার সময় তোমার হয়নি এখনও। ব্যথা পেয়ো না, জন। বুঝতে পারছি তোমার এককালের ভালবাসার পাত্রীর শরীরটা পৈশাচিক ভাবে ছিন্নভিন্ন করতে যাচ্ছি জেনে ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছ না তুমি। কাজটা করতে আমারও যে কতটা খারাপ লাগবে তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না আমি। আমাকে তো তুমি ভালমতই জান, জন। অকারণে একটা কুটোও এদিক থেকে ওদিকে সরাই না আমি। তাছাড়া অতীতে যখনই তোমার কোন চরম দুর্যোগ উপস্থিত হয়েছে, প্রথমেই কি আমাকে মনে পড়েনি তোমার? সেসব দিনেও তো আমাকে অনেক খাপছাড়া কাজ করতে দেখেছ তুমি। তাহলে? তাহলে আমার কথা মেনে নিতে পারছ না কেন? মনে পড়ছে কি, লুসির মৃত্যু সময়ে লুসির ঠোঁটে চুমু খেতে যাবার আগে আর্থারকে জোর করে টেনে সরিয়ে নিয়েছিলাম আমি? অবাক হয়ে গিয়েছিলে তোমরা, হয়ত কিছুটা বিরক্তও। কিন্তু জান না সেদিন কত বড় সর্বনাশের হাত থেকে আর্থারকে টেনে সরিয়ে এনেছি আমি। সে সময়কার লুসির চোখের ভাষা কি পড়তে পেরেছিলে তোমরা? পারনি। কারণ সে-চোখ তোমাদের নেই। কারও রহস্যময়

অঙ্গুলি হেলনে আর্থারকে চুমো খেতে বাধ্য করছিল লুসি, নিজের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু আর্থারকে যখন টেনে সরিয়ে নিলাম, লুসির চোখের নীরব ভাষা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল আমাকে। কারণ আমি তার প্রিয়তমকে শয়তানের ক্লেদাক্ত অশুচি স্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। আমি জানি, শীঘ্রই আবার আঘাত হানবে সে শয়তান, আর তার জন্যেই আমার এ প্রচেষ্টা। যে করেই হোক আর্থারকে বাঁচাতেই হবে আমাকে।'

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন প্রফেসর, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ঘটে চলেছে নানারকম বিদঘুটে অস্বাভাবিক ঘটনা। এ কয়দিন যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলে তাহলে আজ পারছ না কেন? জোর করলে হয়ত প্রয়োজনের খাতিরে সব বলতে হবে তোমাকে আমার, কিন্তু তার ফল খারাপ ছাড়া ভাল হবে না। শুধু তোমার সাহায্য আমার দরকার বলেই এত কথা বলতে হচ্ছে আমাকে। যদি শেষ পর্যন্ত তোমার সাহায্য না পাই তাহলে একাই এগোব আমি। দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে রুখতে পারবে না,' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে গম গম করে উঠল প্রফেসরের কণ্ঠ। কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কোমল গলায় বললেন তিনি, 'আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর এক পৈশাচিক ভবিষ্যৎ। আর তার জন্যে আগে থেকেই কোমর বেঁধে তৈরি হতে হবে আমাদের। সামান্য ভুলের জন্যে বা সময়ের হেরফেরে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। অতএব, এখন থেকেই আমাদের অন্ততঃ নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে দেয়া চলবে না। এর পর আর কোন কথা আছে তোমার?'

এরপর আর কথা থাকতে পারে না। একটু আগে এই লোককেই মনে মনে পাগল ঠাউরেছি ভেবে অনুশোচনায় ভরে গেল মন। এতদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে থেকেও ওই অসাধারণ প্রতিভাবান লোকটাকে চিনতে ভুল করেছি আমি? ছিঃ ছিঃ! চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে সোজা প্রফেসরের পায়ে হাত দিয়ে মাফ চাইলাম, প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে আর তাঁর কোন কাজেরই কৈফিয়ত চাইব না আমি।

আমার কথায় অত্যন্ত খুশি হলেন প্রফেসর। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন নিজের ঘরে। বসে বসে চুপচাপ আকাশ পাতাল ভাবতে থাকলাম আমি।

২২ সেপ্টেম্বর।

ভোরবেলা প্রফেসরের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম বিছানার ওপর। আমি উঠে বসলে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন প্রফেসর। তাড়াতাড়ি বাথরুম সেরে এসে ওঁর সামনে বসতেই বললেন তিনি, 'তোমাকে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি

যোগাড় করতে বলেছিলাম না, তার আর দরকার নেই।'

'নেই! কেন?' অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম।

'কারণ, দেরি হয়ে গেছে অনেক,' বলে পকেট থেকে একটা ছোট্ট সোনার ক্রুশ বের করে আমাকে দেখালেন প্রফেসর। 'এটা চিনতে পার?'

'এটা তো কাল লুসির বুকে রেখে দিয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর চুরি হয়ে যায়। চুরি করেছিল ওদের বাড়িরই একজন চাকর। আর তার শাস্তিও সে পেয়েছে।'

'শাস্তি পেয়েছে?'

'নিচের তলায় রান্নাঘরের মেঝেতে মরে পড়ে আছে চাকরটা। সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। দেখলে মনে হয় একাধিক কুকুর জাতীয় হিংস্র পশুর দাঁত-নখের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে ওর। আর তার পাশেই পড়ে ছিল এই ক্রুশটা।'

'তাহলে! এখন কি করব আমরা?' বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করলাম।

'আপাততঃ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে খুব বেশিদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না,' বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'এখন তৈরি হয়ে নাও তো। ওদিকে আবার অনেক কাজ পড়ে আছে।' নতুন আর এক প্রহেলিকার মধ্যে আমাকে ফেলে রেখে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন প্রফেসর।

অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝে কাটল সারাটা দিন। হ্যাম্পস্টেড কবর-খানায় লুসিদের ব্যক্তিগত কবর তৈরি করে রেখে গেছেন লুসির পূর্বপুরুষরা। মিসেস ওয়েস্টেনরার আলমারিতে পাওয়া নথিপত্রেই একথা জানতে পেরেছেন প্রফেসর। সেই কবরখানায় কফিন বয়ে নেবার সময় ধার্য করা হল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আর্থারের জন্যেই এ সময়টা ঠিক করা হল। কারণ পাঁচটার আগে কিছুতেই এসে পৌছতে পারবে না সে। আর তাকে ফেলে লুসিকে সমাধিস্থ করার কথায় মন সায় দিল না কিছুতেই।

কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটায় এসে পৌছল আর্থার। ওর দিকে আর তাকানই যায় না। একদিকে প্রেমিকা, অন্যদিকে বাবার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছে বেচারা। ওকে আমার সাথে আসতে বলে লাশ রাখা ঘরের দিকে রওনা দিলাম আমি। নিঃশব্দে আমার পেছন পেছন হেঁটে এসে লাশঘরে ঢুকল আর্থার। ঘরে ঢুকেই শিশুর মত কেঁদে উঠল সে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'এ বিশাল পৃথিবীতে আপনার বলতে আমার আর কেউই রইল না, জন। বলতে পারিস এখন কি করব আমি?'

কি বলে সান্ত্বনা দেব ওকে? আস্তে করে ওর দু'কাঁধে আমার দু'হাত রেখে

ওকে টেনে আনলাম নিজের দিকে। নিবিড় ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে আবার হু হু করে কেঁদে উঠল আর্থার। আমার নিজের চোখও আর শুকনো রইল না। নিঃশব্দে টপ টপ করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল আমার দু'গাল বেয়ে।

বেশ খানিকক্ষণ পর আর্থারের আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে আস্তে করে বললাম, 'কেঁদে আর কি হবে, আর্থার, এখন শেষবারের মত একবার লুসিকে দেখবি, চল।'

নিঃশব্দে লুসির শয্যা পাশে এসে দাঁড়ালাম দু'জনে। আস্তে করে লুসির মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিলাম আমি। আগের চেয়ে হাজার গুণ বেড়ে গেছে লুসির রূপ। দেখে মনে হচ্ছে ছত্রিশ হাজার রাক্ষসের দেশের সেই মায়াবী যাদুকর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারীকে। যে কোন মুহূর্তে ওর কাঠির ছোঁয়ায় আবার ঘুম ভেঙে উঠে বসবে রাজার দুলালী। আহ্, তাই যদি হতো! শেষ পর্যন্ত আমার কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলেই ফেলল আর্থার, 'জন, সত্যিই কি মরে গেছে লুসি? তুই তো ডাক্তার। আর একবার ভালমত পরীক্ষা করে দেখ না ওকে।'

'না, আর্থার, সত্যিই মারা গেছে ও। কিন্তু এমন মৃত্যুর কথা আমি কখনও শুনিনি।' ও আবার ভুল বুঝে বসবে ভেবে বললাম, 'তবে কদাচিৎ হলেও মৃত্যুর পর কোন কোন মানুষের মধ্যে আবার উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা পচে তো যায়ই না, বরং জীবিতাবস্থা থেকেও সুন্দর হয়ে ওঠে। আসলে তাদের দেহের ভেতরই সুপ্ত থেকে যায় তাদের আত্মা। লুসির মৃত্যুটাও ঠিক তেমনি। এমন সময় দরজার বাইরে করাঘাতের শব্দ হতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কে?'

'সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, জন,' বাইরে থেকে বললেন প্রফেসর। 'শব বাহকেরা অপেক্ষা করছে।'

'নে, চল, আর্থার,' বলে লুসির মুখটা ঢেকে দিতে গেলাম আমি। কিন্তু আমাকে বাধা দিল আর্থার। এগিয়ে এসে আলতো করে লুসির কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল সে। তারপর পরম যত্নে ধীরে ধীরে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল লুসির মুখটা।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে মিছিল করে কফিন নিয়ে কবরখানার দিকে রওনা দিলাম আমরা। বিকেল যে এত বিষণ্ন লাগতে পারে ভাবিনি কখনও। রাস্তার পাশের ওক গাছগুলো পর্যন্ত যেন আমাদের শোকে অংশগ্রহণ করে দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে। আর গির্জার ঘন্টার প্রতিটা ধ্বনি যেন শেলের মত হৃদয়ে এসে বাজছে।

কাজ শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে গেল। রাতে খাবার টেবিলে বসে প্রায় কিছুই খেতে পারলাম না। কোনমতে খাওয়ার পালা সাঙ্গ হলে ড্রইংরুমে এসে বসলাম। মোটা একটা চুরুট ধরিয়ে একটানা টানতে লাগলেন প্রফেসর। কুণ্ডলী

পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে নীলচে সাদা ধোঁয়া। আর ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর কেবলই যেন ভেসে বেড়াতে লাগল লুসির অপূর্ব সুন্দর মুখ।

কতক্ষণ কেটে গেল জানি না, প্রফেসরের কাশির শব্দে চমক ভাঙল। খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করছেন প্রফেসর, বোধহয় কথা বলার জন্যেই। আর্থারের কিন্তু খেয়াল নেই। একভাবেই চুপ করে বসে ঘরের কোণের ফায়ারপ্লেসটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওই আগুনের মতই ব্যথার আগুন জ্বলছে তার মনে।

আরো বার দুয়েক কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন তিনি, 'যদি কিছু মনে না কর, তোমাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, আর্থার।'

যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে উঠে এসেছে এমনি ভাবে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে প্রফেসরের দিকে চেয়ে আস্তে করে বলল সে, 'বলুন।'

'লুসি কি তার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে উইল করে দিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। ওর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমার কাছ থেকে লুসির যাবতীয় ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং ডায়েরীটা দেখার অনুমতি চাইছি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'অবশ্য, কাজ শেষ হলেই আবার তা তোমাকে ফিরিয়ে দেব আমি শুধুমাত্র কৌতূহলের বশে ওগুলো দেখতে চাইছি না আমি, এর বিশেষ কারণ আছে। পাছে বেহাত হয়ে যায় এজন্যে তোমাকে জিজ্ঞেস না করেই ওগুলো সরিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস কর একটা কাগজও এ পর্যন্ত খুলে দেখিনি আমি।'

'মিছেই লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে, প্রফেসর। আমি জানি, আপনি চাইলে লুসি একান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরীটাও আপনার হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করত না। যার জিনিস সে-ই করত না, আর আমি করব এটা ভাবলেন কি করে আপনি?'

'ভেরি গুড, আর্থার। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। অবশ্য তোমার কাছ থেকে এ উত্তরই আমি আশা করেছিলাম,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। লুসির মৃত্যুর পর এই প্রথম আর্থারকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন তিনি, 'আমাদের সবার জীবনেই কোন না কোন সময়ে ঘনিয়ে আসে প্রচণ্ড অশান্তি আর দুঃখ। কিন্তু সেই অশান্তি আর দুঃখকে অতিক্রম করে শান্তি সুখের দুয়ারে পৌঁছতে হলে চাই অসাধারণ আত্মত্যাগ আর দুর্জয় সাহস। এবং তা হলেই, যত বড় দুঃখই আসুক না কেন, তাকে জয় করা যায়,' বলে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর। আর আর্থারকে জোর করে সোফা থেকে তুলে শুতে চললাম আমরা।

ওপরের তলার একটা ঘরে একই শয্যায় আর্থারের সাথে শুয়ে পড়লাম আমি।

কয়েক মিনিট পরই সে ঘরে এসে ঢুকলেন প্রফেসর। আমি উঠে বসতে গেলে ইশারায় আমাকে শুয়ে থাকতে বললেন তিনি। সারাটা রাত ঘরের কোণে একটা চেয়ারে বসে, কেন, কে জানে, আমাদের—বিশেষ করে আর্থারকে পাহারা দিলেন প্রফেসর। আর সারারাতই বাতাসে ভর করে বাগান থেকে ভেসে এলো হাস্নাহেনা আর রজনী গন্ধার স্নিগ্ধ সুবাস।

তিন

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

২২ সেপ্টেম্বর।

ঝড়ের গতিতে এগজিটারের দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন। জানালার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে অতীতের কথা ভাবছি। এই তো ক'দিন আগে হুইটবিতে ছিলাম। সেদিন আমার কাছ থেকে অনেক, অনেক দূরে ছিল জোনাথন। আর আজ? আজ সে আমার স্বামী, সুপ্রতিষ্ঠিত একজন আইনজীবী। এই তো আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে সে। কত ঘটনাই না ঘটে গেল এর মধ্যে, কত পরিবর্তন হয়ে গেল পারিপার্শ্বিক অবস্থার।

সুচারু রূপেই মিস্টার হকিন্সের শেষকৃত্য সমাধা হয়েছে। আমি আর জোনাথন ছাড়াও ওঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু, যাঁরা এগজিটারেই থাকেন এবং তাঁর লণ্ডনস্থ একজন মক্কেল স্যার জন প্যাক্সটনও কবর দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করলেন স্যার প্যাক্সটনই। ভারাক্রান্ত চোখে সারাক্ষণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের পিতৃস্থানীয় মিস্টার হকিন্সের কবর দেয়া দেখলাম আমি আর জন।

কাজ শেষ হলে ঘোড়া গাড়িতে চেপে শহরে ফিরে এসেছিলাম আমরা। গাড়ি থেকে নেমে অনিশ্চিত ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে শুরু করলাম দু'জনে। শেষ পর্যন্ত জনের ইচ্ছায়ই হাইড পার্কের এক নির্জন কোণে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম আমরা। একটু পরই সাঁঝ ঘনিয়ে এল। খানিকক্ষণ পরই ভীষণ নিস্তব্ধ হয়ে এল জায়গাটা, কেমন যেন বিষণ্ণও। আর বসে থাকতে ভাল লাগল না, তাই উঠে পড়লাম। পিকাডিলির পথ ধরে পাশাপাশি হাঁটছি। সেই পুরনো দিনের মত আমার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিবিড় করে ধরে রেখেছে জোনাথন।

চারদিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছি, হঠাৎ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিরাট ঘোড়ার গাড়িতে একটা মেয়েকে বসে থাকতে দেখেই ভীষণভাবে চমকে

উঠলাম। চমকে ওঠার কারণ হল গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুলের ওপর একটা সুন্দর সাদা হ্যাট পরে একজন লোকের পাশে বসে আছে আমার প্রিয় বান্ধবী লুসি। এপাশ থেকে লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না ভালমত। এক ঝটকায় জোনাথনের মুঠো থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িটার দিকে দৌড়ে গেলাম। আমার পেছন পেছন ছুটে এল জন। গাড়ির কাছে পৌছে নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকলাম লুসিকে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লুসি, সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও। এতক্ষণে লোকটার চেহারা ভালমত নজরে পড়ল আমার। ওর ঈগলের মত বাঁকানো নাকের নিচে ছুঁচালো এক জোড়া গোঁফ, আর অদ্ভুত লাল দুটো চোখ। গাড়ির ভেতরের আবছা আলোয় আঙ্গারের মত ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে সে চোখ। ঠিক এই সময় অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল জোনাথন।

'কি হলো?' বলে উৎকণ্ঠিত ভাবে জোনাথনের দিকে ফিরে চাইলাম আমি।

আঙুল তুলে ঘোড়াগাড়িটার দিকে নির্দেশ করে বলল জোনাথন, 'এ সে-ই! ওকে চিনতে পারছ না তুমি, মিনা?'

জোনাথনের কথার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার চাইলাম গাড়িতে বসা লোকটার দিকে। সামনের দিকে এখন একটু ঝুঁকে বসায় রাস্তার পাশের একটা দোকানের আলো তেরছা ভাবে এসে পড়েছে লোকটার মুখে। সে আলোয় লোকটার চেহারা ভালমত নজরে পড়ল আমার। সঙ্গে সঙ্গেই শিউরে উঠলাম আতঙ্কে। কারণ এ মুখের সাথে আমার চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও বার বার শুনে শুনে আর পড়ে ও-চেহারা এখন আমার মুখস্থ। পাথরের মত রুক্ষ কঠিন লোকটার মুখ। টুকটুকে লাল ঠোঁটের কোণ থেকে উঁকি মারছে ঝকঝকে সাদা দুটো তীক্ষ্ণ দাঁত। চোখের দৃষ্টিতে ওর রাজ্যের লালসা, দেখলেই ঘিন ঘিন করে ওঠে সারা গা। ঠিকই বলেছে জোনাথন। এ সে-ই! কিন্তু ওর পাশে লুসি কেন? তবে কি···। একটা অজানা আতঙ্কে ধ্বক করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা।

এই সময় হঠাৎ চলতে শুরু করল গাড়িটা। ওটা আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই ঘুরে দাঁড়ালাম। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে চলমান গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে জোনাথন। আমি ফিরে দাঁড়াতেও কোন কথা বলল না সে। চলতে চলতে মোড় নিয়ে একসময় চোখের আড়ালে চলে গেল গাড়িটা।

গাড়িটা চলে যাবার পর জোনাথন আমার দিকে চাইতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটা কাউন্ট ড্রাকুলা না?'

'হ্যাঁ, কাউন্ট ড্রাকুলাই। কিন্তু এরই মাঝে এত তরুণ হয়ে গেল কি করে ও? আর ওর পাশের মেয়েটাই বা কে?'

হঠাৎ হাসপাতালের ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল আমার। এসব ব্যাপার

নিয়ে জোনাথনের স্নায়ুতে চাপ পড়লে ক্ষতি হতে পারে ওর, বলেছিল ডাক্তার, তাই আর কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে সে-জায়গা থেকে সরে পড়লাম। কিন্তু বাড়ি ফিরে যেতে মন চাইছে না। অগত্যা গ্রীন পার্কের একটা বেঞ্চিতে এসে বসলাম দুজনে, পাশাপাশি। কিন্তু সেখানেও বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। শেষ পর্যন্ত 'দুত্তোর' বলে উঠেই পড়ল জোনাথন, সাথে সাথে আমিও।

আবার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম আমরা। মন জুড়ে ভিড় করে আছে আমার ড্রাকুলার চিন্তা। শুধু ড্রাকুলা হলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু তার সাথে লুসি কেন? হাঁটতে হাঁটতেই একসময় বাড়ির কাছে এসে পড়লাম। কিন্তু বাড়িতেও মন টিকবে না। মিস্টার হকিন্সের অনুপস্থিতি অসহ্য পীড়া দেবে মনকে। তবুও জোনাথনের বিশ্রামের কথা ভেবে ঢুকে পড়লাম বাড়িতে।

নিজের ঘরে এসে ঢুকতেই একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল চাকরটা। কে আবার টেলিগ্রাম করতে গেল আমার কাছে? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে খুললাম খামটা। লেখাটা পড়েই কেঁপে উঠলাম থর থর করে। ধপ্ করে বসে পড়লাম বিছানার ওপর।

'কি হলো, কি হলো?' উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করল জোনাথন। নিঃশব্দে ওর হাতে তুলে দিলাম টেলিগ্রামটা। শব্দ করে পড়ল জোনাথন, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পাঁচদিন আগে মারা গেছেন মিসেস ওয়েস্টেনরা, লুসিও মারা গেছে গত পরশু। আজই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ওদের—প্রফেসর ভ্যান হেলসিং।'

জোনাথনের পড়া শেষ হতেই বললাম, 'জানো, আজ কাউন্ট ড্রাকুলার পাশে বসে থাকা মেয়েটা কে ছিল? স্বয়ং লুসি। এখন বুঝতে পারছি লুসির মৃত্যুটা অস্বাভাবিক। যে-কোন রহস্যময় উপায়েই হোক লুসিকে নিজের দলে টেনে নিয়েছে শয়তান, পিশাচ কাউন্ট ড্রাকুলা। আর আজ সন্ধ্যার পর ঘোড়া গাড়িতে বোধহয় কাউন্ট ড্রাকুলার সাথে নৈশ অভিসারেই বেরিয়েছিল লুসি। ঈশ্বর, এ-ও দেখতে হলো আমাকে।'

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

২২ সেপ্টেম্বর।

সমস্ত কাজ শেষ হয়ে যাবার পর রিং-এ ফিরে গেছে আর্থার, সাথে করে নিয়ে গেছে কুইনসে মরিসকে। এ ক'দিন ছায়ার মত আমাদের সাথে সাথে থেকে সব কাজে সাহায্য করেছে মরিস। আশ্চর্য! ওর মুখ দেখে একবারও মনে হয়নি লুসির মৃত্যুতে সামান্যতম ব্যথা পেয়েছে সে। আসলে ব্যথা সে ঠিকই পেয়েছে, ও-ও তো ভালবাসত লুসিকে, কিন্তু প্রচণ্ড সহনশীলতা ওর। অন্তরে সারাক্ষণ জ্বলে পুড়ে

মরেছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি তার।

আজ রাতের গাড়িতে আমস্টারডামে ফিরে যাবেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং, তবে আগামীকালই আবার ফিরে আসবেন তিনি। ওখানে নাকি কয়েকটা ব্যক্তিগত কাজ শেষ করতে হবে তাঁকে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। হ্যাম্পস্টেড গির্জার চূড়াটা পরিষ্কার চোখে পড়ছে এখান থেকে। নির্জন পাহাড়ী উপত্যকার ওই রকম এক গির্জা সংলগ্ন উন্মুক্ত আঙিনার কাছের কবরখানায় নিজের আত্মীয় স্বজনের পাশে এখন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত লুসি। ভোরের সোনালী আলোয় ঝলমল করছে সারাটা উপত্যকা। ওদিক থেকে বয়ে আসা ঝিরঝিরে দখিনা হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসছে নাম না জানা বুনো ফুলের গন্ধ।

আগামীকাল প্রফেসর ফিরে না আসা পর্যন্ত করার কিছুই নেই। এ সময়টা কি করে কাটাব ভাবছি। দারুণ উত্তেজনায় কি করে কেটে গেছে গত কটা দিন টেরই পাইনি। এখন সমস্ত উত্তেজনার শেষে দিন রাতের প্রতিটা মুহূর্তকে অসম্ভব দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হল, তাই তো, এমন সুন্দর একটা দিন, কাটানর অসুবিধে কোথায়? লুসির কবরখানায় চলে গেলেই হয়। ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটানর এক বিচিত্র জায়গা ওটা। কথাটা মনে হতেই উঠে পড়লাম।

এক কথায় অপূর্ব হ্যাম্পস্টেডের ওই পাহাড়ী উপত্যকাটা। চারদিকে গাছে গাছে ফুটে আছে অসংখ্য নাম না জানা বুনো ফুল, ওগুলোর গন্ধে ভুরভুর করছে এলাকাটা। আর ওসব ফুলের আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার প্রজাপতি। বিচিত্র ওদের রঙ, কোনটা গাঢ় নীল, লাল বা হলুদ, কোনটার কাল পাখার ওপর সাদা ছাপ, কোনটা মাখন রঙা আর কোনটা রামধনুর সাত রঙ গায়ে নিয়ে উড়ছে বিচিত্র কায়দায়।

পায়ের নিচের লম্বা সবুজ ঘাসের ভেতর ছুটোছুটি করছে অসংখ্য মেঠো ইঁদুর। প্রায়ই একটা বাদাম বা ওই জাতীয় কিছুতে ভাগ বসাতে গিয়ে তুমুল মারপিট বাধাচ্ছে ওরা। প্রকৃতির এতসব আশ্চর্য জিনিস দেখতে দেখতে ভুলেই গেলাম লুসির কথা।

দুপুর পর্যন্ত একটানা ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে এসে শুয়ে পড়লাম একটা বিশাল ওকের ছায়ায়। আমি শোয়ার মাত্র মিনিটখানেক পরই ছোট ছোট প্রাণীর আনাগোনায় জ্যান্ত হয়ে উঠল আমার আশপাশটা। ঝোপের ভেতর থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসছে খরগোশ। গাছ থেকে অতি সাবধানে নেমে আসছে কাঠবিড়ালী। সারাক্ষণ কান খাড়া হয়ে আছে ওদের। সামান্যতম বিপদের আভাস

পেলেই ছুটে পালিয়ে যাবে নিরাপদ আশ্রয়ে। পরিষ্কার নীল আকাশের কোথাও একরত্তি মেঘ নেই। বহু ওপরে, স্থির শান্ত ভঙ্গিতে ডানা মেলে দিয়ে ভাসছে একটা চিল। দেখতে দেখতে দু'চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

ঘুম ভাঙল গির্জার সান্ধ্য ঘন্টাধ্বনিতে। ওরে বাবা, এতক্ষণ ঘুমিয়েছি। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। পশ্চিমাকাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। তার টকটকে লাল আভায় রঙিন হয়ে গেছে ওদিককার আকাশ। আর দেরি করা যায় না। উঠে দাঁড়িয়ে রওনা হলাম বাড়ির দিকে। পেছনে বিষণ্ন একঘেয়ে ঢং ঢং শব্দে বেজেই চলল হ্যাম্পস্টেড গির্জার ঘন্টা।

চার

অদ্ভুত কয়েকটা খবর বেরোল ২৫ সেপ্টেম্বর, 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট' পত্রিকায়। সকালের সাধারণ সংখ্যায় বেরোল নিচের খবরটাঃ

হ্যাম্পস্টেড রহস্য

গত দুই তিন দিন ধরিয়া কতকগুলি ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা ঘটিয়া চলিয়াছে হ্যাম্পস্টেড এবং তাহার আশেপাশের এলাকায়। ঘটনা-গুলিকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করিতেছে লোকেরা। কেউ 'কেনসিংটনের আতঙ্ক', কেউ 'আততায়ী রমণী', আবার কেউ বা বলে 'শ্বেতবসনা সুন্দরী'। উক্ত কয়েকদিন ধরিয়া বেশ কিছু সংখ্যক শিশু খেলার মাঠ বা অন্য কোন জায়গা হইতে বাড়ি ফিরিবার পথে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হইয়া যায়। এবং এই নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার ঘটনাগুলি ঘটে সন্ধ্যার পর। এই শিশুদের কেউ কেউ গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসে, আর কেউবা ফেরেই না। পরে কোন ঝোপঝাড়ে বা কোন নির্জন জায়গায় অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় উহাদের। তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। সব কয়জন শিশুই একই উত্তর দিয়াছে। তাহারা বলে, কে একজন রহস্যময়ী নারী তাহাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তারপর কি ঘটে আর তাহারা বলিতে পারে না।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়াছে, এইসব ঘটনায় পতিত প্রতিটি শিশুর গলায় সূক্ষ্ম দুটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ ইঁদুর বা ছোট আকারের কুকুরের দাঁতের কামড়ের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে। হ্যাম্পস্টেডের চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য অত্যন্ত জরুরী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে স্থানীয় শান্তিরক্ষা বাহিনীকে।

সেই দিনই 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট' পত্রিকার বিশেষ সংস্করণে বেরোল নিম্নোক্ত খবরটিঃ

হ্যাম্পস্টেডের আতঙ্ক!
আর একটি শিশু আহত!!

আবার সেই রহস্যময়ী নারী!!!

এইমাত্র গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র হইতে জানা গেল যে গত রাত্রে নিখোঁজ একটি শিশুকে আজ সকালে হ্যাম্পস্টেডের কাছাকাছি সুটার পাহাড়ের নির্জন জঙ্গল হইতে খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শিশুটির গলায় সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন এবং তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল এক রহস্যময়ী নারী। তবে অন্যান্য শিশুর তুলনায় এ শিশুটি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহার শরীর প্রায় রক্তশূন্য।

পাঁচ

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

২৪ সেপ্টেম্বর।

দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি গত দুটো রাত। বার বারই ঘুরেফিরে মনে হয়েছে লুসি আর কাউন্ট ড্রাকুলার কথা। আমার স্বামীকে শেষ করতে বসেছিল কাউন্ট ড্রাকুলা, কেবল দুর্জয় সাহস আর কপাল গুণে বেঁচে গেছে জোনাথন। কিন্তু তার পৈশাচিকতা থেকে বাঁচতে পারেনি লুসি, আমার প্রিয় বান্ধবী। কাউন্ট ড্রাকুলা, লুসির এ সর্বনাশের জন্যে কিছুতেই ক্ষমা করব না আমি তোমাকে। যে কোন উপায়ে যে কোন মূল্যে তোমার ধ্বংস আমি দেখবই। না হলে আরও কত মূল্যবান প্রাণকে পিশাচে পরিণত করবে তুমি কে জানে? ওই শয়তানটাকে ধ্বংস করতে হলে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং-এর সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। জোনাথনের ডায়েরীতে বর্ণিত কাহিনী প্রফেসরকে জানাব ভাবছি, তাহলে তাঁর কাজে হয়ত অনেক সুবিধে হবে। হ্যাঁ, তাই জানাব। তবে তার আগে ডায়েরীতে বর্ণিত কাহিনীর প্রতিটা লাইন টাইপ করে ফেলতে হবে আমাকে।

২৫ সেপ্টেম্বর সকালে মিনা হারকারের কাছ থেকে একটা ছোট্ট টেলিগ্রাম পেলেন প্রফেসর ভ্যান হেলসিং ঃ

'সম্ভব হলে আজ সকাল সোয়া দশটার ট্রেনেই চলে আসুন—উইনহেল মিনা

হারকার।'

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

২৫ সেপ্টেম্বর।

প্রফেসরের এখানে এসে পৌছানোর সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তেজনা বোধ করছি মনে মনে। কেন যেন কেবলই মনে হচ্ছে জোনাথনের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ওপর নতুন কোন আলোকপাত করতে পারেন তিনি। তাছাড়া লুসির অন্তিম মুহূর্তেও একেবারে সামনে উপস্থিত ছিলেন তিনি, তাঁর মুখ থেকে সব কথা শুনতে পাব, সেটাও কম উত্তেজনার ব্যাপার নয়। আজ মনে হচ্ছে লুসির 'নিশিতে পাওয়া', 'ঘুমের ঘোরে হাঁটা'র মধ্যে সত্যিই অলৌকিক কিছু একটা ছিল। হুইটবির সেই ঘটনাগুলো পরিষ্কার ভেসে উঠল মনের পর্দায়। তন্ময় হয়ে সেসব কথা ভাবছি, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। চমকে উঠে হাতঘড়ির দিকে চাইতে চাইতে দরজা খুলতে এগিয়ে গেলাম। আড়াইটা বাজে ঘড়িতে।

দরজা খুলতেই দেখলাম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন একজন ভদ্রলোক। মাঝামাঝি উচ্চতার, চমৎকার স্বাস্থ্য, পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ শরীর, পরিষ্কার করে কামান চিবুক, আর গভীর নীল দুটো চোখ ভদ্রলোকের। দেখলেই বোঝা যায় যথেষ্ট বয়েস হয়েছে ভদ্রলোকের, অথচ এখনও মুখের কোথাও ভাঁজ পড়েনি একটা। প্রফেসর ভ্যান হেলসিংকে চোখে দেখিনি কখনও, কিন্তু এখন এই ভদ্রলোককে দেখেই বুঝলাম ইনিই সেই বিখ্যাত প্রফেসর। দেখলেই ওঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসবে যে কোন লোকের।

অভিবাদন জানিয়ে বললাম, 'আসুন, প্রফেসর।'

মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে প্রত্যাভিবাদন জানালেন প্রফেসর, তারপর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'তুমিই বোধহয় মিনা, লুসির বান্ধবী?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর।'

'তোমাকে তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে করনি তো?'

'কি যে বলেন, প্রফেসর। আপনি করে বললেই বরং লজ্জায় পড়ে যেতাম আমি। বসুন,' একটা সোফা দেখিয়ে বসতে বললাম প্রফেসরকে।

একটা সোফায় বসে পড়ে মৃদু হেসে বললেন প্রফেসর, 'আমাকে তুমি নিরাশ করনি, মিনা। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম। লুসির বান্ধবী লুসির মতই হবে। আসলেও তুমি তাই। লুসির মতই নম্র ব্যবহার, আর লুসির মতই রূপ তোমার।' প্রফেসরের কথায় লজ্জা পেলাম। বললাম, 'আসলে আপনি বাড়িয়ে বলছেন, প্রফেসর।'

'এক বিন্দুও না,' বলেই আসল কথায় এলেন প্রফেসর। 'হ্যাঁ, এবার কাজের কথায় আসা যাক। কি কারণে আমাকে এখানে ডেকেছ তুমি?'

'সবই বলব,' বলে উঠে-গিয়ে দেরাজ থেকে জোনাথনের ডায়েরীতে বর্ণিত কাহিনীর একটা টাইপ করা কপি বের করে এনে প্রফেসরের হাতে দিতে দিতে বললাম, 'তবে তার আগে এটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন।'

'কি ওটা?' আমার হাত থেকে কাগজগুলো নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'আমার স্বামীর লেখা ডায়েরীর একটা কপি।'

কাগজগুলো হাতে নিয়েই পড়তে শুরু করলেন প্রফেসর। এই সুযোগে খাবার ব্যবস্থা দেখতে নিচে নেমে এলাম আমি। সব কিছু গোছগাছ করে ওপরে এসে দেখলাম, ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন প্রফেসর, সারা মুখ থমথমে গম্ভীর। আমাকে দেখেই মৃদু হাসলেন প্রফেসর, যেন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঁকি দিল। বললেন, 'অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, মিনা। বুদ্ধি করে আমাকে ডেকে এনে ঠিকই করেছ তুমি। তোমার স্বামীর লেখা ওই কাহিনী সবটা পড়িনি এখনো, তবে যেটুকু পড়েছি তাতেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। কিন্তু কথা কি জান, আমাদের মাথার ওপর ঘনিয়ে আসছে গাঢ় মেঘ, প্রচণ্ড তুফান উঠতে যাচ্ছে, এ সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। এ সময়ে তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আর জোনাথনের মত দুঃসাহসী ছেলে আমার একান্তই দরকার। আশা করি আমাকে সাহায্য করবে তোমরা।'

'সাহায্য করতে এবং আপনার সাহায্য নিতেই তো আপনাকে ডেকে এনেছি এখানে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত হয়ত অনেক কিছুই আপনি জানেন না, প্রফেসর।'

'কি কথা, মিনা?'

'সে কথা বললেও বিশ্বাস করা কঠিন। সেদিন মিস্টার হকিন্সকে সমাধিস্থ করার পর বাড়ি ফিরতে ভাল লাগছিল না বলে পিকাডিলির ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম আমি আর জোনাথন। সে সময়েই ঘটে ঘটনাটা।'

'কি সে ঘটনা?'

'লুসিকে কাউন্ট ড্রাকুলার পাশে বসে থাকতে দেখেছি আমি, একটা বিশাল ঘোড়া গাড়ির ভেতর।'

'কি বললে?'

'হ্যাঁ, তাই,' বলেই হঠাৎ খেয়াল হল আমার; এখনো খাওয়া দাওয়া হয়নি প্রফেসরের। তাড়াতাড়ি বললাম, 'সে কথা পরে বলা যাবে, সব বলার জন্যেই তো ডেকে এনেছি আপনাকে। তার আগে চলুন তো, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নেবেন।

খেতে খেতেই না হয় বলা যাবে সব।'

প্রফেসরকে সাথে নিয়ে নিচের ডাইনিং রুমে নেমে এলাম। খেতে খেতেই সেদিনের সমস্ত ঘটনা খুঁটিয়ে বললাম ওঁকে। একটাও প্রশ্ন না করে আমার সব কথা শুনলেন তিনি। তারপর বললেন, 'পৃথিবীতে প্রতিদিন কত বিচিত্র ঘটনা যে ঘটছে আমরা তার ক'টার হিসেব রাখি, মিনা। তোমার দেখা ঘটনাটাও তেমনি অনেক ঘটনার একটা। যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার, দেখেছিও কম না। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেই বলছি, তোমার কথা শুনে হাসা তো দূরের কথা, বরং আমার ভাবনা আরও বেড়ে গেছে। ভেবেছিলাম আরও ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু এত তাড়াতাড়িই যে কাজ শুরু করে দেবে পিশাচটা ভাবিনি। তা তোমার স্বামী কেমন আছে এখন? দেখছি না যে ওকে?'

'কোর্টে গেছে। ফিরতে আরও দেরি হবে। সেদিন কাউন্ট ড্রাকুলাকে দেখার পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে ও। মনে হচ্ছে আবার নার্ভাস ব্রেক ডাউন ঘটতে যাচ্ছে ওর।'

'ঘটবে না। কিচ্ছু ভেব না তুমি। এসে যখন একবার পড়েছি, নার্ভাস ব্রেকডাউন আর হতে দেব না ওর। আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারবে না, মিনা?'

'না পারলে কখনোই আপনাকে ডেকে আনতাম না এখানে।'

'ভেরি গুড! তা এখন আমার একটু কাজ আছে। উঠি।'

'রাতের বেলা ফিরবেন তো?'

'না। যদিও এগজিটারেই থাকছি আজ রাতে, তোমার এখানে ফিরতে পারব না। কাজ শেষ করতে করতে হয়ত অনেক রাত হয়ে যেতে পারে। হোটেলেই কোনমতে কাটিয়ে দেবোখন।' বলে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তারপর কি মনে হতেই বললেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, টাইপ করা কাগজগুলো নিয়ে যেতে পারি আমি? সবটা তো পড়তে পারিনি তখন, সময়মত পড়ে দেখব।'

'নিশ্চয়ই আসলে আপনার জন্যেই টাইপ করে রেখেছিলাম ওগুলো।'

আমার কথায় দারুণ খুশি হলেন প্রফেসর। বললেন, 'সত্যিই, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়েদের নিয়ে কাজ করে আরাম আছে। ঠিক আছে, এখন চলি। কাল যদ্দূর সম্ভব সকাল সকাল এখানে এসে পড়ব আমি,' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আবার বলছি তোমাকে, জোনাথনের জন্যে একটুও চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর।

আশায় আনন্দে দুলে উঠল বুকটা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ওই লোকের ওপর যে কোন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায়।

আস্তে করে এগিয়ে গেলাম জানালাটার কাছে। শিকের গায়ে কপাল ঠেকিয়ে চেয়ে থাকলাম বাগানের দিকে। আমার নিজ হাতে লাগান সাদা গোলাপ গাছটায় একটা ইয়া বড় ফুল ফুটেছে। কোত্থেকে তার ওপর উড়ে এসে বসেছে একটা কাল ভ্রমর। ওটা দেখেই লুসির পাশে কাউন্ট ড্রাকুলার কথা মনে হল আমার। লুসি যেন ওই সাদা গোলাপ, আর ড্রাকুলা কাল ভ্রমর। দাউ দাউ করে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল আমার মনে। অস্ফুটে বললাম, 'কাউন্ট ড্রাকুলা, তৈরি থেকো। আবারো বলছি, লুসির মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবোই।' কিন্তু তখনো কি জানতাম কাজটা কতটা কঠিন আর বিপজ্জনক?

ছয়

জোনাথন হারকারের ডায়েরী থেকে

২৬ সেপ্টেম্বর।

আবার নতুন করে শুরু করতে হবে ভাবিনি, উপায়ও নেই না করে। এত আনন্দ কেমন করে চেপে রাখব আমি? গত রাতে খাবার টেবিলে প্রফেসর ভ্যান হেলসিং-এর সাথে সাক্ষাৎকারের কথা আমাকে বিস্তারিত বলেছে মিনা। প্রফেসরের আশ্বাসবাণীতে যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছি আমি। স্বপ্ন আর বাস্তবতার এক গভীর সন্দেহ এতদিন কুরে কুরে খেয়েছে আমার মনকে, তা থেকে কাল মুক্তি পেয়েছি। এখন থেকে আর কোন কিছুতেই ভয় পাব না, ভয় পাব না স্বয়ং কাউন্ট ড্রাকুলাকে দেখেও।

একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি। লণ্ডনে এসেই কি করে যৌবন ফিরে পেল কাউন্ট ড্রাকুলা? যেভাবেই পাক, তা নিয়ে আর ভাবব না। প্রফেসর হেলসিং ওর বিরুদ্ধে লেগেছেন যখন, এর কারণ একদিন জানতে পারবই।

আমরা আজ সকালে নাস্তা করতে বসার আগেই এসে হাজির হয়েছেন প্রফেসর। বলতে কি, আমার জীবনের এ এক স্মরণীয় মুহূর্ত। আমাকে দেখে যতটা খুশি হলেন প্রফেসর, তাঁকে দেখে তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হলাম আমি। ঘরে ঢুকেই এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে চিবুকটা ধরে আলোর দিকে ফিরিয়ে বললেন প্রফেসর, 'মিনা বলছিল তুমি অসুস্থ, কিন্তু কই, তার কোন লক্ষণ দেখছি না তো!'

'মিছে কথা বলেনি, মিনা,' ওঁকে বসতে বলে মৃদু হেসে বললাম, 'আসলে

গতকাল আপনার আগমন বার্তা শোনার আগে পর্যন্ত সত্যিই অসুস্থ ছিলাম আমি, প্রফেসর। আপনার আশ্বাসবাণী মিনার মুখ থেকে শোনার পর পরই সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছি আমি।'

'ভেরি গুড। এরকম রোগী না হলে চিকিৎসা করে মজা কোথায়?' হো হো করে হেসে উঠে বললেন প্রফেসর। ওঁর হাসির শব্দে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল মিনা, আমার জন্যে ডিমের ওমলেট করে আনতে কিচেনে গিয়েছিল সে। মিনাকে ঢুকতে দেখেই ওর উদ্দেশ্যে বললেন প্রফেসর, 'কেমন মিনা, বলিনি, ভাবনার কোন কারণ নেই, ভাল হয়ে যাবে জোনাথন?'

'এর আগে অনেকের মুখেই শুনেছিলাম, প্রফেসর ড্যান হেলসিং-এর চেহারা দেখেই রোগীর দেহ ছেড়ে রোগ পালায়, কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়,' হেসে জবাব দিল মিনা। 'তা এখন তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন তো, প্রফেসর। আর একটা প্লেট নিয়ে আসছি আমি।'

খাওয়া শেষ করে মোটা একটা চুরুট ধরালেন প্রফেসর। চুরুটে গোটা কয়েক টান দিয়ে বললেন, 'তোমার ডায়েরীতে বর্ণিত কাহিনীটা আমি পড়েছি, জোনাথন। কিন্তু সবটা ব্যাপার আবার এখন তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই আমি। কাহিনীর কোন কোন জায়গা এখনও দুর্বোধ্য ঠেকছে। সে সব জায়গাগুলো নিয়ে আলোচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে অনেক কিছু।'

'সব বলব, প্রফেসর। তবে তার আগে আমার ছোট্ট একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। কাউন্ট ড্রাকুলার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করেন আপনি?'

'অবশ্যই। লুসিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।'

প্রফেসরের কথা শুনে খুশিতে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। সভ্য জগতের একজন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন মানুষ আমার এই অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কাহিনী বিশ্বাস করবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। একথা কাউকে বলে বিশ্বাস করাতে পারব না, এ চিন্তাটাই আসলে এতদিন আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে। বললাম, 'তাহলে শুনুন, প্রফেসর।' নড়ে চড়ে চেয়ারে আরাম করে বসলেন প্রফেসর। আর আমি বলে যেতে থাকলাম আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতার কথা, একটুও না বাড়িয়ে, একটুও না কমিয়ে।

বসে বসে আমার সব কথা শুনলেন প্রফেসর। মাঝেমধ্যে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছিলেন এটা ওটা। আমার কথা শেষ হবার পরও কয়েক মিনিট চুপচাপ কিছু ভাবলেন প্রফেসর। তারপর হাতঘড়ির দিকে একবার চেয়েই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অনেক, অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছ আমাকে তুমি, জোনাথন। সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমাকে আবার হুইটবিতে ফিরে যেতে হচ্ছে। সাড়ে

দশটার ট্রেন ধরতে হলে আর দেরি করা যায় না।'

'আমার জীবনের ওই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা যদি আপনার সামান্যতম কাজেও লাগে তাহলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব, প্রফেসর। চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।'

স্টেশনে যাবার পথে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'তোমাকে যদি ইতিমধ্যে কখনো হুইটবিতে গিয়ে আমার সাথে দেখা করতে বলি, তাহলে তোমার কোন অসুবিধে নেই তো, জোনাথন?'

'অসুবিধে? কিছুমাত্র না। যখনই খবর পাঠাবেন, দেখবেন, উড়ে গিয়ে হাজির হয়েছি।'

'সম্ভব হলে মিনাকেও নিয়ে যেয়ো।'

'সে অনুমতিই তো আপনার কাছে চাইতে যাচ্ছিলাম আমি।'

স্টেশনে পৌঁছে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে হল না। জানালার কাছেই সীট পেলেন প্রফেসর। ওঁর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এমন সময় একজন খবরের কাগজের হকার দেখে সেদিনকার এক কপি 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট' কিনলেন প্রফেসর। আমার সাথে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকেই কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখছিলেন, হঠাৎ কাগজের এক জায়গায় চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি, থমথমে কঠিন হয়ে গেল মুখ চোখ। আর একবার মনোযোগ দিয়ে সংবাদটা পড়লেন তিনি। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'এত কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর পথ বেছে নেবে পিশাচটা, ভাবিনি।' কি খবর পড়ে অমন চমকে উঠলেন প্রফেসর, উঁকি দিয়ে দেখতে গেলাম। ওদিকে হুইসল্ দিয়ে চলতে শুরু করেছে গাড়ি। কাজেই খবরটা পড়তে পারলাম না, কিন্তু হেডিংটা ঠিকই পড়লাম, 'হ্যাম্পস্টেড রহস্য'। ঠিক করলাম এখুনি একটা কাগজ কিনে নিয়ে খবরটা পড়তে হবে।

ক্রমশঃ গতি বাড়ছে ট্রেনের। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর, 'খুব শিগগিরই বোধহয় হ্যাম্পস্টেডে আসতে হতে পারে তোমাদের। তৈরি থেকো।'

গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে চলে যেতেই একটা 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট' কিনে খবরটা পড়লাম। পড়ে প্রফেসরের মতই চমকে উঠলাম আমিও। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গের তিন ডাইনীর কথা। এখনও পরিষ্কার কানে এসে বাজছে যেন ওই ডাইনীদের দিকে বাড়িয়ে ধরা কাউন্টের কাপড়ের পুঁটলির ভেতর মানব শিশুর কান্না!

সাত

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

২৬ সেপ্টেম্বর।

লুসিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় রেনফিল্ডের দিকে নজর দিতে পারিনি গত কয়েক-দিন। আজ খোঁজ নিয়ে জানলাম মোটামুটি ভালই আছে সে। আর কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি ওকে নিয়ে।

আর্থারের একটা চিঠি পেয়েছি গতকাল। একই খামে ভরে মরিসও চিঠি দিয়েছে একটা। তাতে জেনেছি ভালই আছে ওরা। মানসিক প্রফুল্লতা অনেকটা ফিরে আসছে আর্থারের।

এদিকে নিজেকে কাজের মাঝে ডুবিয়ে রেখেছি আমি। লুসির স্মৃতি থেকে মুক্তি পেতে হলে এছাড়া আর কোন পথ নেই। বেশ ভালই ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ করেই ঘটতে শুরু করেছে আবার নতুন ঘটনা। এসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কোথায় যে শেষ, ঈশ্বরই জানেন। আর প্রফেসর ভ্যান হেলসিং কিছু কিছু জানলেও এখন বলবেন না কিছুতেই। এগজিটার থেকে ফিরেছেন আজ প্রফেসর। আমি তখন শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে কোন কথা না বলে আমার দিকে 'দি ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট' পত্রিকাটা এগিয়ে দিয়ে একটা বিশেষ খবরের উল্লেখ করে বললেন, 'পড়েছ এটা?'

'পড়েছি সকালবেলাই। কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিনি। আর ও নিয়ে আমার অত মাথা ঘামাবার দরকারই বা কি? ওটা পুলিশের কাজ।' কিন্তু সেটা নিয়ে প্রফেসরের ভাবনা দেখে অবাক হলাম। না বুঝেই প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপারটা নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন, স্যার?'

'যেটার বিরুদ্ধে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে লড়ছি গত কয়েকদিন ধরে, সেটা নিয়ে ভাবব না?'

প্রফেসরের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে বোকার মত হাঁ করে বসে রইলাম। খেপে গেলেন প্রফেসর, 'আসলে তোমাকে চালাক মনে করতাম, জন। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা মিথ্যে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'রহস্যময় ভাবে হারিয়ে যাওয়া শিশুগুলোকে ফেরত পাবার পর ওদের গলায় দাঁতের সূক্ষ্ম ক্ষত দেখা যায়। এর সঙ্গে লুসির গলার ক্ষত দুটোর মিল এত সকালেই ভুলে বসে আছ?'

তাই তো। দুটো ব্যাপারে বেশ সাদৃশ্য আছে দেখছি! বললাম, 'বুঝতে পেরেছি। যে দুর্ঘটনায় লুসির মৃত্যু হয়েছে, সেই একই জাতীয় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল শিশুগুলো।'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে অনেকটা বুঝতে পেরেছ,' বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসলেন প্রফেসর। 'কিন্তু লুসির দুর্ঘটনা আর শিশুগুলোর দুর্ঘটনার জন্যে আলাদা আলাদা শক্তি দায়ী।'

বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন প্রফেসর, 'একটা কথার জবাব দাও তো। এ পর্যন্ত লুসির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছি আমি। তার একটুও কি তোমার মাথায় ঢোকেনি?'

'ঢুকবে না কেন? অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে স্নায়বিক দুর্বলতাই লুসিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

'গুড। কিন্তু সে-রক্তক্ষরণের কারণ কি? কোথায় গেল ওই রক্ত?'

প্রফেসরের প্রশ্নে চমকে উঠলাম। তাই তো! এমন করে তো ভেবে দেখিনি কখনো। রক্তক্ষরণের কোন কারণই তো ঘটেনি লুসির শরীরের কোথাও। তাহলে? প্রফেসরের প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেলাম না।

আমার বিছানার একেবারে পাশে চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে এলেন প্রফেসর। তারপর যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছেন, এমন ভাবে বলতে শুরু করলেন তিনি, 'আসলে তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সাহসী এবং যুক্তিবাদী হলেও কোনকিছু আচ্ছন্ন করে রেখেছে তোমার মন। ফলে দৈনন্দিন জীবনের বাইরের কোনকিছুর সাথে সম্পর্ক নেই তোমার, সেদিকে ফিরেও তাকাও না তুমি। জানা-অজানার মাঝে এমন অনেক কিছু আছে এই পুরনো পৃথিবীতে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, নেই ওগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। অথচ অস্বীকার করতে পারা যায় না ওগুলোকে। যেমন, সম্মোহন—একে অস্বীকার করতে পার কি তুমি? এই সম্মোহন জিনিসটা কি, এর যথাযথ উত্তর কি বিজ্ঞান দিতে পেরেছে?'

'কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো একে অস্বীকার করে না।'

'বেশির ভাগই করে। আর যারা করে না, তারাও এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে পরিষ্কার করে বলতে পারে না কিছু।'

বুঝলাম তর্ক করে লাভ নেই। আমি নিজেও এ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। অতএব চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম। আমাকে নিরুত্তর দেখে আবার বলে চললেন প্রফেসর, 'অতীতে হাজার হাজার রহস্যময় কাণ্ড ঘটেছে এই পৃথিবীতে, আজও ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। তার কিছু কিছু সমাধান হয়ত করতে পেরেছে বা পারবে মানুষ, কিন্তু বেশির ভাগই মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

বল তো দেখি, যেখানে বড় জোর দেড়শো বছর বাঁচে মানুষ, তাও কচিত কদাচিৎ, সেখানে ন'শো বছর বেঁচে ছিল কি করে মেথুসেলা? ছোট বড় সব জাতের মাকড়সাই অল্প ক'দিনের বেশি বাঁচতে পারে না, অথচ স্পেনের এক পুরনো গির্জায় শুধুমাত্র প্রদীপের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত চর্বি খেয়ে কি করে শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে ছিল সেই বিখ্যাত বিশাল মাকড়সাটা? এসব প্রশ্নের কি জবাব দেবে তুমি?' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন প্রফেসর, 'জান, দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অংশে এবং পশ্চিম সাগরের কোন কোন দ্বীপে এক জাতের ছোট আকারের বাদুড় আছে, যার নাম ভ্যাম্পায়ার। দিনের বেলা গাছের ডালে মড়ার মত ঝুলে থাকে, আর রাতের বেলা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর দেহ থেকে চুরি করে রক্ত খেয়ে যায় ওরা। একটা মশা কামড়ালে মশার বাপ-মা চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে থাপ্পড় মেরে শরীর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করি ওটাকে আমরা। অথচ মশার চেয়ে লাখগুণ বড় ওই ভ্যাম্পায়ারেরা এই আমাদের মত মানুষের দেহ থেকেই রক্ত খেয়ে চলে যায়, অথচ টেরও পায় না মানুষ। কেন? কোন্ কৌশলে গায়ের চামড়া ফুটো করে রক্ত খায় ওরা, তা আজও বলতে পারে না বিজ্ঞানীরা। জান, অনেক সময় ভ্যাম্পায়ার আছে এমন সব দ্বীপের কাছ দিয়ে যাবার সময় প্রাণ দিতে হয় অনেক নাবিককে? দিনের বেলায় কিছু না, কিন্তু রাতে জাহাজের ডেকে পাহারারত নাবিকের গায়ের রক্ত খেয়ে চলে যায় ভ্যাম্পায়ার। চলতে থাকে রাতের পর রাত এই ঘটনা। প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারে না নাবিকেরা কিন্তু ক্রমাগত শরীরের রক্ত বেরিয়ে যাবার ফলে ফ্যাকাসে হতে শুরু করে ওই নাবিকদের শরীর। আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওরা। লুসির কেসটাও অনেকটা এই রকম। না হলে, চার চারজন সুস্থ সবল পুরুষের শরীরের রক্ত দেয়ার পরও রক্তশূন্যতায় ভুগে সে মারা যায় কি করে?'

'তাহলে, তাহলে স্যার, আপনি কি বলতে চান লুসির মৃত্যুর জন্যে ভ্যাম্পায়ারই দায়ী?'

'হ্যাঁ। তবে ওটা সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ার নয়, যদিও অনেকটা ভ্যাম্পায়ারের পদ্ধতিতেই কাজ করে। ইণ্ডিয়ায় অনেক তান্ত্রিক সাধক-ফকির আছেন, যাঁরা ইচ্ছে করলেই স্বেচ্ছায় মারা যেতে পারেন, আবার বেঁচেও থাকতে পারেন যতদিন খুশি। কবরের মত জায়গায় ওঁদেরকে বন্দী করে রাখলেও বেরিয়ে চলে আসতে পারেন ওঁরা। আমাদের এই ভ্যাম্পায়ারটা অনেকটা ওই ধরনের।'

একি শুনছি আমি? এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে লণ্ডনের মত সভ্য উন্নত নগরীর বুকেও কি এ ধরনের কাণ্ড ঘটতে পারে? বেশ কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম বিছানা থেকে। ওই অসাধারণ প্রতিভাবান

লোকটার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দুটো জোড় করে মিনতি জানালাম, স্যার, চিরদিনই আপনার প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। জীবনে বহু শিক্ষা পেয়েছি আপনার কাছে। আজও কিছু শেখান আমাকে, এভাবে অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে আর কতদিন চলবে?'

'সব কথা অবশ্যই তোমাকে বলব, জন। কিন্তু সময় আসেনি। এখন বললে হয়ত বিশ্বাসই করবে না সব কথা।'

'এমন কি কথা, স্যার, যে আপনি বললেও বিশ্বাস করব না?'

'করবে না। যেমন ধর শিশুদের গলার ছোট ছোট ক্ষতচিহ্নগুলোর কথা। তোমার মতে লুসির গলা আর শিশুদের গলার ক্ষতের জন্যে একই শক্তি দায়ী।'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই ধারণা...।'

'না, তা নয়, জন,' উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। 'আসল ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।'

'দোহাই আপনার, স্যার। আর হেঁয়ালি সইতে পারছি না আমি। যা বলার বলে ফেলুন,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

সোজা আমার চোখে চোখ রাখলেন প্রফেসর। ভরাট গম্ভীর গলায় বললেন, 'যদি বলি শিশুদের গলায় ওগুলো লুসির দাঁতের চিহ্ন?'

স্তব্ধ হয়ে গেলাম প্রফেসরের কথা শুনে। ধীরে ধীরে একটা অন্ধ ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার মনে। যেন আমার সামনে বিনা দোষে লুসির গালে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মেরে বসেছেন প্রফেসর। কয়েক মুহূর্ত কথা ফুটল না আমার মুখে। শেষে ফিসফিস করে বলেই বসলাম, 'আসলে, আসলে আপনি পাগল হয়ে গেছেন, স্যার?'

আমার কথায় বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না প্রফেসর, যেন এই উত্তরই আশা করেছিলেন তিনি। মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হলে সত্যিই খুশি হতাম, জন। এরকম নির্মম সত্যকে সহ্য করতে পারবে না বলেই আসল কথা সহজে বলতে চাইনি আমি।'

প্রফেসরের কণ্ঠস্বর আর বলার ভঙ্গি যেন চাবুক মেরে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল আমাকে। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে আছেন প্রফেসর। আসলে ওই নির্মম সত্যকে সহ্য করতে না পেরেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম আমি। একটু আগে প্রফেসরকে অমন একটা কটু কথা বলে বসেছি ভেবে লজ্জায় চোখ তুলে চাইতে পারলাম না তাঁর দিকে। মাথা নিচু করে বললাম, 'গর্দভের মত কথা বলে ফেলেছি, স্যার। দয়া করে মাপ করবেন।'

'এতে লজ্জার কিছু নেই, জন। তোমার বয়সে, তোমার অবস্থায় থাকলে

আমিও এর চেয়ে ভাল কিছু বলতাম না। তাছাড়া লুসিকে ভালবাসতে তুমি। ওর সম্পর্কে এধরনের কথা শুনলে মাথা ঠিক না থাকারই কথা তোমার। তবু, আমার মুখের কথা শুনে তোমাকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে বলব না। সাহস থাকলে চল, আজ রাতেই প্রমাণ করে দেব আমি।'

এবার সত্যিই বিপদে পড়লাম। যত সহজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা চোখের সামনে ঘটতে দেখে সহ্য করা তত সহজ নয়। ইতস্তত করতে লাগলাম বুঝতে পেরে প্রফেসর বললেন, 'তোমাকে ব্যাপারটা চাক্ষুষ না দেখিয়ে আর এক পা-ও এগোব না আমি। কারণ তোমার সাহায্য যখন আমার দরকার, তোমাকে আগে পুরোপুরি বিশ্বাস করাতে হবে। তা নাহলে বার বারই নিজের অজ্ঞাতে হলেও আমার কাজে বাধার সৃষ্টি করবে তুমি।'

'ঠিক আছে, স্যার। যা ভাল বোঝেন, করুন। তা আপাততঃ আমাদের কাজ কি?'

'প্রথমেই নর্থ হসপিটালে গিয়ে সবচেয়ে শেষের শিশুটাকে পরীক্ষা করে দেখব আমি, একা। ওর চার্জে থাকা ডাক্তার ভিনসেন্টের সাথে আগেই কথা বলে রেখেছি।'

'তারপর?'

'তারপর আরো কিছু টুকিটাকি কাজ সেরে সন্ধ্যার পর চলে যাব হ্যাম্পস্টেডের কবরখানায়। রাতটা ওখানেই কাটাব দুজনে,' বলে পকেট হাতড়ে কি যেন একটা বের করলেন প্রফেসর। 'আর এই যে দেখ, লুসিদের পারিবারিক কবরখানার চাবি। ইচ্ছে করেই আর্থারকে দিইনি আমি এটা।' চাবিটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে বললেন প্রফেসর, 'খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও তুমি। নাহলে রাত জাগতে কষ্ট হবে। আমি চললাম,' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

প্রফেসর চলে যাবার পর সটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়। খেতে বসেও লাভ নেই, সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে খাবার রুচি। বিছানায় শুয়েও বহুক্ষণ ঘুম এল না চোখে। কেবলই ঘুরে ফিরে মনে আসছে এক চিন্তা। ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

সন্ধ্যার পর পরই রাতের খাওয়াটা সেরে নিলাম আমি আর প্রফেসর। তারপর বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। কৃষ্ণপক্ষের রাত কাজেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখানে ওখানে ঘরের ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর রেখা যাও চোখে পড়ছে দু'একটা, তাতে অন্ধকার তো কাটছেই না বরং আরো যেন বাড়িয়ে তুলেছে। এলোমেলো বয়ে চলেছে হিমেল হাওয়া। দূর থেকে ভেসে আসছে টহলদারী

পুলিশের ঘোড়ার খুরের শব্দ। কর্কশ শব্দে একবার ডাকছে, একবার থামছে ঝিঁঝিগুলো। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেলেই নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে পড়েছে চারদিক। মাঝে মধ্যে ডানা ঝটপট করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দু'একটা নিশাচর পাখি।

হাঁটতে হাঁটতে সংকীর্ণ ঢালু পথ বেয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় এসে পৌঁছলাম। এলাকাটা আমার সম্পূর্ণ চেনা হলেও এখন কেমন যেন রহস্যময় লাগছে আশপাশটা। অন্ধকারে আবছামত ঠাহর হচ্ছে হ্যাম্পস্টেড গির্জার উঁচু চূড়া।

কারখানার কাছে পৌঁছে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। দু'পাশের বিশাল সব ওক আর বার্চের সারির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পাথর বাঁধান চওড়া পথ। এ পথটা থেকে আবার ডাইনে বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে বহু শাখা পথ। কুঞ্জবিতানের মত লতায় পাতায় ঢাকা এই সরু পথগুলো। এরকম একটা শাখা ধরেই লুসিদের পারিবারিক কবরখানার সামনে এসে পৌঁছুলাম আমরা। আমাকে কারখানার দরজার তালা খুলতে বলে একটা ছোট্ট মোমবাতি জ্বাললেন প্রফেসর। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে লুসির কফিনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার হাতে মোমবাতিটা দিয়ে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে কফিনের কজার স্ক্রু খুলতে শুরু করলেন প্রফেসর। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কফিন খুলছেন কেন, স্যার?'

'না হলে বিশ্বাস করাব কি করে, তোমাকে?'

কথা বলতে বলতেই স্ক্রু খুলে কফিনের ডালাটা তুলে ধরে আমাকে ভেতরে তাকাতে বললেন প্রফেসর। কফিনের ভেতর একবার উঁকি দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না আমার। এ-ও কি সম্ভব? খাঁ খাঁ করছে কফিনের ভেতরটা। লুসির মৃতদেহের চিহ্নমাত্র নেই ওতে। অথচ স্থির নিশ্চিত আমি, এটাই লুসির কফিন। উত্তেজনায় ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল সারা শরীর, ঝাঁ ঝাঁ করছে দু'কান। মনে হচ্ছে মাথার ভেতর করাত চালাচ্ছে কেউ। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে স্থির শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'সন্দেহ ঘুচেছে?'

'না। লুসির লাশটা কফিনে নেই বলেই কোন কিছু প্রমাণ হয় না।'

'কেন?'

'কেন? এমনও তো হতে পারে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে ওর লাশটা,' বলেই বুঝলাম গর্দভের মত কথা বলে ফেলেছি। এটা কোন যুক্তিই নয়। কারণ কফিন থেকে লাশ চুরি করতে যাবে কে? তাতে লাভই বা কি?

'বোকার মত কথা বলো না। ঠিক আছে, আরো দেখতে চাও? এসো, দেখাচ্ছি,' বলে কফিনের ডালাটা বন্ধ করে দিলেন প্রফেসর। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে স্ক্রু-ড্রাইভারটাসহ ব্যাগে ভরে রাখলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে আবার তালা

মেরে দিলাম দরজায়। তারপর আমাকে গির্জার এদিকটায় নজর রাখতে বলে অন্য দিকটায় এগিয়ে গেলেন তিনি। বিশাল একটা দেবদারুর আড়ালে লুকিয়ে থাকলাম আমি। প্রফেসর অদৃশ্য হয়ে গেলেন ওদিককার একটা গাছের আড়ালে। গা ছমছমে নিস্তব্ধতা চারদিকে। সেই অখণ্ড নীরবতাকে ভেঙে খান খান করে দিয়ে মাঝে মধ্যেই কর্কশ শব্দে ডেকে উঠছে ঝিঁঝিগুলো, কিছুক্ষণ একটানা ডেকেই থেমে যাচ্ছে আবার। আরো জমাট বাঁধছে নিস্তব্ধতা। আরও কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর চাঁদ উঠলো। কৃষ্ণপক্ষের আবছা কমলারঙা একফালি ভৌতিক চাঁদ। ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার হয়নি আশপাশের কোন কিছুই, বরং আরো অদ্ভুত রহস্যময় দেখাচ্ছে ঝোপঝাড়গুলোকে। হিমেল হাওয়ার ঝাপটায় মজ্জা পর্যন্ত ভেদ করতে চাইছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, এতো ঠাণ্ডায়ও ভয়ে দর দর করে ঘামছি আমি। লুসির শূন্য কফিনটার কথা মনে পড়লেই, আতঙ্কে খাড়া হয়ে যাচ্ছে গায়ের লোম। বাতাসে পাতা নড়ার সামান্যতম শব্দেও চমকে উঠছি, মনে হচ্ছে এই বুঝি ঘটলো ভয়ঙ্কর একটা কিছু। একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা করতে শুরু করেছে। গড়িয়ে চললো সময়। বারটা বাজলো, তারপর একটা, দুটো, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? ঠিক এই সময় চোখে পড়লো ওটা। দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় কবরখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আগাগোড়া সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা মূর্তি। সাদা মূর্তিটা আরও একটু এগিয়ে আসতেই দেখলাম ওটার পেছন পেছন অনুসরণ করে আসছে একটা কালো মূর্তি। হাঁটার ধরন দেখেই বুঝলাম প্রফেসর। দেবদারুর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছুটলাম সেদিকে। কয়েক পা গিয়েই একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম, কপালটা দারুণভাবে ঠুকে গেল একটা পাথরে। ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল মাথাটা। কয়েক সেকেণ্ড পর ঝিম্‌ঝিম্ ভাবটা একটু কমতেই দেখলাম ঠিক আমার সামনে এসে পড়েছে সাদা মূর্তি। কিছুই না বুঝে চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালো সাদা মূর্তিটা, পরক্ষণেই জুনিপার ঝোপের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে লুসিদের কবরখানার সামনে পৌঁছেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম জানি না, চমক ভাঙলো প্রফেসরের ডাকে, 'কি ব্যাপার, জন, পড়ে গেলে কি করে?'

'উঁ! না, এমনি, হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট লেগে পড়ে গিয়েছিলাম,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'লাগেনি তো কোথাও?'

'না,' বলেই প্রফেসরের বুকের কাছে জড়ানো ছোট্ট পুঁটলিটা নজরে পড়লো। 'ওটা কি, স্যার?'

'এটা মানব শিশু। তা সাদা মূর্তিটাকে দেখেছ তো ঠিকমত?'

'চেহারাটা দেখিনি।'

'তোমার জবাব পেয়েছ?'

'চেহারা যখন দেখিনি, লুসি কিনা কি করে বলব? কিন্তু, স্যার, ওই শিশুটাকে আপনি কোথায় পেলেন?'

'একটা দেবদারুর গোড়ায়। ডাইনীটাও ছিলো ওখানে, আমার সাড়া পেয়ে পালিয়েছে।'

'কোন ক্ষতি হয়নি তো শিশুটার?'

'না দেখে কি করে বলি? এসো আমার সাথে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন প্রফেসর, আমিও তাঁর পিছু পিছু চললাম। গির্জার কাছাকাছি পৌঁছে বসে পড়ে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন তিনি শিশুটাকে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালিয়ে ভালমত পরীক্ষা করলেন শিশুর গলার কাছটা। খুশি হয়ে বললেন, 'না, কোন দাগ নেই। ঠিক সময়ই পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি।'

'তা এখন এটাকে নিয়ে কি করবেন, স্যার?'

'সেটাই সমস্যা, এত রাতে ওকে নিয়ে কোন পুলিশ ফাঁড়িতে গেলে প্রশ্নের ঠেলায় জান বেরিয়ে যাবে। কে জানে উল্টো আমাদেরকে শিশু অপহরণের সাথে জড়িত ভেবে সন্দেহ করে হাজতেও পুরে দিতে পারে পুলিস। তাহলে আমাদের বারটা না বাজিয়ে ছাড়বে না ওরা। তারচেয়ে এক কাজ করা যাক। পথের ধারে পুলিশ বা সাধারণ লোকের নজরে পড়তে পারে এমন কোন জায়গায় শুইয়ে রাখি শিশুটাকে। ভোর হয়ে গেছে। নিরাপদেই থাকবে শিশুটা।'

'আবার যদি ডাইনী এসে তুলে নিয়ে যায় শিশুটাকে?'

'নেবে না। আর আসতেই পারবে না ও এখন। শুনছো না মোরগ ডাকছে?'

'মোরগ ডাকলে আর বেরোতে পারে না বুঝি ডাইনীরা?'

'না।'

জায়গামত পৌঁছে শিশুটাকে মাটিতে শুইয়ে রেখে অদূরেই একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম আমরা। একটু পরই টহলদারী পুলিশের ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঠিক সেই সময়ই হয়ত জেগে গিয়ে বা অন্য কোন কারণে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো শিশুটা। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। মুহূর্ত পরই আবার এগিয়ে আসতে লাগল দুটো ঘোড়া, এবার দ্বিগুণ জোরে। কয়েক সেকেণ্ড পরই দেখলাম লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। শিশুটাকে খুঁজে পেয়ে ওটাকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ দু'জন। ওরা চলে যাবার পরও আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, তারপর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে

বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

পথ চলতে চলতেই প্রফেসর বললেন, 'বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে নিতে হবে খানিকটা। আজ দুপুরে আবার হানা দেব হ্যাম্পস্টেডের কবরখানায়।'

২৭ সেপ্টেম্বর।

গত রাতের ঘটনার পর ওই অভিশপ্ত কবরখানায় যেতে আর আমার ইচ্ছে হল না, কিন্তু ছাড়লেন না প্রফেসর। নির্জন ওই সমাধি ভূমিতে পৌছতে পৌছতে মাথার ওপর উঠে এল সূর্য। আশ্চর্য, গত রাতে দেখা সেই কবরখানার সঙ্গে এর যেন কোন মিল নেই। উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে সারাটা উপত্যকা।

লুসিদের কবরখানার গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গতরাতের মতই লুসির কফিনের ডালা খুলে তুলে ধরলেন প্রফেসর। আছে। ঠিকমতই কফিনের ভেতর শুয়ে আছে লুসি। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার মধ্যে পড়লাম! রাতের বেলা ছিলো না, এখন আবার সে এলো কোত্থেকে? সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, লুসি মারা যাবার পর সাতদিন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু একটুও বিকৃত হয়নি ওর শরীর। অথচ এতদিনে পচে গলে যাবার কথা ছিল লাশটার।

আগের চেয়েও অনেক, অনেক বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে লুসিকে। আশ্চর্য রকম টুকটুকে লাল হয়ে গেছে ওর ঠোঁট দুটো, যেন কাঁচা রক্ত লেপে দেয়া হয়েছে ওখানে। অবাক কণ্ঠে নিজেই নিজেকে শুধালাম, 'এ কি স্বপ্ন, না সত্যি?'

আমার হয়ে জবাব দিলেন প্রফেসর, 'দিনের আলোর মত সত্যি।' বলে উবু হয়ে আঙুল দিয়ে লুসির ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন তিনি, 'দেখেছ, কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দাঁত দুটো? আমার কথাকে অস্বীকার করার আর কোন যুক্তি আছে তোমার?'

নেই। এত কিছু অবিশ্বাস্য কাজ কারবার দেখার পর থাকতেও পারে না। একসময় যাকে ভালবেসেছিলাম তার এমন কদর্য ডাইনী রূপ চোখের সামনে দেখতে পাব এ কি স্বপ্নেও ভেবেছি কখনো? পরস্পর বিরোধী একটা ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইল মনের মধ্যে। এ ধরনের একটা অলৌকিক ঘটনাকে কিছুতেই সত্যি বলে মেনে নিতে পারছি না, অথচ খণ্ডন করার মত যুক্তিই বা কোথায়? তবু মিনমিন করে বললাম, 'যে চুরি করেছিল, ভোর রাতে হয়তো আবার লুসির লাশটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে সে-ই।'

'ঠিক। কিন্তু কে চুরি করেছিল লাশটা?'

'তা তো জানি না।'

হো হো করে হেসে উঠলেন প্রফেসর, 'ওরকম কথা যদি তোমার হাসপাতালের কারও কাছে কখনও বল, হয় ঘাড় ধরে হাসাতাল থেকে বের করে

দেবে তোমাকে, নাহয় তোমার রোগীদের সাথেই জায়গা করে দেবে। এখন আবোলতাবোল চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কথা শোন। একটা জিনিস বল তো, কখনও কোন মানুষের ওই দুটো দাঁত অমন তীক্ষ্ণ আর লম্বা হয়ে উঠতে দেখেছ? তাও আবার মৃত্যুর পর? মেডিকেল সায়েন্সে আছে এ কথার উল্লেখ? আর মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন ধরে মানুষের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, বেড়ে যায় রূপ-লাবণ্য এটা কোন কেতাবে লেখা আছে?'

জবাব দিতে পারলাম না। নেই তো, দেবো কি করে? কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আমাকে কিছুটা ধাতস্থ হবার সময় দিলেন প্রফেসর। তারপর আবার বলতে থাকলেন, 'আজ তোমাকে সব খুলে বলছি, জন। এক দ্বৈত জীবনযাপন করছে এখন লুসি। আমাদের সমাজে থাকাকালীন এক ভয়ঙ্কর জঘন্য পিশাচ ওর রক্ত পান করতে আসত। ওকে সম্মোহিত করে নিজের পৈশাচিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করত শয়তানটা। শেষ পর্যন্ত সম্মোহিত অবস্থায়ই মৃত্যু ঘটে লুসির। এতে ওর ওপর পিশাচটার প্রভাব পুরোপুরিই থেকে যায়। তাই ও আজ আমাদের কাছ থেকে মরে গিয়েও অ-মৃতা থেকে গেছে। একটা কথা হয়ত জানো না তুমি, সম্মোহিত অবস্থায় মারা গেলে লাশের শরীরে সুপ্ত থেকে যায় আত্মা। আর পিশাচটার প্রভাব লুসির ওপর থেকে যাওয়ায় ওটার মতই রক্তচোষা হয়ে গেছে সে-ও। এখন আমাদের হাতে একটাই মাত্র পথ খোলা আছে, সত্যিকার মৃত্যুর জগতে পাঠিয়ে দিতে হবে লুসিকে।'

বুঝতে পারছি এধরনের কথাবার্তা আর বেশিদিন শুনতে থাকলে আমার পরিচালিত পাগলা গারদেরই রোগী হতে হবে আমাকে। মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সবকিছু, তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা মরা মানুষকে দ্বিতীয় বার মারবেন কি করে আপনি, স্যার?'

'সহজেই। এসব ক্ষেত্রে প্রথমে লাশের মাথা কেটে ফেলতে হয়। তারপর মুখের ভেতর বুনো রসুনের কোয়া পুরে দিয়ে হৃদপিণ্ড বরাবর ঢুকিয়ে দিতে হয় কাঠের ছুঁচাল কীলক।'

লুসির অপূর্ব সুন্দর দেহটা ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে, কল্পনার চোখে দেখতে পেয়ে শিউরে উঠলাম। কিন্তু আশ্চর্য, মনে যতটা ব্যথা পাওয়া উচিত ছিল ততটা পেলাম না। পেলাম না এই কারণে যে, মানুষ লুসিকে ভালবাসতাম আমি, ডাইনী লুসিকে নয়। আসলে প্রফেসরের কথা একটু একটু করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আমি।

ভেবেছিলাম আজই কাজ শুরু করে দেবেন প্রফেসর, কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে কফিনের ডালাটা বন্ধ করে ফেললেন প্রফেসর। তারপর আমার হাত ধরে টানলেন, 'এসো। বাড়ি ফিরে যাই।'

থমথমে গম্ভীর মুখে পাহাড়ী উপত্যকার ঢাল বেয়ে নামছেন প্রফেসর, পেছনে পেছনে নামছি আমি। দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন প্রফেসর। আর থাকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, 'কিছু ভাবছেন, স্যার?'

'অ্যাঁ, হ্যাঁ। ভাবছি বৈকি, জন। ভাবছি যত শীঘ্র সম্ভব এই পৈশাচিক জীবন থেকে মুক্তি দিতে হবে লুসিকে। তবে তার আগে আর্থারকে জানান দরকার। কিন্তু বুঝতে পারছি না কেমন করে বোঝাব তাকে। নিজের চোখে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখেছ তুমি। মৃত্যুর আগে লুসির গলার ক্ষতচিহ্ন, আর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া দু'একটা আহত শিশুর গলার দাগের সামঞ্জস্য নিজের চোখে দেখেছ তুমি। লুসির কফিন রাতে খালি আর দিনে ভরা দেখেছ। হ্যাম্পস্টেডের কবরখানায় এক দেবদারুর গোড়ায় একটা শিশুকে কুড়িয়ে পাবার সাক্ষী তুমি। গভীর রাতে জুনিপার ঝোপের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সাদা মূর্তিটাও মিথ্যে দেখনি। অথচ এতকিছু দেখার পরও তোমাকে বোঝাতে যা বেগ পেতে হয়েছে, তাতে ভয় হয় আদৌ বোঝাতে পারবো কিনা আর্থারকে।' একটু থেমে দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি, 'মৃত্যুর আগে লুসির ঠোঁটে চুমো খেতে দিইনি আর্থারকে, তাতেই মনঃক্ষুণ্ণ না হবার ভান করলেও সে যে তা হয়েছিল এটা নিশ্চিত। এখন না আবার ভুল করে বলে বসে লুসিকে জীবন্ত কবর দিয়েছি আমরা। কারণ লুসির মৃত্যুর রায় দিয়েছি আমরা দুই ডাক্তার। এতে আরেকটা সম্ভাবনা তার মাথায় জাগতে পারে, জীবিতাবস্থায় লুসিকে কবর দেবার পর কফিনের ভেতর আমরা খুন করেছি তাকে। আর এ ধারণায় যদি একবার পেয়ে বসে আর্থারকে তাহলে তার পরিণতি একবার চিন্তা করে দেখ তো। অতএব ভেবেচিন্তে অতি সাবধানে এগোতে হবে আমাকে। পরিষ্কারভাবে আর্থারকে বোঝাতে হবে, দেখাতে হবে সবকিছু। আর তারপর, শুধুমাত্র তারপরই লুসিকে ওই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব।'

কথা বলতে বলতেই বাড়ি পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে বিদায় নেবেন প্রফেসর। কিছু টুকিটাকি কাজ সারতে শহরে যেতে হবে তাঁকে। যাবার আগে বার বার আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলে গেলেন, 'একটু সাবধানে থেকো, জন। একসময় ভালবাসতে তুমি লুসিকে, সুতরাং এখন তোমার ওপর ওর নজর পড়াও বিচিত্র কিছু নয়। আর কাল রাত দশটায় আমার সাথে বার্কলে হোটেলে দেখা কর। আর্থার আর মরিসকে আসার জন্যেও টেলিগ্রাম করে দেবো আজই। মরিসকে দরকার আছে আমার। এ ধরনের ভয়ঙ্কর কাজে ওর মত শক্তিমান, দুর্ধর্ষ, সাহসী পুরুষের দরকার আছে আমাদের। ওরা এসে পৌঁছুলে সবাই মিলে ঠিক করব আমাদের পরবর্তী কাজ কি,' বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আট

২৯ সেপ্টেম্বর, ভোর।

সাড়ে ন'টা নাগাদ বার্কলে গিয়ে হোটেলে পৌছেছিলাম গত রাতে। দশটার একটু আগে এসে পৌছুল আর্থার আর মরিস। ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসাতে বসাতে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর, 'তাহলে ঠিকমতই আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলে তোমরা?'

'হ্যাঁ। এবং পেয়েই ছুটে চলে এসেছি। ভাবলাম, আবার কি ঘটল কে জানে।'

'ঘটেনি, তবে ঘটবে। আর এজন্যেই ডেকে এনেছি তোমাদের।'

'ঘটবে? কি ঘটবে, প্রফেসর?' জিজ্ঞেস করল মরিস।

'ঘটবে ঠিক না, তবে ঘটাব?' একটু গুছিয়ে বসলেন প্রফেসর। তারপর আবার বললেন, 'আর সেজন্যে তোমাদের সবার অনুমতি প্রয়োজন। হয়ত আমার প্রস্তাব শোনা মাত্র তোমরা বিরক্ত, এমনকি রেগেও যেতে পার। কিন্তু তার আগে আমার প্রস্তাবটা অন্তত বিবেচনা করে দেখবে।'

'কি করতে হবে কিছুই জানা নেই আমার, প্রফেসর,' বলতে বলতে হাতটা বাড়িয়ে দিল মরিস। 'জানার প্রয়োজনও বোধ করছি না। কারণ কাজটা করতে যাচ্ছেন আপনি। এবং আমি জানি, আর যাই করুন, অন্যায় কিছু করবেন না আপনি। অতএব আমি আপনার দলে।'

'আর আমার আত্মমর্যাদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস ক্ষুণ্ন না হলে জীবন দিয়ে হলেও আপনার কাজে সাহায্য করব আমি, প্রফেসর,' বলল আর্থার।

'ভেরি গুড। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর্থার, তোমার আত্মমর্যাদা বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কিছুমাত্র অবমাননা হবে না।'

'তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে বলে ফেলুন,' সমস্বরে বলল আর্থার আর মরিস।

'তোমাদের সবাইকে হ্যাম্পস্টেডের কবরখানায় যেতে হবে আমার সাথে। এবং আজ রাতে।'

দপ্ করে মুখের হাসি নিভে গেল আর্থারের। 'অর্থাৎ, লুসির কবরে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'লুসির কফিনের ডালাটা খুলব আমি। তোমাদের সবার সামনে।'

'কিন্তু কেন, প্রফেসর, কেন? আপনার কি এমন উদ্দেশ্য পূরণ হবে তাতে?'

'হবে। কিন্তু আগেভাগে সেকথা বলতে চাই না তোমাদের। বললেও বিশ্বাস করবে না,' ভরাট গম্ভীর গলায় বললেন প্রফেসর। 'যদি আজ রাতের মধ্যে তোমাদেরকে বোঝাতে না পারি, তাহলে আর কোনদিন বোঝাতে পারব কিনা সন্দেহ।'

'অর্থাৎ? আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, প্রফেসর?'

'এক কথায় তা বলে বোঝান অসম্ভব, আর্থার। তবু যখন জানতেই চাইছ, বলছি,' একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন প্রফেসর। তারপর ধীর শান্ত গলায় বললেন, 'তোমরা সবাই জান, মারা গেছে লুসি, তাই না? কিন্তু আমি যদি বলি মরেনি ও...'

প্রফেসরের কথার মাঝেই চেঁচিয়ে উঠলো আর্থার, 'কি সব আবোলতাবোল বকছেন, প্রফেসর? আপনি বলতে চান জীবন্ত অবস্থায়ই লুসিকে কবর...'

'না, তা বলতে চাই না। এবং লুসি জীবন্ত একথাও বলিনি কখনো। তবে ও জীবন-মৃতা হতে বাধা কোথায়?'

'জীবন-মৃতা! এ-ও কি সম্ভব?'

'এ পৃথিবীতে কি যে সম্ভব আর কি অসম্ভব, সঠিকভাবে কেউই বলতে পারে না, আর্থার। এমন অনেক রহস্য আছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করেও তার বিন্দুমাত্র উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি মানুষ। আর তেমনি একটা রহস্যের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। এবং এর হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় মাথা কেটে ফেলতে হবে লুসির।'

'প্র-ফে-স-র!' প্রায় ককিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো আর্থার। 'এ আপনি কি বলছেন? কেন করতে যাচ্ছেন কাজটা? আর আমার চোখের সামনে আমার প্রেমিকার লাশটা ছিন্ন ভিন্ন করবেন, আর আমি তাতে সায় দেব ভাবলেন কি করে? হয় আমি ভুল শুনেছি, না হয় পাগল হয়ে গেছেন আপনি।'

হাত ধরে আর্থারকে আবার চেয়ারে বসিয়ে বলল মরিস, 'না, আর্থার, প্রফেসর পাগল হয়ে যাননি। আমি জানি, সময় বিশেষে এ ধরনের নিষ্ঠুর কাজ করতে হয় মানুষকে এবং তা করতে হয় সমাজের আরো দশজন মানুষের কল্যাণার্থে। জীবনে বহু দেশ ঘুরেছি আমি, দেখেছিও অনেক। সেজন্যেই প্রফেসরের কথায় বিন্দুমাত্র অবাক হচ্ছি না আমি। আপনি বলে যান, প্রফেসর, আমরা শুনছি।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, মরিস,' একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন প্রফেসর, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তাঁর কণ্ঠে। 'আর্থার অন্যের প্রতি, তোমার প্রতি, মৃতের প্রতি মানুষ

হিসেবে আমারও একটা পবিত্র কর্তব্য আছে এবং যত বাধাই আসুক, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি তা পালন করবই। কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে যথাসম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করব আমি। শেষ পর্যন্তও যদি তোমাদেরকে পথে আনতে না পারি, আমার কাজ আমি করবই। তবে আমার মনে হয় সব নিজের চোখে দেখলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। আমার একান্ত অনুরোধ, আগে থেকে না বুঝেশুনে ঝট্ করে কিছু করে বসো না। তার ফল আদৌ শুভ হবে না। এই বৃদ্ধ বয়সেও কেন ওই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াচ্ছি আমি বলতে পার? বাড়াচ্ছি নিষ্ঠুর পৈশাচিক পরিণতির হাত থেকে তোমাদের বাঁচাতে। আজ যদি আমি সরে দাঁড়াই এই পৈশাচিকতার হাত থেকে কেউ পরিত্রাণ পাবে না তোমরা; তুমি, জন, মরিস কেউ না, কারণ তোমরা তিনজনই লুসির বন্ধু। এবং তোমাদের পরও এই পরিণতির শিকার হবে হ্যাম্পস্টেড এবং তার আশেপাশের এলাকার অসংখ্য যুবক যুবতী। তুমি কি তাই চাও আর্থার? তোমাদেরকে ভাল না বাসলে কখনও ওই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াতে যেতাম না আমি। লুসি অসুস্থ, জনের কাছ থেকে এ খবর পেয়ে পাগলের মত ছুটেও আসতাম না, নিজের দেহের রক্ত দিয়ে লুসিকে বাঁচানোর চেষ্টাও করতাম না। জীবন-মৃতা লুসির গলা কাটতে কি আমার হাত বিন্দুমাত্র কাঁপবে না বলতে চাও? কাঁপবে। হয়ত তোমাদের চেয়ে একটু বেশিই কাঁপবে। কারণ ও আমার মেয়ের মত। তবু কেন করতে যাচ্ছি কাজটা? করতে যাচ্ছি এক অভিশপ্ত পৈশাচিক জীবন থেকে ওর আত্মাকে মুক্তি দিতে। ওকে স্বাভাবিক মৃত্যুর দেশে পাঠাতে। তাতে শান্তি পাবে লুসির আত্মা। শান্তি পাব আমরা সবাই।'

প্রফেসরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে তাঁর হাত দুটো চেপে ধরল আর্থার, বলল, 'না বুঝে আপনাকে ব্যথা দিয়েছি। প্রফেসর, আমাকে মাফ করুন।'

উত্তরে শুধু হাসলেন প্রফেসর, সে-হাসিতে উপচে পড়ল স্নেহ আর ভালবাসা।

হ্যাম্পস্টেডের কবরখানায় এসে পৌছুলাম রাত বারটায়। কখনো ঘন কালো মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে ধূসর আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে চাঁদ, কখনো গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। এদিকে ওদিকে টিপটিপ করে জ্বলছে জোনাকির দীপ। একটানা কর্কশ শব্দে ডেকে চলেছে ঝিঁঝিগুলো। কবরখানার গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন প্রফেসর; পেছন পেছন আমরা তিনজন। লুসির কফিনের কাছে বসে মোমবাতি জ্বাললেন প্রফেসর। তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'গতকাল যখন আমার সাথে এখানে এসেছিলে তুমি, লুসির লাশটা ছিলো কফিনে?'

'ছিল।'

আর্থার আর মরিসকে উদ্দেশ্য করে বললেন প্রফেসর, 'শুনলে তো তোমরা? এখন দেখ...'

বলেই কফিনের ডালাটা তুলে ধরলেন প্রফেসর। খালি কফিন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল আর্থার আর মরিস। কয়েক সেকেণ্ড পর নীরবতা ভাঙল আর্থার, 'কাজটা কে করল প্রফেসর, আপনি?'

আমি করিনি। আজ থেকে দু'দিন আগেও রাতের বেলা এখানে এসেছিলাম আমি আর জন। সেদিনও কফিন খুলে দেখেছিলাম লুসি নেই। অবশ্য কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসেছিল সে।'

'ফিরে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। কি, ঠিক বলিনি, জন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন কফিন খালি। কেন খালি, কোথায় গেল লুসি সব আজ তোমরা চাক্ষুষ দেখতে পাবে। কোন সন্দেহই আজ তোমাদের মনে রাখব না আমি। চল, বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি।'

কফিনের ডালাটা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে দিলো প্রফেসর। তারপর সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামাধিকক্ষের রুদ্ধ বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসছিল এতক্ষণ, এখন বাইরে বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মেঘের ফাঁক থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। কৃষ্ণপক্ষের ঘোলাটে চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভৌতিক লাগছে চারপাশের সবকিছু। অস্বাভাবিক নিঝুম মনে হচ্ছে আশপাশটা। কেন? এতটা নীরব মনে হয়নি তো একটু আগেও? হঠাৎ বুঝলাম কারণটা। চুপ করে গেছে ঝিঁঝি পোকাগুলো।

একটা সিগারেটের জন্য আনচান করে উঠল বুকটা। কিন্তু প্রফেসরের সামনে ধরাই কি করে? বাইরে বেরিয়েই ব্যাগ হাতড়ে বিস্কুটের মত কি যেন একটা বের করলেন প্রফেসর। একটা সাদা রুমালে জড়িয়ে চাপ দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করলেন তিনি জিনিসটাকে, তারপর ময়দার তালের মত কিসের সাথে সেই গুঁড়ো মিশিয়ে দু'হাতের চেটো দিয়ে ঘষে ঘষে সরু সরু ফালি বানিয়ে, সমাধিকক্ষের বন্ধ কপাটের ফাঁকে ঠেসে ঠেসে গুঁজে দিলেন ওগুলো। অবাক লাগল ব্যাপারটা। কৌতূহলী হয়ে উঠল আর্থার আর মরিসও। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, 'ওটা কি করলেন, স্যার?'

'জীবন-মৃতা ডাইনীটার ভেতরে ঢোকার পথ রুদ্ধ করে দিলাম।'

'ওই সামান্য ময়দার লেচি আটকে রাখতে পারবে ডাইনীটাকে?' মরিসের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'অবশ্যই,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলেন প্রফেসর।

'ময়দার তালের সাথে ওটা কি মেশালেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ধুনো।' ছোট্ট এক কথায় জবাব দিয়ে মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে ফেলে আমাদেরকে ওখান থেকে সরে যেতে বললেন প্রফেসর। তাড়াতাড়ি তিনটা সমাধিস্তম্ভের আড়ালে গিয়ে লুকালাম আমি, আর্থার আর মরিস। প্রফেসরও গিয়ে লুকালেন একটার আড়ালে। অপেক্ষাকৃত হালকা মেঘের আড়ালে গিয়ে ঢুকেছে এখন চাঁদ। তাই নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে যেতে পারেনি পৃথিবী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছুই। প্রত্যেকটা জিনিসের হালকা একটা অবয়ব চোখে পড়ছে কেবল। পূর্ব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে কি এক অজানা আতঙ্কে শিরশির করে উঠল শরীরটা।

মাটির সমান্তরালে উবু হয়ে থেকেও দেখলাম ধোঁয়াটে অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় সারি সারি কবরগুলো আশ্চর্য রকম সাদা দেখাচ্ছে, আর ঠিক তেমনি আশ্চর্য রকমের কালো দেখাচ্ছে সাইপ্রেস, জুনিপার, ইউক্যালিপটাস গাছগুলোকে। মাঝে মধ্যে লোকালয় থেকে ভেসে আসছে দু'একটা রাত জাগা কুকুরের ডাক। ওই দূরাগত ডাক আর আশপাশের গাছের শুকনো পাতার হালকা মর্মর ধ্বনি মিশে এত ভয়াবহ শব্দের সৃষ্টি করতে পারে, না শুনলে ভাবতে পারবে না কেউ। এই বিশাল কবরখানায় নিথর নিঝুম হয়ে আছে পৃথিবী, স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন সময়ের গতি। ঠিক এই সময় কাছেই একটা কবরের পাশে লুকিয়ে থাকা প্রফেসরের চাপা অস্ফুট ডাকে চমকে উঠলাম। তেমনি চাপা গলায় দিক নির্দেশ করে আমাদেরকে তাকাতে বললেন প্রফেসর।

প্রফেসরের নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দূর থেকে ইউক্যালিপটাস-এর ছায়া মাড়িয়ে ধীরে ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে একটা সাদা ছায়ামূর্তি। চলতে চলতেই হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ালো মূর্তিটা। ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। ঘোলাটে চাঁদের আলোয় দেখলাম ধবধবে সাদা লাশ ঢাকার পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। বুকের কাছে ধরা কি একটা জিনিসের ওপর ঝুঁকে থাকায় তরুণীর মুখটা ভালমত দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ শব্দ করে ককিয়ে কেঁদে উঠল তরুণীর বুকের কাছে ধরা প্রাণীটা। মানব শিশুর উচ্চকিত কান্না। শিশুটা কেঁদে উঠতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে আসতে শুরু করল তরুণী। পরিষ্কার চিনতে পারলাম এবার লুসিকে। আমাদের তিন নায়কের গভীর ভালবাসার পাত্রী মিস্ লুসি ওয়েস্টেনরা। এই মুহূর্তে আশ্চর্য রকম বদলে গেছে লুসি। তার চেহারায় সমস্ত কোমলতা আর মাধুর্য মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠেছে এক ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা।

চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম সমাধিস্তম্ভের আড়াল থেকে অতি ধীরে বেরিয়ে আসছেন প্রফেসর। ফিসফিস করে আমাদেরকেও আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন তিনি। ততক্ষণে আরও এগিয়ে এসেছে লুসি। ওর ঠোঁটের কষা বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে কালচে মত কি যেন। সে-গাঢ় তরল পদার্থ ফোঁটায় ফোঁটায় ওর সাদা পোশাকে ঝরে পড়ে কালো করে দিয়েছে বুকের কাছটায়। কেউ বলে না দিলেও বুঝতে পারলাম ঝরে পড়া তরল পদার্থটা রক্ত, মানুষের রক্ত। চাঁদের আলোয় রক্তের স্বাভাবিক রঙ বদলে গিয়ে কালো দেখাচ্ছে। প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাথরের মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে আর্থার। টলছে ও। হাত বাড়িয়ে আমি ওকে ধরে না ফেললে পড়েই যেত হয়ত।

অত্যধিক নড়াচড়া করাতেই বোধহয় আমাদেরকে দেখতে পেয়ে তীব্র আক্রোশে ফুঁসে উঠল লুসি। সরাসরি চাইল সে আমার চোখের দিকে। চমকে উঠলাম। কোথায় ওর সেই গভীর নীল চোখ? তার বদলে সেখানে জ্বলজ্বল করছে যেন দুটো জ্বলন্ত অঙ্গার। গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে গেল আমার বুকের ভেতরটা। লুসির জন্যে সামান্য ভালবাসা যা তখনও আমার মধ্যে অবিশিষ্ট ছিল ওই ভয়ঙ্কর চোখ দুটো দেখার পর তা একেবারে শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে শিশুটার ঠ্যাং ধরে তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল লুসি। নরম ঘাসের ওপর আছড়ে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে চেঁচিয়ে উঠল শিশুটা। কচি গলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠল নৈশ বাতাস। সেদিকে বিন্দুমাত্র কান না দিয়ে আর্থারের দিকে কামার্ত দৃষ্টি হেনে মদালসা ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে থাকল লুসি। আর্থারের কাছ থেকে মাত্র দু'গজ দূরে দাঁড়িয়ে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে আহ্বান করল সে, 'তুমি ওদের সাথে কেন, প্রিয়তম? এসো, আমার কাছে এসো। কতদিন থেকে তোমার বাহুপাশে ধরা দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছি আমি।' জলতরঙ্গের মত সুরেলা আওয়াজের মত বেজে উঠল যেন লুসির কণ্ঠস্বর। ঝড় তুলল শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে। সে মায়াবী আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না কিছুতেই। মন্ত্রমুগ্ধের মত সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল আর্থার। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন প্রফেসর। লুসি আর আর্থারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা ছোট্ট সোনার ক্রুশ তুলে ধরলেন লুসির দিকে। যেন জীবন্ত বৈদ্যুতিক তারে পা দিয়েছে এমন ভাবে আর্তনাদ করে পেছনে ছিটকে পড়ল লুসি। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেদের কবরখানার দিকে ছুটল। কিন্তু কবরখানার গেটের সামনে গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল, ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। গেটের ফাঁক ছিল যেখানে, সেখানে ধুনো মেশান ময়দার ফালি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন প্রফেসর, সেখানে

বার কয়েক উঁকি ঝুঁকি মেরে ঢোকার পথ না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল লুসি। ক্রুদ্ধ সংহার মূর্তি এখন ওর। কোন রূপসী তরুণীর মুখ এতটা বীভৎস হতে পারে কল্পনাও করবে না কেউ। কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে জ্বলজ্বলে লাল দুটো চোখ, আধ-খোলা ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে সাদা দাঁত, চুলগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে, মুখে, বুকে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মেডুসার মত লাগছে এখন ওকে। আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠলাম আমি। তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম সেদিক থেকে। ঠিক এই মুহূর্তে ওই হিংস্র ডাইনীটাকে হত্যা করতে পারলে বোধহয় অনেকটা স্বস্তি পেতাম।

সমাধিকক্ষের বদ্ধ দরজা আর মাথার ওপর ক্রুশ তুলে ধরা প্রফেসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে থাকল লুসি। কিন্তু এগোতে পারল না কিছুতেই। প্রফেসরের হাতের ওই পবিত্র ক্রুশের কাছে সে সম্পূর্ণ অসহায়, প্রায় আধ মিনিট চুপচাপ ওই অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে থাকলেন প্রফেসর, তারপর বললেন, 'আর্থার, আর কোন সন্দেহ নেই তো তোমার? আমার কাজে এরপর আর বাধা দেবে না তুমি?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়ল আর্থার।

'মেয়েমানুষের মত কাঁদলে তো চলবে না, আর্থার। কিছু একটা বল। আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না শুধু শুধু।'

'আপনার যা খুশি করুন, প্রফেসর। আমাকে আর কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবেন না। শুধু ওই ডাইনীটাকে চলে যেতে বলুন আমার সামনে থেকে। আমি আর সইতে পারছি না ওকে।' অবস্থা দেখে মনে হল যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে পারে আর্থার। এগিয়ে গিয়ে দু'পাশ থেকে ওকে চেপে ধরে রাখলাম আমি আর মরিস। আশ্চর্য! আমাদের তিনজনের মাঝে কোন ভাবান্তর নেই একমাত্র মরিসের। বরং এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে যেন মজা পাচ্ছে ও। ওর দুর্ধর্ষতা আর সাহসিকতার কথা কেবল শুনে এসেছিলাম এতদিন, আজ স্বচক্ষে দেখলাম।

ক্রুশটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখে মোমবাতি জ্বাললেন প্রফেসর। তারপর এগিয়ে গিয়ে দু'আঙুলে চিমটি দিয়ে দিয়ে গেটের ফাঁক ফোকরে লাগান ধুনো মেশান ময়দার ফালিগুলো তুলে ফেলতে লাগলেন। সবগুলো ফালি তোলা হয়ে গেলে গেটের কাছ থেকে সরে এলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই গেটের দিকে ছুটে গেল ডাইনীটা। চোখের সামনে আবছা হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেল ওর অবয়ব। এক মুহূর্ত আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল লুসি, সেখানে দেখা গেল এখন রূপোর মত চিকচিকে একটা ধুলোর ঘূর্ণি। ঘুরতে ঘুরতেই গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘূর্ণিটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা।

লুসি সমাধিকক্ষের ভেতর ঢুকে যেতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন প্রফেসর, 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চলো তো দেখি, শিশুটার কি অবস্থা।'

এগিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর থেকে বাচ্চাটাকে তুলে নিলেন প্রফেসর। মোমের আলোয় বাচ্চাটার গলার সূক্ষ্ম ক্ষত দুটো পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি, নাড়ীও দেখলেন। তারপর বললেন, 'বাঁচবে বলেই মনে হয়।'

আগের কায়দায়ই বাচ্চাটাকে টহলদারী পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। চলতে চলতেই বললেন প্রফেসর, 'বুঝলে আর্থার, আজ যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে, ভবিষ্যতে কখনও যদি পেছন ফিরে তাকাও তাহলে বুঝতে পারবে কত প্রয়োজন ছিল এ অভিজ্ঞতার।'

বাড়িতে পৌঁছে আমাদের সবাইকে নির্দেশ দিলেন প্রফেসর, 'এখন একটু ঘুমিয়ে নাও সবাই। দুপুর বারটার পর আবার কাজে নামতে হবে সবাইকে।'

২৯ সেপ্টেম্বর, রাত।

ঢং ঢং করে গির্জার পেটা ঘড়িতে বেলা বারটা বাজতেই আবার হ্যাম্পস্টেডের কবরখানার দিকে রওনা দিলাম আমরা। ইচ্ছে করেই সবাই শোক প্রকাশের কালো পোশাক পরেছি। তাতে দল বেঁধে কবরে ঢুকতে দেখলেও কিছু টের পাবে না লোকে। দেড়টা নাগাদ উপত্যকাটায় এসে পৌঁছুলাম আমরা। কবরখানার দারোয়ানের চোখকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্টভাবে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে একসময় টুক করে রেলিং টপকে ঢুকে পড়লাম কবরখানার ভেতর।

ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে হেঁটে এসে পৌঁছুলাম লুসিদের কবরখানায়। পকেট থেকে চাবি বের করে গেটের তালা খুললেন প্রফেসর। একে একে সমাধিকক্ষের ভেতর ঢুকলাম আমরা সবাই। হাতে করে আজ একটা নতুন ব্যাগ নিয়ে এসেছেন প্রফেসর। বেশ বড়সড় ব্যাগটা, বোধহয় অনেক জিনিসপত্র আজ নিয়ে এসেছেন তিনি ওতে করে। ব্যাগ থেকে তিনটা বড় বড় মোমবাতি বের করে জ্বালিয়ে দুটো বসিয়ে দিলেন দুটো কফিনের ওপর, তৃতীয়টা আমার হাতে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে লুসির কফিনের ডালাটা তুলে ধরলেন প্রফেসর। প্রায় একসাথে কফিনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালাম আমি, আর্থার আর মরিস। সাথে সাথেই বাতাসে দোলানো বেতস লতার মত থর থর করে কেঁপে উঠল আর্থার। বুক ভেঙে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। মাত্র দিন দুয়েক আগে দেখে গেছি আমি লুসিকে। এই দু'দিনেই সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ওর। কিন্তু আজ আর ওর জন্যে বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই আমার বুকে। গতরাতের কথা মনে পড়তেই আবার বিষিয়ে উঠল মনটা। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, সামলে নিয়েছে আর্থার। ক্রমশঃ রুক্ষ কঠিন

হয়ে উঠছে ওর মুখ চোখ। কুঁচকে ছোট হয়ে আসছে ভ্রূ দুটো। কঠিন গলায় প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করল সে, 'প্রফেসর, একি আমার প্রেমিকা, লুসি, না গত-রাতের ডাইনী লুসি?'

'দু'টোই। দিনেরবেলা ও তোমার প্রেমিকা, রাতে হয়ে ওঠে নরকের ঘৃণ্য কীট।'

কফিনের ভেতর শায়িত লুসিকে ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছে এখন আমার কাছে। ওর রূপ লাবণ্য আর বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারছে না আমার মনকে। কেবলই ভেসে উঠছে মনের পর্দায়, ওর ঝকঝকে তীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত, রক্তমাখা কামার্ত মুখ, আর অসংখ্য বিষাক্ত নাগিনীর মত জট পাকান কালো চুল।

ওদিকে ব্যাগ খুলে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র সাজিয়ে ফেলেছেন প্রফেসর। তার মধ্যে আছে ছোট একটা মাটির প্রদীপ, মাথা মোটা কয়েকটা পেরেক, একটা লোহার হাতুড়ি, একটা মাংস কাটার বড় ধারাল ছুরি আর ফুট তিনেক লম্বা একটা একমুখ চোখা কাঠের গজাল।

জিনিসগুলো একে একে মাটিতে সাজিয়ে রেখে প্রদীপটা ধরিয়ে নিলেন প্রফেসর। ওতে কিসের তেল ব্যবহার করেছেন প্রফেসর বলতে পারব না, কিন্তু স্নিগ্ধ নীলাভ একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল সমাধিকক্ষের ভেতর। রীতিমত অবাক হলেও অসীম ধৈর্যের সাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল আর্থার আর মরিস। প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে মুখ তুলে তাকালেন প্রফেসর। বললেন, 'কাজ শুরু করার আগে দু'একটা কথা বলে নিতে চাই তোমাদের। জীবন-মৃত আত্মাদের নিয়ে দীর্ঘদিন যারা চর্চা করেছেন, সেইসব প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসরণ করেই একাজে হাত দিয়েছি আমি। কারও আত্মা জীবন-মৃততে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তার অমরত্ব পাবার এক তীব্র লালসা। সম্পূর্ণ ভাবে কেউই মরে না এরা, অমরত্বও পায় না, অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী মৃতদের সংখ্যা কেবল বাড়িয়েই চলে। কোন সুস্থ মানুষ এরকম জীবন-মৃতদের হাতে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও হয়ে ওঠে জীবন-মৃত, শিকারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে নতুন জীবন-মৃত আত্মাও। এমনি ভাবেই সে আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেবল বেড়েই চলেছে জীবন-মৃতদের সংখ্যা। আর্থার, লুসির মৃত্যু শয্যায় তুমি লুসিকে চুমু খেতে যাচ্ছিলে না, যদি তা করতে তাহলে তোমার বিরুদ্ধেও আজ আমাদের এমনি করেই দল পাকাতে হতো। আজ যদি লুসিকে আমরা হত্যা না করি, আজ হোক, কাল হোক বা ক'দিন পরে হোক তোমাদের জীবন-মৃততে পরিণত করে ছাড়বেই সে। এ থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই তোমাদের। কারণ লুসি জানে তোমরা তিনজনই ওকে ভালবাস। তাই

বলছিলাম…'

প্রফেসরের কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠলো আর্থার, 'আর আমাদেরকে বোঝানোর দরকার নেই, প্রফেসর। কাল রাতেই সব বুঝে গেছি আমরা। এখন শুধু কি করতে হবে তাই বলুন।'

'ভেরি গুড,' খুশি হয়ে আর্থারের কাঁধ চেপে ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিলেন প্রফেসর। 'একটা অত্যন্ত কঠিন কাজ করতে হবে তোমাকে, আর্থার। আমি লুসির মাথা কেটে মুখে রসুনের কোয়া পুরে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের নাম নিয়ে এই কাঠের গজালটা সম্পূর্ণ বিঁধিয়ে দিতে হবে লুসির হৃৎপিণ্ডে। পারবে?'

'পারব,' আশ্চর্য শান্ত আর্থারের গলা। যেন লোহার শিক দিয়ে গেঁথে একটা ট্রাউট মাছ মারতে যাচ্ছে সে।

'হ্যাঁ তুমি পারবে, আর্থার,' বলে গজালটা এগিয়ে দিলেন প্রফেসর, নাও, ধরো। গজালের চোখা অংশটা ঠিক লুসির হৃৎপিণ্ড বরাবর ধরে আমি বলার সাথে সাথে এই হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানবে গজালের ভোঁতা অংশে। খবরদার, এক আঘাতেই যেন গজালটা লুসির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে। আর মনে রেখো তোমার প্রেমিকাকে খুন করতে যাচ্ছ না তুমি, ওকে পাঠাতে যাচ্ছ স্বাভাবিক মৃত্যুর দেশে।'

দৃঢ় হাতে গজাল আর হাতুড়িটা তুলে নিল আর্থার। বিন্দুমাত্র কাঁপছে না এখন ওর হাত। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

ডান হাতে মাংস কাটার ছুরিটা তুলে নিয়ে শান্ত পায়ে কফিনের কাছে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। বাঁ হাতে ওর কতগুলো রসুনের কোয়া। কফিনের ডালাটা তুলে শক্ত করে ধরে রাখল মরিস। মাটি থেকে প্রদীপটা তুলে নিয়ে লুসির মাথার দিকটায় দাঁড়ালাম আমি। গম্ভীর গলায় জোরে জোরে বাইবেলের স্তোত্রপাঠ শুরু করলেন প্রফেসর। তাঁর সাথে গলা মেলালাম আমরা তিনজন। স্তোত্রপাঠ করতে করতেই বাঁ হাতের রসুনের কোয়াগুলো ঘুমন্ত রোগীর মুখে ট্যাবলেট গুঁজে দেয়ার মত করে গুঁজে দিলেন প্রফেসর লাশের মুখে, পরমুহূর্তে মাংস কাটা ছুরিটা দিয়ে গায়ের জোরে কোপ বসালেন লুসির গলায়। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল প্রলয় কাণ্ড। জীবন্ত মানুষের ধড় থেকে মাথাটা কেটে আলাদা হয়ে যাবার পর যা করে ধড়টা তেমনি ভাবে মোচড় খেতে শুরু করল লুসির ধড়। কাটা গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। কফিনের ভেতর রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে যেন। সেই রক্তের নদীতে ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে লুসির ধড়টা। হাত দুটো থাবা মারছে কফিনের গায়ে। যেন ঘুম ভেঙে গিয়ে অঙ্গারের মত টকটকে লাল চোখ মেলে চেয়ে আছে কাটা মাথাটা। ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে চোখের লালচে জ্যোতি। আর্থারকে তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন প্রফেসর। নির্দ্বিধায় গজালটা লুসির

হৃৎপিণ্ড বরাবর ধরে হাতুড়ি হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়াল আর্থার। ক্রমশঃ নিভে আসছে চোখের জ্যোতি, তার সাথে তাল মিলিয়ে কমে আসছে ধড়টার নড়াচড়া। চোখের জ্যোতি একেবারে নিভে যেতেই ধড়টার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'এইবার, আর্থার।' চোখের পলকে হাতুড়ির এক আঘাতে জায়গামত গজালটা বসিয়ে দিল আর্থার। সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটল তখুনি। গজার মাছের মত বার দুয়েক শূন্যে লাফিয়ে উঠল কাটা মুণ্ডটা। তারপরই গলতে শুরু করল মুণ্ড আর ধড়। কয়েকদিনের গলিত শবে পরিণত হল ওগুলো। অসহ্য দুর্গন্ধে ভরে গেল সমাধিকক্ষটা। তাড়াতাড়ি কফিনের ডালা নামিয়ে দিতে বললেন প্রফেসর মরিসকে। তারপর গজালটা ছাড়া বাকি জিনিসপত্রগুলো ব্যাগে ভরে আমাদেরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। সমাধিকক্ষের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা আর্থারের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন প্রফেসর, 'তোমার জিনিস তুমি নিয়ে নাও, আর্থার। আর, না জানিয়ে তোমার জিনিস রেখে দিয়েছিলাম বলে ক্ষমা চাইছি।'

সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে প্রফেসরের পায়ের কাছে বসে পড়ে হাত জোড় করে বলল আর্থার, 'দয়া করে আর আমাকে লজ্জা দেবেন না, প্রফেসর। আমাকে আর লুসিকে নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে চিরঋণী হয়ে থাকলাম আপনার কাছে।'

হাত ধরে টেনে আর্থারকে দাঁড় করিয়ে বললেন প্রফেসর, 'তোমরা ছেলে-মানুষ। তবুও আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে যা করেছ, তোমাদের বয়সে আমি হলে কিন্তু তা পারতাম না।'

এতক্ষণে মুখ খুলল মরিস, 'এই বয়সেই পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরেছি আমি, বহু বিপদে পড়েছি, বহু অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। কিন্তু আজ আপনি যা দেখালেন, প্রফেসর, তার তুলনা হয় না।'

'হয়েছে। চলো এখন যাওয়া যাক। ওদিকে বেলাও বেশি নেই,' তাড়া লাগালেন প্রফেসর।

এতক্ষণে খেয়াল করলাম অস্ত যাচ্ছে সূর্য। গোধূলির আলোয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে পশ্চিমাকাশ। আমার মনে হল লুসির রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ ওখানে। নতুন করে আবার লুসির মৃত্যুর শোকটা অনুভব করতে শুরু করলাম এখন।

অস্তগামী সূর্যের হালকা নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে উপত্যকা জুড়ে। জানা অজানা অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে আছে জুনিপারের ঝোপ। মনের আনন্দে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এদিক ওদিক খেলে বেড়াচ্ছে খরগোশ। মনে হচ্ছে রাতের আঁধারে বিপদসংকুল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যেন স্বর্গের নন্দন কাননে এসে

হাজির হয়েছি আমরা।

এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে পাহাড়ী উপত্যকা বেয়ে নামতে লাগলাম আমরা। একসময় প্রফেসর বললেন, 'সহজ কাজটা শেষ করলাম আমরা, কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজটাই বাকি রয়ে গেছে এখনো। এই সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল যে, সেই নাটের গুরুকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের, তাকেও লুসির মতই কফিনে ফেলে হত্যা করতে হবে। কিন্তু আগে খুঁজে বের করতে হবে পিশাচটাকে। এবং সেইটাই হবে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং বিপজ্জনক কাজ। অবশ্য সূত্র একটা খুঁজে পেয়েছি আমি, এগোতেও হবে সে-পথ ধরে। একা আমার পক্ষে তা করা একেবারেই অসম্ভব। আশা করি আমাকে সাহায্য করবে তোমরা?'

'করব মানে? এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ব্যাপার চাক্ষুষ দেখার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে। আমি এক পায়ে খাড়া, প্রফেসর,' সবার আগে বলল মরিস।

'আর কিছুর জন্যে না হলেও, একটু আগে চাপিয়ে দেয়া ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা করার জন্যে অন্তত আপনার সাথে এগিয়ে যাব আমি, প্রফেসর,' গভীর আবেগের সঙ্গে বলল আর্থার।

'আমি এখনও আপনার ছাত্র, স্যার, আপনার কাছ থেকে এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে আমার। যত বিপজ্জনক পথেই পা বাড়ান না কেন আপনি, শিখতে হলে তো আপনার সাথে থাকতেই হবে আমার,' বললাম আমি।

আমাদের কথায় অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন প্রফেসর, 'তোমাদেরকে সাথী হিসেবে পেয়ে কি খুশি হয়েছি আমি বলে বোঝাতে পারব না। তাহলে এক কাজ কর, আর্থার, মরিস আগামী কাল সন্ধে সাতটায় জনের বাড়িতে আমার সাথে দেখা কর তোমরা। আজই একটা বিশেষ কাজে আমস্টারডামে যাচ্ছি আমি, অবশ্য কালই ফিরে আসব আবার। আর জন, তুমি এসো আমার সাথে। কথা আছে।'

বিদায় নিয়ে লুসিদের বাড়িতে চলে গেল আর্থার আর মরিস। প্রফেসরের সাথে হোটেলে চললাম আমি। কামরায় ঢুকে টেবিলে রাখা একটা খাম পেলেন প্রফেসর। মিনার টেলিগ্রামঃ

'আজ রাতের ট্রেনেই হুইটবি থেকে আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি আমরা। জরুরী কথা আছে।

মিনা হারকার।'

'সত্যি এই মহিলাটি একটি রত্ন,' টেলিগ্রামটা পড়ে খুশি হয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'কিন্তু ওরা তো ছিল এগজিটারে, হুইটবিতে এল কখন? আর এলই বা কেন?'

'বোধহয় কোন কাজ ছিল হুইটবিতে। যাকগে, ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই এখন, ওরা এলেই সব প্রশ্নের জবাব জানতে পারব,' বললাম আমি।

'ওরা তো আসছে, কিন্তু এখন ওদের রাখি কোথায়?'

'আমার বাড়িটার কথা ভুলে গেলেন, স্যার? ওখানেই তো স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে ওরা।'

হঠাৎ কি মনে হতেই ঘড়ি দেখলেন প্রফেসর। তারপর উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন, 'রাতের ট্রেন আসতে তো আর বেশি দেরি নেই। তোমাকে তো তাহলে এখুনি স্টেশনে রওনা হতে হয়।'

'তাই যাচ্ছি, স্যার। আর আপনি?'

'আমিও আজ রাতের ট্রেনই ধরছি। হ্যাঁ, ভাল কথা, যেজন্যে তোমাকে সাথে করে এনেছি,' বলে টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা খাম বের করলেন প্রফেসর। ওটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'নাও, এটার ভেতর মিনার স্বামী জোনাথনের ট্রানসিলভেনিয়া ভ্রমণের এক অদ্ভুত কাহিনী লেখা আছে। জোনাথনের ডায়েরীর কপি এটা। অবসর সময়ে পড়ে দেখ, অজানা অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। হারিয়ে ফেলো না কিন্তু আবার। আমার কাছে এটা সোনার খনির চেয়েও মূল্যবান।'

'না, না, স্যার। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনি। তাহলে, আমি এখন যাচ্ছি, স্যার?'

'এসো।'

খামটা হাতে করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হাতঘড়িতে দেখলাম ট্রেন এসে পড়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে। হাতে সময় অল্প, যেভাবেই হোক এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্টেশনে পৌছতে হবে আমাকে।

নয়

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

৩০ সেপ্টেম্বর।

গত রাতে হারকার দম্পতিকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সদ্য ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে অপেক্ষা করছি এমন সময় ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, 'আসতে পারি?' মিসেস হারকারের কণ্ঠস্বর।

'নিশ্চয়ই! আসুন!' সানন্দে অভ্যর্থনা জানালাম।

হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকলেন হারকার দম্পতি। 'আপনার সাথে একটু গল্প করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তা খুব ব্যস্ত নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস হারকার।

'আরে না-না। আসলে আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম আমি। গতকাল রাতেই আলাপ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় সে ইচ্ছে ত্যাগ করতে হল। আরে, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন না?'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে ঠিক আমার মুখোমুখি বসলেন মিসেস হারকার। পরিচ্ছন্ন ঘরোয়া পোশাকে অপূর্ব লাগছে ওকে। কোণের দিকের একটা চেয়ারে বসলেন মিস্টার হারকার।

'এর আগে আপনাকে না দেখলেও আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি লুসির মুখে,' বললেন মিনা হারকার। 'রোগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লুসির শয্যাপার্শ্বে ছিলেন আপনি। কিছু মনে না করলে আপনার মুখ থেকেই সে-সম্পর্কে সব কথা শুনতে চাই।'

'না, না, মনে করার কি আছে। তবে...' মিসেস হারকারের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম হঠাৎ।

মিষ্টি করে হাসলেন মিসেস হারকার, 'থামলেন কেন? বলুন।'

'বলতে বাধা নেই, মিসেস হারকার, কিন্তু সব কথা বিশ্বাস করবেন কিনা সন্দেহ।'

'নিঃসংকোচে বলতে পারেন, ডাক্তার সেওয়ার্ড।'

'তাহলে নিন,' টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমার ডায়েরীটা বের করে মিসেস হারকারের দিকে এগিয়ে দিলাম। 'সময় মতো পড়ে দেখবেন এটা। সব কথা জানতে পারবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, ডাক্তার,' ডায়েরীটা পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন মিসেস হারকার।

এই সময় চাকর এসে জানাল, টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে ডাইনিং রুমের দিকে পা বাড়ালাম আমরা।

খেতে খেতেই আলাপ জমে উঠল মিস্টার হারকারের সঙ্গে। কথায় কথায় জানা গেল স্যামুয়েল এফ বিলিংটন অ্যাণ্ড সন-কে লেখা চিঠির জবাব পেয়েই কাঠের বাক্সগুলো পাঠানোর তদন্ত করতে হুইটবিতে গিয়েছিলেন ওঁরা।

'ওখানকার কাজ শেষ হয়েছে আপনার?'

'হয়েছে,' পাইপে তামাক ঠাসতে ঠাসতে বললেন মিস্টার হারকার। 'শুধু বিলিংটনই নয়, কিংস ক্রস রেলস্টেশন, এমনকি মেসার্স কার্টার অ্যাণ্ড প্যাটারসন

কোম্পানীতেও হানা দিয়েছি আমি। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে, কাউন্ট ড্রাকুলার পাঠানো মাটি ভর্তি পঞ্চাশটা কাঠের বাক্স ডিমেটার জাহাজে করে ঠিকমতই ভার্না থেকে হুইটবিতে গিয়ে পৌছেছিল। অবশ্য বাক্সগুলো এখন কোথায় জানি না আমি।'

চকিতে একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল আমার। আমার হাসপাতালের নার্সের কাছে শুনেছিলাম, গত পরশু কারফাক্সের পুরানো গির্জা থেকে কয়েকটা বাক্স ঠেলাগাড়ি করে সরিয়ে নেয়ার সময় ঠেলাঅলা দুজনকে খুন করে ফেলতে যায় রেনফিল্ড। তাহলে বাক্সগুলো কোথায় সরিয়ে নেয়া হচ্ছে জানে কি নার্স?

আমার বাড়ির আশপাশের জায়গাটা একটু ঘুরে দেখবেন বলে উঠে পড়লেন হারকার দম্পতি। পড়ার ঘরে ফিরে এসে প্রফেসরের দেয়া মিস্টার হারকারের ডায়েরীর টাইপ করা কপিটা পড়তে বসলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত এক জগতে প্রবেশ করলাম আমি। পড়তে পড়তে কোন্ দিক দিয়ে যে সময় কেটে গেল টেরই পেলাম না। পড়া শেষ হলেও অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে বসে ভাবতে থাকলাম। কাউন্ট ড্রাকুলার আশ্চর্য কাহিনী পড়ার পর কতগুলো অদ্ভুত চিন্তায় পেয়ে বসল আমাকে। পুরানো গির্জায় গিয়ে কার সাথে কথা বলে রেনফিল্ড? স্বাভাবিক বাদুড়ের মত ওড়ে না, জ্যোৎস্না রাতে দেখা ওই বাদুড়টার সাথে কোন সম্পর্ক আছে কি কাউন্ট ড্রাকুলার? লুসির মৃত্যুর জন্য দায়ী কি ওই রক্তলোভী পিশাচটাই? হঠাৎ মিসেস হারকারের দরজায় টোকা দেবার শব্দে চমক ভাঙল আমার, ফিরে এসেছেন ওঁরা।

বিকেলের দিকে আমাকে ধরলেন মিসেস হারকার, 'ডাক্তার সেওয়ার্ড, দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আপনার ডায়েরীটা পড়ে জানতে পারলাম অনেক কিছুই। কিন্তু এখন আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে আপনাকে। রেনফিল্ড সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল বোধ করছি আমি। চলুন না, দয়া করে পাগলটাকে একবার দেখাবেন আমাকে।'

'আপত্তি নেই, চলুন।'

মিসেস হারকারকে নিয়ে ঢোকার আগে মজা করার জন্যে আমি একা একবার রেনফিল্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিতে ঢুকলাম ওর ঘরে। বিছানায় চিৎ হয়ে সটান শুয়ে আছে রেনফিল্ড। আমাকে ঢুকতে দেখে গম্ভীর ভাবে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। ওকে বললাম, 'একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান তোমার সাথে, রেনফিল্ড।'

ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সে, 'কেন?'

'এমনি, হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এসেছেন উনি। হাসপাতালের জ্ঞানী লোকদের সাথে পরিচিত হবার তাঁর ভারি ইচ্ছে।'

'ঠিক আছে, নিয়ে আসুন,' অনুমতি দিল রেনফিল্ড। হঠাৎ তড়াক করে উঠে পড়ল সে বিছানা থেকে। 'না, দাঁড়ান, ঘরটা পরিষ্কার করে নিই একটু।' বলেই অদ্ভুত কায়দায় ঘর গোছাতে শুরু করল রেনফিল্ড। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর বাক্স খুলে সবকটা মাছি আর মাকড়সা মুখে পুরে গিলে ফেলল সে। ঘরের এখানে ওখানে ভালমত খুঁজে পেতে দেখল আর কোন মাছি, মাকড়সা বা ওই জাতীয় কোন জীবন্ত প্রাণী আছে কিনা। নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বিছানার ওপর থেকে একটা বালিশ এনে ওর বাক্সটার ওপর বিছিয়ে গম্ভীর ভারিক্কি চালে ওটার ওপর গিয়ে আরাম করে বসল রেনফিল্ড। তারপর অনেকটা হুকুমের মত করে বলল আমাকে, 'যান নিয়ে আসুন ওঁকে।' রেনফিল্ডের রকমসকম দেখে ভীষণ হাসি পেল কিন্তু ও আবার দুঃখ পাবে মনে করে হাসলাম না।

আমার সাথে রেনফিল্ডের ঘরে ঢুকেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে রেনফিল্ডের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বললেন মিসেস হারকার, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে দারুণ খুশি হলাম, মিস্টার রেনফিল্ড।'

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস হারকারের কথার জবাব দিল না রেনফিল্ড, বাড়িয়ে ধরা হাতের দিকেও হাত বাড়িয়ে দিল না। বরং গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে মিসেস হারকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপন মনেই বলল সে, 'হুঁহ্, ভয়ঙ্কর বিপদ এগিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছি!'

'কিসের বিপদ, কার বিপদ, রেনফিল্ড?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল রেনফিল্ড। কিন্তু আমার কথার জবাব দিল না। মিসেস হারকারের দিকে চেয়ে বলল, 'এখানে এসেছেন কেন?'

'আপনাকে দেখতে,' মিষ্টি হেসে জবাব দিলেন মিসেস হারকার।

'মস্ত ভুল করেছেন আপনি, মিসেস হারকার। আজ রাতেই উনি আসবেন আমার এখানে। আপনার গায়ের গন্ধও পেয়ে যাবেন। তারপর, তারপর আপনাকে খুঁজে বের করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না তাঁকে।'

'কে আসবেন, কেন আসবেন, রেনফিল্ড? আর মিসেস হারকারের নামই বা জানলে কিভাবে তুমি?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হে হে করে দেঁতো হাসি হেসে বলল রেনফিল্ড, 'কে আসবেন? বললে চিনবেন নাকি তাঁকে? আর মিসেস হারকারের নাম জানলাম কিভাবে জিজ্ঞেস করছেন? এ সাধারণ কথাটা জানতে না পারলে মিছিমিছিই এতদিন সাধনা করলাম?'

রেনফিল্ডের কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম ওর পাগলামিটা আবার বাড়তির দিকে। ওর সাথে আর কথা বলে লাভ নেই ভেবে

বেরিয়ে আসতে ইশারা করলাম মিসেস হারকারকে। হাসিমুখে রেনফিল্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, 'আচ্ছা, চলি মিস্টার রেনফিল্ড, সময় করে আবার দেখা করব আপনার সাথে।'

যেন আঁতকে উঠল রেনফিল্ড, 'না, না, ভুলেও আর এখানে আসবেন না আপনি। আজ যদি ভালোয় ভালোয় ওঁর অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যেতে পারেন তাহলেই মনে করবেন মস্ত ফাঁড়া কেটে গেছে। অবশ্য সে সম্ভাবনা খুবই কম। অত্যন্ত সাবধানে থাকবেন, মিসেস হারকার।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'ওঁর ব্যাপারে আপনারাও একটু হুঁশিয়ার থাকবেন, ডাক্তার।'

রেনফিল্ডের কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি বোঝাতে চাইছে রেনফিল্ড? অবশ্য বেশিক্ষণ ভাবলাম না সেকথা। পাগলের প্রলাপ ভেবে দূর করে দিলাম চিন্তাটা মন থেকে।

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

৩০ সেপ্টেম্বর, গভীর রাত।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার সেওয়ার্ডের পড়ার ঘরে জরুরী বৈঠক বসল আমাদের। গোল টেবিলটা ঘিরে বসেছি আমি, জোনাথন, লর্ড গোডালমিং, মিস্টার মরিস, ডাক্তার সেওয়ার্ড আর প্রফেসর ভ্যান হেলসিং। একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কথা শুরু করলেন প্রফেসর, 'আজ এক বিশেষ প্রয়োজনে সবাই এখানে জমায়েত হয়েছি আমরা। এক ভয়ঙ্কর অদৃশ্য শত্রু প্রতিনিয়ত আমাদের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কোথায়, কখন, কিভাবে ঘায়েল করব সে বিষয়েই আজ আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে শত্রুর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলে নেয়া প্রয়োজন তোমাদের। আমাদের মধ্যে কেউই ভ্যাম্পায়ার বা রক্তচোষা বাদুড়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। এই রক্তচোষা বাদুড়ের সাথে তুলনা করা যায় আমাদের শত্রুকে। জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ব্যাপারটা সম্পর্কে প্রথমে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি আমি। অশরীরী এক পিশাচ লুসির রক্ত খেয়ে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে, এটা প্রথমেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু কোন্ আকৃতিতে সে আসে যায় সেটা বুঝতে যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে।

'ভয়ঙ্কর এই পিশাচেরা যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন প্রাণীর আকৃতি ধারণ করতে পারে। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রের মত যে-কোন প্রাকৃতিক শক্তিকেও ব্যবহার করতে পারে চোখের পলকে। হতে পারে ছোট বড় যা খুশি। সাধারণতঃ নেকড়ে বা বাদুড়ের রূপ নিতেই বেশি ভালবাসে ওরা। ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গে জ্যোৎস্না প্লাবিত গভীর রাতে ধূলিকণা থেকে তাদের মানুষে রূপ নিতেও দেখেছে

জোনাথন। নিজেদের চারপাশে ঘন কুয়াশা বা ঝড়ের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে এই অশুভ শক্তিরা, ডিমেটার জাহাজের ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। শুধু তাই নয়, যখন যেখানে খুশি অবাধে যাতায়াত করতে পারে এরা, এমন কি ভারি ডালাবন্ধ কফিনের মধ্যে থেকেও এই পিশাচদের ভীষণ অমানুষিক শক্তি যে কতটা হতে পারে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

'কিন্তু, এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এরা স্বাধীন নয়। সুনির্দিষ্ট কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের আওতার ভেতরে এদেরকে থাকতে হয়। কেউ যেচে তাকে না ডাকলে বা অনুকূল পরিবেশ না পেলে কখনও কোথাও অনুপ্রবেশ করতে পারে না এরা। কফিনে বা এরকম কোন জায়গায়, নির্দিষ্ট একটা আধারের কেন্দ্রে এদেরকে বাস করতে হয়। সূর্যাস্তের পর থেকে ভোরে মোরগ ডাকার আগ পর্যন্ত বাইরের পৃথিবীতে চলাফেরা করে বেড়াতে পারে এরা, তারপরই সুড়সুড় করে ফিরে যেতে হয় নিজেদের বাসস্থানে। রসুন, ধুনো এবং পবিত্র ক্রুশকে যমের মত ভয় করে এরা। এমন কি কফিনের ওপর বুনো গোলাপের ডাল বিছিয়ে রাখলেও তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না পিশাচেরা।

'আর বয়স? দিন কালের পরিধি দিয়ে এই শয়তানদের বয়স মাপা যায় না। জীবন্ত প্রাণীদেহ থেকে রক্ত পান করে করে শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁচে থাকতে পারে এরা। মাসের পর মাস কিছু না খেয়েও থাকতে পারে। তখন মনে হয় বয়স বেড়ে গেছে এদের, আবার রক্ত খেয়ে নিলেই আগের মত তরুণ হয়ে যায়। ঘোড়াগাড়িতে লুসির পাশে তরুণ ড্রাকুলাকে দেখে চমকে যায় জোনাথন, আসলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। লুসির রক্ত, সেই সাথে লুসির ধমনীতে প্রবেশ করানো আমাদের কয়েকজনেরও রক্ত খেয়ে খেয়ে ওরকম তরুণ হয়ে গিয়েছিল ড্রাকুলা।

'এই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম করতে পারি আমরা, কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে, এ সম্পর্কে ভালমত ভেবে দেখতে হবে আমাদের। কাজটা অত্যন্ত দুরূহ এবং বিপজ্জনক। একবার হেরে গেলে তার পরিণতি—নিশ্চিত মৃত্যু। এবং এই মৃত্যুই এর শেষ নয়। শয়তানের শিকার হয়ে মৃত্যুর পর তারই মত এক ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা হয়ে রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে বেড়াতে হবে, আর অতি প্রিয়জনদের শরীরের রক্ত পান করতেও তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না আমাদের।

'তবু নিজের জীবন তুচ্ছ করেও আত্মীয়স্বজন এবং পৃথিবীর অগুণতি মানুষের মুখ চেয়ে এই শয়তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের। এ পবিত্র কর্তব্য থেকে কিছুতেই সরে দাঁড়াতে পারি না আমরা। কারণ এ না করলে মৃত্যুর পর

একদিন যখন সৃষ্টিকর্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব, তখন তাঁর কাছে কি জবাব দেব আমরা? দিনের পর দিন মানুষের জীবন থেকে তাঁর দেয়া আলো, গান, ভালবাসাকে ছিনিয়ে নেবে এক অন্ধকারের পিশাচ, সব জেনেশুনেও আমরা তার প্রতিকার না করে গেলে কি আমাদের ঘৃণার চোখে দেখবেন না ঈশ্বর? আমি বৃদ্ধ হয়েও যদি এই ভয়ঙ্করের বিরোধিতা করতে এগিয়ে যাই, তোমরা তরুণ হয়ে কি বসে থাকবে? বল? জবাব দাও,' আবেগে, উত্তেজনায় গমগম করে উঠল প্রফেসরের ভরাট কণ্ঠস্বর।

ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর হাত বিছিয়ে দিল জোনাথন। তার হাতের ওপর হাত রাখলাম আমি। দু'জনের হয়ে জোনাথন বলল, 'আমাদের দু'জনকে আপনার বিশ্বস্ত সহযোগী ধরতে পারেন, প্রফেসর।'

তিনজনের দিকেই তিনজনে নীরব দৃষ্টি বিনিময় করলেন ডাক্তার সেওয়ার্ড, লর্ড গোডালমিং আর মিস্টার মরিস। তারপর একে একে আমাদের হাতের ওপর হাত রাখলেন ওঁরা তিন বন্ধু। তিনজনের হয়ে বললেন মিস্টার মরিস, 'আমাদের কথা তো আগেই আপনাকে জানিয়েছি, প্রফেসর।'

'ভেরি গুড! ভেরি গুড! তোমাদের সাহস আর আমার ওপর বিশ্বাস দেখে ভারি খুশি হলাম,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে একটু সামনে ঝুঁকে আমাদের পাঁচজনের হাতগুলো দু'হাতে চেপে ধরলেন প্রফেসর। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে আবার বসে পড়লেন চেয়ারে। আমরাও টেবিলের ওপর থেকে আমাদের হাত তুলে আনলাম। সবার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন প্রফেসর, 'আমাদের এই সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিভাবে? প্রথমেই খুঁজে বার করতে হবে নাটের গুরু কাউন্ট ড্রাকুলার বাসস্থানটা। জোনাথন আর মিনার ডায়েরী পড়ে এবং অন্যান্য জায়গায় খোঁজখবর করে আমি জানতে পেরেছি, ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গ থেকে পঞ্চাশটা কাঠের বাক্স কারফাক্সের পুরানো গির্জায় পৌছানর পর কয়েকটা কাঠের বাক্স আবার ঠেলাগাড়িতে করে কোথাও সরিয়ে নেয়া...'

প্রফেসরের কথার মাঝেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার মরিস। ব্যাপার কি ভাবছি, এমন সময় বাইরে থেকে ভেসে আসা পিস্তলের গুলির শব্দে চমকে উঠলাম সবাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘরের একপাশের জানালার কাঁচের শার্সি ভেঙে ঝন ঝন শব্দে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সবাই। এই সময় পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার মরিস। উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'আপনার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ওই জানালাটার দিকে চোখ পড়ে যায় আমার, প্রফেসর।

দেখলাম কালো মত কি একটা উড়ে বেড়াচ্ছে জানালার কাছে। ব্যাপারটা দেখার জন্যে বাইরে বেরোতেই দেখি জানালার কাঁচের শার্সির গায়ে এসে বসার চেষ্টা করছে একটা প্রকাণ্ড বাদুড়। সাথে সাথেই কোমর থেকে পিস্তল তুলে গুলি করলাম...'

'ওটার গায়ে গুলি লেগেছে?' মৃদু হেসে জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'এটাই আশ্চর্য, প্রফেসর। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না আমার নিশানা, হলপ করে বলতে পারি আজও হয়নি। অথচ গুলি খেয়েও দিব্যি উড়ে চলে গেল বাদুড়টা, যেন গুলিটা লাগেইনি ওটার গায়ে। আর বাদুড়টার ওড়ার কায়দাও অদ্ভুত।'

'ওটা বাদুড় নয়, মরিস। কাজেই তোমার গুলি লাগলেও মরবে কেন ওটা? আসলে রাতের বেলা মারা যায় না ওদের, গুলি ছুঁড়ে তো নয়ই। শয়তানটাকে মারতে হলে সবার আগে ওটার আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। এবং সেজন্যে ভোর হলেই কারফাক্সের পুরানো গির্জায় হানা দিতে চাই আমি। প্রথমে গুণে দেখতে হবে পঞ্চাশটার ভেতর ক'টা কফিন অবশিষ্ট আছে ওই গির্জায়, তারপর জানতে হবে কোথায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে বাকিগুলো। তারপর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, এই সময়ের মধ্যে কফিনের ভেতরই হত্যা করতে হবে হারামীটাকে।'

'ঠিক,' অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বলে উঠলেন মিস্টার মরিস। 'অযথা সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। তা মিসেস হারকারও কি যাবেন আমাদের সাথে?'

'দরকার নেই,' নিষেধ করলেন প্রফেসর। 'এই অজানা বিপদের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি?'

ওদের সাথে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন মিস্টার মরিস, 'যথেষ্ট রাত হয়েছে, এখন একটু জিরিয়ে নিলে হয় না? সেই ভোরে উঠে তো আবার বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো সবাই,' আদেশ দিলেন প্রফেসর।

ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি আর জোনাথন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল জোনাথন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম এলো না কিছুতেই। কেবলই মনে হতে লাগল রেনফিল্ডের কথা। আমাকে বার বার হুঁশিয়ার করছিল কেন সে? ওই পাগলটার কথার ভেতর কি সত্যতা কিছু আছে?

কতক্ষণ জেগে শুয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠে বসলাম। হালকা জ্যোৎস্নায় চোখে পড়ল জানালার কাছে বার বার উড়ে আসছে বাদুড়টা, লাল জ্বলজ্বলে দুটো চোখ ওটার। আশ্চর্য! বেশ কিছুদিন

আগে লুসির ঘরের জানালায় বসে থাকতে দেখেছিলাম আমি এটাকেই। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা বালিশ তুলে নিয়েই ওটার দিকে ছুঁড়ে মারলাম আমি। জানালার গায়ে চাপা 'থ্যাপ' শব্দ করে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল বালিশটা। সে-শব্দে ঘুম ভেঙে গেল জোনাথনের।

'কি হল?' বলে একলাফে বিছানার ওপর উঠে বসল জোনাথন।

'ওই বাদুড়টা!' আঙুল দিয়ে জানালার দিকে নির্দেশ করতে গিয়েই দেখলাম নেই ওটা ওখানে। চলে গেছে।

চিন্তিত ভাবে জানালার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল জোনাথন, তারপর আমাকে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলে নিজেও শুয়ে পড়ল আবার। কিন্তু জানি বাকি রাতটা আর কিছুতেই ঘুম আসবে না আমার। অগত্যা বাতি জেলে ডায়েরী লিখতে বসলাম।

দশ

জোনাথন হারকারের ডায়েরী থেকে

১ অক্টোবর।

সারাটা দিন কারফাক্সের গির্জার আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েও ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। কারণ সদর দরজা ছাড়া ভেতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই। দরজাটা তালা মারা, চাবি গির্জার দারোয়ানের কাছে। গির্জা সংলগ্ন আলাদা একটা ছোট্ট ঘরে থাকে দারোয়ান। ওই চাবি ছাড়া গির্জার ভেতর ঢোকা অসম্ভব।

'যেভাবেই হোক ওই চাবিটা দরকার আমাদের,' একসময় বললেন প্রফেসর।

কিন্তু কি করে যোগাড় করা যায় চাবি? শেষ পর্যন্ত দারোয়ানের সাথে ভাব জমিয়ে ঘরে ঢুকে এক ফাঁকে ওর বিছানার তলা থেকে একজোড়া চাবির একটা চুরি করে নিয়ে এলেন মিস্টার মরিস। ভারি পেতলের চাবিটা প্রফেসরের হাতে তুলে দিতেই খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। বললেন, 'দিনের বেলায় দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে গির্জার ভেতরে ঢোকা যাবে না কিছুতেই। অতএব রাতেই চেষ্টা করে দেখতে হবে। অবশ্য হাজার গুণ বিপজ্জনক হয়ে পড়বে তাহলে কাজটা, কারণ তখন জেগে উঠবে রক্তচোষা পিশাচটা। তবে ভাবনা নেই, তৈরি হয়েই ভেতরে ঢুকব আমরা। শুধু বিপদের সময় সাহস হারিয়ে না ফেললেই হল। এখন চলো, কোথাও বসে খেয়ে নেয়া যাক।'

গির্জা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক জায়গায় বসে খাওয়া সেরে নিলাম

আমরা। জায়গাটা চমৎকার। খাওয়া দাওয়ার পর গাছের ছায়ায় শুয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিল সবাই, কিন্তু আমার শুতে ভাল লাগছিল না। বার বারই মিনার কথা মনে পড়ছিল। গতরাতের কথাও ভাবলাম। সত্যিই কি জানালার কাছে বাদুড় দেখেছিল মিনা? সত্যিই হবে। কারণ মিস্টার মরিসও তো দেখেছিলেন ওটাকে। লুসির অসুখের সময় ওর ঘরের জানালায়ও দেখা গিয়েছিল ওটাকে, মিনাই বলেছে আমাকে কথাটা। তারপর থেকেই লুসির অসুখ বেড়ে যায়। পাগল রেনফিল্ডও নাকি বার বার কোন অজানা বিপদের হুঁশিয়ারি জানিয়েছে মিনাকে। একথাটাও মিনার মুখেই শুনেছি। হঠাৎ একটা অশুভ চিন্তা ছেয়ে ফেলল মনটাকে। তাহলে, তাহলে কি মিনার ওপর দৃষ্টি পড়েছে···। না, থাক। এমন একটা অশুভ চিন্তা কিছুতেই স্থান দেব না মনে। চিন্তাটা তাড়াবার জন্যেই পকেট থেকে কলম আর ডায়েরী বুকটা বের করে ডায়েরী লিখতে বসলাম।

২ অক্টোবর।

রাত দশটার দিকে আরও কিছু খেয়ে নিয়ে আমাদের বিশ্রামের জায়গা ছেড়ে উঠে কারফাক্সের পুরানো গির্জার দিকে আবার রওনা দিয়েছিলাম আমরা গতকাল। বার বার নানা ভাবে মিনার চিন্তাটা তাড়াতে চেষ্টা করেছি মন থেকে, কিন্তু বার বারই ঘুরে ফিরে মনে আসছিল অশুভ চিন্তাটা। প্রফেসরকে বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না।

নিঃশব্দে গির্জাটার দিকে চলতে লাগলাম আমরা। চাঁদের আলোয় ঘাসে ঢাকা সরু পথের ওপর ভৌতিক ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশের বিশাল গাছগুলো। গির্জার কাছাকাছি পৌঁছেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদেরকেও থামতে বললেন প্রফেসর। ব্যাগ হাতড়ে বের করলেন চারটে রসুনের মালা আর চারটে ক্রুশ। আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ক্রুশ আর মালা দিয়ে বললেন, 'যার যার গলায় পরে নাও মালাগুলো। ক্রুশগুলো রেখে দাও কোটের বুক পকেটে। তাহলে আর কোনো পিশাচ প্রেতাত্মা তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না, অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না কোনমতেই। জন, একটা করে মোমবাতি দিয়ে দাও সবাইকে।' একটু থেমে আবার বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু মুশকিল হবে দরজাটা নিয়ে। অত ভারি আর পুরানো দরজা খুলতে গেলে শব্দ হবেই। আর সেই শব্দে দারোয়ানটা জেগে উঠলেই আমাদের সব উদ্দেশ্য ভেস্তে যাবে।'

'অত কেয়ার করি না। বেশি গোলমাল পাকালে ব্যাটাকে ওর ঘরেই বেঁধে রেখে গির্জার ভেতরে ঢুকে পড়ব আমরা। মুখে রুমাল বেঁধে নিলেই আর আমাদেরকে চিনতে পারবে না সে,' গোঁয়ারের মত বললেন মিস্টার মরিস। সত্যিই লোকটা দুঃসাহসী।

'গোলমাল যত এড়ানো যায় ভাল। অগত্যা এড়াতে না পারলে তোমার কথাই কাজে লাগাতে হবে। এখন একছুটে ওর ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে এসো তো, কি করছে দারোয়ানটা?' মিস্টার মরিসকে উদ্দেশ্য করে বললেন প্রফেসর।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মুখে বেঁধে নিলেন মিস্টার মরিস। তারপর একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ওক আর বার্চের আড়ালে। অল্পক্ষণ পরই আবার ফিরে এলেন তিনি। মুখে বাঁধা রুমালটা খুলে বললেন, 'মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে ব্যাটা। কানের কাছে বোম ফাটলেও টের পাবে না এখন কিছু।'

'যাক, ভালই হল,' খুশি হয়ে বললেন প্রফেসর।

আবার চলতে শুরু করলাম আমরা। গির্জার কাছে পৌছে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম চাতালের ওপর। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন প্রফেসর। সবাই মিলে কাঁধ লাগিয়ে ঠেলা দিলাম ভারি দরজাটায়। উৎকট যান্ত্রিক শব্দ তুলে খুলে গেল ভারি পাল্লা দুটো। আমার মনে হল যেন যক্ষপুরীর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল চোখের সামনে। সবার আগে ভেতরে ঢুকলেন প্রফেসর। তারপর এক এক করে আমরা সবাই ঢুকে পড়ে ভেতর থেকে ভিড়িয়ে দিলাম দরজাটা। যে যার মোমবাতি জ্বালিয়ে নিতেই চোখে পড়ল ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। দল বেঁধে সেই সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগলাম আমরা। সবার আগে নামছেন প্রফেসর।

সেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গে একা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামার কথা মনে পড়ে গেল আমার। মোমের আলোয় সিঁড়ির একপাশের দেয়ালে আমাদের ছায়াগুলো পড়ে তির তির করে কাঁপছে অপরাধী প্রেতের মত। আশেপাশে যেন টের পাচ্ছি কার অদৃশ্য উপস্থিতি। সিঁড়িতে আর একপাশের রেলিংয়ে পুরু হয়ে জমে আছে ধুলোর স্তর। থেকে থেকেই ড্যাপসা পচা একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কাউন্ট ড্রাকুলার গায়ের সেই পচা গন্ধ যেন এটা। কথাটা মনে হতেই আতঙ্কে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল আমার।

একসময় শেষ হল সিঁড়ির ধাপ। পুরু ধুলো বিছান একটা মেঝেতে এসে নামলাম আমরা। সামনেই পড়ে আছে মাটি ভর্তি বাক্সগুলো। গুণে দেখলাম, মোট উনত্রিশটা অর্থাৎ বাকি একুশটা বাক্স সরিয়ে ফেলা হয়েছে কোথাও। কোথায়? তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি, হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠলেন লর্ড গোডালমিং, 'কে? ও কে?'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আঙুল তুলে ওপাশের দরজাটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। লর্ড গোডালমিং-এর নির্দেশিত দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ঠাণ্ডা শিহরণ।

স্তব্ধ হয়ে দেখলাম আবছা অন্ধকারে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্ট ড্রাকুলা স্বয়ং। সেই ঈগলের মত বাঁকান নাক, পাথরে খোদাই মুখ আর টকটকে লাল একজোড়া চোখ। এক পলকের জন্যে দেখলাম পিশাচটাকে। অন্য সবাই ঘুরে দাঁড়াবার আগেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'চলো দরজার ওপাশে কি আছে দেখে আসি। আমার মনে হয় পুরানো সমাধিকক্ষ ওটা,' বলে মোমবাতি হাতে এগিয়ে চললেন প্রফেসর।

দরজার ওপাশে পৌছে দেখলাম প্রফেসরের কথাই ঠিক। সমাধিকক্ষই ওটা। ঘরটার তিনদিকে ঘেরা পাথরের নিরেট দেয়ালে কোন দরজা জানালা নেই, এই ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে থাকা সম্ভবও নয়।

'গেল কোথায় ও? এখানে তো লুকোবার জায়গা দেখছি না,' বললেন লর্ড গোডালমিং।

'কে লুকোবে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'কেন, একটু আগে দেখা লোকটা?'

'ওদের লুকোবার জায়গার অভাব হয় না। হয়ত আমাদের আশেপাশেই কোথাও অদৃশ্য হয়ে আছে।'

হঠাৎ মিস্টার মরিসের বিস্মিত কণ্ঠ শুনে সবাই ঘুরে তাকালাম ওর দিকে। কথা না বলে আঙুল দিয়ে ঘরের এক কোণে আমাদের দেখিয়ে দিলেন তিনি। নির্দেশিত দিকে চেয়ে দেখলাম চকচকে ধূলিকণার এক ঘূর্ণি উঠেছে সেখানে। কণাগুলোর আড়ায় অনেকখানি কেটে গেছে ওদিককার অন্ধকার। ফসফরাসের মত ঝিকমিক করে জ্বলছে নিভছে অসংখ্য ধূলিকণা। আশ্চর্য! এ জিনিসই দেখেছিলাম আমি কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গে। ডাইনীতে রূপ নিয়েছিল ওই ধূলিকণা। এখন কিসে রূপ নেবে?

দেখতে দেখতে বীভৎস চিৎকারে কান ঝালাপালা করে দিয়ে কোত্থেকে বেরিয়ে এল হাজার হাজার ইঁদুর। ইঁদুরের লুটোপুটি আর চিৎকারের মাঝেই ক্রমশঃ বড় হতে শুরু করল ধূলিকণাগুলো। জোনাকির সমান বড় হয়েই ঝাঁক বেঁধে উড়ে এসে আমাদের চারপাশে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরতে শুরু করলো ওগুলো। বুঝতে পারছি রসুনের মালা আর পবিত্র ক্রুশ সঙ্গে থাকাতেই কাছে ঘেঁষতে পারছে না পিশাচটা। তবু যদ্দুর সম্ভব ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। আস্তে আস্তে রূপ বদলাতে শুরু করেছে জোনাকিগুলো। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল জোনাকিরা। তার পরিবর্তে আমাদেরকে ঘিরে ধপ্ করে শূন্য থেকে পড়ল একটা প্রকাণ্ড পাইথন। বিশাল মাথাটা তুলে টকটকে লাল চোখ মেলে আমাদেরকে দেখতে থাকল সাপটা।

এক ঝটকায় কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে এনে ওটার দিকে নিশানা করলেন মিস্টার মরিস। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন প্রফেসর, 'গুলি করে কোন লাভ হবে না, মরিস। মরবে না ওটা।'

যেন প্রফেসরের কথায় সায় দিতেই খল খল করে বীভৎস হাসি হেসে উঠল সাপটা। বদ্ধ কামরায় সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর শোনাল। মরিসের হাত ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা বিস্কুটের মত জিনিস বের করলেন প্রফেসর। ওটার কিছুটা ভেঙে ছুঁড়ে দিলেন সাপটার মাথায়। অবাক কাণ্ড! একটা প্রচণ্ড আর্ত-চিৎকার করে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সাপটা। ওদিকে বেড়েই চলেছে ইঁদুরের চিৎকার। যেন পাগল হয়ে গেছে ওগুলো। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে ওগুলোর কিচকিচ শব্দে পাগল হয়ে যাব আমরাও।

'আমাদের এখানকার কাজ আপাতত শেষ,' বলে তাড়া লাগালেন আমাদের প্রফেসর। 'চলো বেরোই এ নরক থেকে।'

ভারি দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। দরজার পাল্লা দুটো আবার লাগাবার পর তালা দিয়ে দিলেন প্রফেসর। পুবের আকাশে রঙের ছোপ লাগতে শুরু করেছে তখন। ক্লান্ত পায়ে ডাক্তার সেওয়ার্ডের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম আমরা।

ঘরে ফিরে দেখলাম তখনও গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে মিনা। কেমন যেন একটু ম্লান দেখাচ্ছে ওকে। হয়তো সারারাত আমাদের চিন্তায় ঘুমোতে পারেনি, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে বিরক্ত না করে ঘরের কোণের সোফাটায় এসে গা এলিয়ে দিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম একুশটা বাক্সের খোঁজে আজই একবার টমাস স্নেলিং এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ক্যারীং কনট্রাক্টর সে। পঞ্চাশটা বাক্স কারফাক্সের পুরানো গির্জায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল সেই।

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

২ অক্টোবর।

বই পড়ে আর ঘুমিয়ে কেটেছে গতকাল সারাটা দিন। সন্ধ্যার পর থেকেই জোনাথনদের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু রাত এগারোটা বেজে যাবার পরও যখন ওরা ফিরল না, রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কি জানি, কোন বিপদে পড়ল নাকি ওরা! কিন্তু প্রফেসরের মত অসমসাহসী আর প্রতিভাবান লোক রয়েছেন ওদের সাথে, ভেবে সান্ত্বনা পেলাম একটু।

বারটা বাজার পরও ফিরল না ওরা। চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া

আর কিছু করার নেই। কিন্তু বিছানায় শুয়েও ঘুম এলো না। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বাইরের সবকিছুই কেমন ফ্যাকাসে রহস্যময় মনে হচ্ছে। ঠিক এই সময় চোখে পড়ল জিনিসটা। ছেঁড়া মেঘের মত ছোট্ট এক টুকরো হালকা কুয়াশা ভাসতে ভাসতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। বিচিত্র রূপ নিতে নিতে এগিয়ে আসা কুয়াশাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। জানালার বন্ধ কাঁচের শার্সির কাছে এসে একমুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল কুয়াশাটা, তারপর জানালার বন্ধ পাল্লার মাঝখানের সামান্য ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভেতরে ঢুকতে শুরু করল। ঘরের ভেতর ঢুকেই একবার আমার মাথার ওপর পাক খেল কুয়াশার স্তর, তারপর লম্বা একটা স্তম্ভের রূপ নিতে শুরু করল। লাল টকটকে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ওই কুয়াশার ভেতর থেকে সরাসরি চেয়ে আছে আমার দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন মোহগ্রস্তের মত হয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে বুজে এল চোখের পাতা। বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। অনেক বেলা করে ঘুম ভেঙেছে আজ। ঘুম ভাঙার পর ভীষণ ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগছিল নিজেকে। এখনও কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে শরীরটা। কথাটা জানাতে হবে প্রফেসরকে।

এগার

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

২ অক্টোবর।

রেনফিল্ডের পাগলামি বেড়ে গিয়ে কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে ভেবে সারাক্ষণ একজন লোককে ওর ঘরের বাইরে রেখে ওকে পাহারা দেবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম নার্সকে। তার সামান্যতম পরিবর্তন দেখলেও আমাকে খবর দেবে নার্স। কাজেই সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত ভেবে হাসপাতালে যাওয়া বাদই দিয়েছি আজ। তাছাড়া গত রাতের অভিযানের পর হাসপাতালে যাবার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থাও ছিল না। কাজেই সারাটা দিন সেঁটে ঘুম দিয়ে বিকেলের দিকে উঠেছি ঘুম থেকে।

সন্ধ্যার পর ড্রইং রুমে বসে চা খেতে খেতে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লাগলাম। সকালে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে সেই যে কোথায় বেরিয়েছিলেন মিস্টার হারকার সারাদিন পর একটু আগে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল যে কাজে বেরিয়েছিলেন তাতে পুরোপুরি

সফল না হলেও একেবারে ব্যর্থ হননি। ঘরে ঢুকেই ক্লান্তভাবে ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়লেন তিনি।

'কি ব্যাপার, কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় টো টো করে এলেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বলব সবই, কিন্তু আগে কিছু খেয়ে নেয়া দরকার।' বলে মিসেস হারকারের দিকে তাকিয়ে হালকা রসিকতার সুরে বললেন তিনি, 'আপনি কি দয়া করে কৃতার্থ করবেন এ অধমকে?'

'অবশ্যই, অবশ্য, সেই কখন থেকেই তো হুজুরের ভোগ সাজিয়ে বসে আছি। কিন্তু পাত্তাই নেই হুজুরের। তা দয়া করে এবার গাত্রোত্থান করা হোক,' কপট গাম্ভীর্যের সাথে জবাব দিলেন মিসেস হারকার।

ওদের দুজনের কথার ধরনে হো হো করে হেসে ফেললাম আমরা সাবাই, হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার হারকারও। একটু পর খাওয়া সেরে ফিরে এলেন তিনি। মিসেস হারকারের শরীরটা বিশেষ ভাল নেই বলে তাঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছেন। একটা সোফায় বসে পড়ে পকেট থেকে পাইপ বের করে তাতে তামাক পুরে ধরিয়ে নিলেন মিস্টার হারকার।

আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বলেই ফেললাম, 'ভাবসাব দেখে তো মনে হচ্ছে কাউন্ট ড্রাকুলার সাক্ষাৎ পেয়ে গেছেন আপনি।'

'সাক্ষাৎ না পেলেও খোঁজ পেয়ে গেছি,' মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন মিস্টার হারকার।

'তাহলে তো কাজই করে এসেছ একটা। কোথায় পেলে তার খোঁজ?' এতক্ষণে মুখ খুললেন প্রফেসর।

'আসলে সেই একুশটা বাক্সের খোঁজে বেরিয়েছিলাম আমি। কার্টার, প্যাটারসন কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া সামান্য একটা সূত্র ছিল আমার হাতে। সেই সূত্র ধরেই ক্যারীং কন্ট্রাক্টর টমাস স্নেলিং-এর খোঁজ করি। সেখান থেকে খোঁজখবর করতে করতে শেষ পর্যন্ত একুশটা বাক্সের হদিস পেয়ে যাই আমি। প্রথম কিস্তিতে ঠেলাগাড়িতে করে ছ'টা বাক্স নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মাইল অ্যাণ্ড নিউ টাউনের একশো সাতানব্বই নম্বর চিকস্যাণ্ড স্ট্রীটে। দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও ছ'টা নিয়ে যাওয়া হয় ব্রেমণ্ডসের জ্যামাইকা লেনে। তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তিতে বাকি ন'টা বাক্স নিয়ে যাওয়া হয় পিকাডিলি সার্কাসের কাছের পুরানো গির্জাটায়। আমার মনে হয় তিনশো সাতচল্লিশ নম্বর পিকাডিলির সেই বিশাল পুরানো গির্জাটাতেই এখন ঠাঁই নিয়েছে কাউন্ট ড্রাকুলা।'

'দারুণ আবিষ্কার করে এসেছো দেখছি! তা, তিনশো সাতচল্লিশ নম্বর বাড়িটা

চেনো তুমি, নিজ চোখে দেখেছ?'

'দেখেছি। বুঝতে পারছি কেন প্রশ্নটা করছেন। অর্থাৎ কার-ফাক্সের গির্জার মত প্রহরা আছে কিনা, ঢুকতে অসুবিধে হবে কিনা, এই তো?' মৃদু হেসে বললেন মিস্টার হারকার, 'না, প্রফেসর, হবে না।'

'গুড।'

আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে এরপর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলাম আমরা। রাতে শুতে যাবার আগে হাসপাতালটা একবার পরিদর্শন করে এলাম আমি। রেনফিল্ডের ঘরেও উঁকি দিয়ে দেখলাম। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ও।

৩ অক্টোবর

ভোরে কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারব না, হঠাৎ নার্সের উত্তেজিত ডাকে ঘুম ভেঙে গেল আমার। আমি চোখ মেলতেই বলল সে, 'সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে, স্যার, রেনফিল্ডের অবস্থা শোচনীয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে।'

স্যাণ্ডেল জোড়া কোনমতে পায়ে গলিয়ে নিয়ে রাত্রিবাস পরেই ছুটলাম। নার্সের মুখে আগে থেকে শোনার পরও রেনফিল্ডের ঘরে উঁকি দিয়েই আঁতকে উঠলাম। বাঁ পাশে কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে রেনফিল্ড। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘরের মেঝে। আন্দাজেই বুঝলাম ভয়ঙ্কর কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসে পড়লাম। আস্তে করে ওর মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েই থমকে গেলাম। মনে হল, প্রচণ্ড আক্রোশে মেঝেতে ঠুকে ঠুকে ওর মুখটাকে থেঁতলে দিয়েছে কেউ। চুঁইয়ে চুঁইয়ে এখনও রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে। ওর অচেতন দেহের পাশে উবু হয়ে বসে ভালমত পরীক্ষা করে দেখলাম, যেভাবে বাঁকাচোরা হয়ে পড়ে আছে দেহটা তাতে আন্দাজ করলাম কোমরটাও ভেঙে গেছে। কেমন করে ঘটেছে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে নার্সকে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু সে-ও বলতে পারল না কিছু।

রেনফিল্ডের ঘরের সামনে সারাক্ষণ পাহারা দেয় একজন দারোয়ান, সুতরাং সামনে দিয়ে কেউ তার ঘরে ঢুকে তাকে এভাবে মারপিট করে যেতে পারবে না। আর পেছনের বন্ধ জানালা দিয়ে রেনফিল্ডের অজান্তে কেউ তার ঘরে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। মারা তো দূরের কথা। বিছানা থেকে পড়ে গিয়েও ওরকম ঘটা অস্বাভাবিক। তাহলে?

ব্যাপারটার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে প্রফেসরকে খবর পাঠালাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাতের পোশাক পরা অবস্থায়ই ছুটে চলে এলেন প্রফেসর।

কয়েক মুহূর্ত রেনফিল্ডের থেঁতলানো মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। আস্তে করে বললেন, 'অত্যন্ত গুরুতর মনে হচ্ছে আঘাতটা। ভালমত পরীক্ষা করে দেখতে হবে ওকে। ওর ওপর নজর রেখো, এখুনি আসছি আমি।'

টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে রেনফিল্ড। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুবই খারাপ ওর অবস্থা। অল্পক্ষণেই ফিরে এলেন প্রফেসর, হাতে অপারেশনের ইন্সট্রুমেন্টস বক্স। ওঁর থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে অনুমান করলাম গভীর ভাবে ভাবছেন কিছু তিনি। ঘরে ঢুকেই নার্সের দিকে চেয়ে বললেন তিনি, 'তুমি একটু বাইরে যাও তো। দরকার হলে ডাকব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নার্স। আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে রেনফিল্ডের পাশে উবু হয়ে বসে পড়ে তাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন প্রফেসর। বেশ কয়েক মিনিট ধরে গভীর ভাবে পরীক্ষা করার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন প্রফেসর, 'মুখের আঘাতটা তেমন কিছু না, আসলে আঘাত লেগেছে করোটিতে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে মাথার তালু। যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছে আঘাতটা মারাত্মক। এখন যত শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে রক্তের চাপ। যেভাবে রক্তক্ষরণ বাড়ছে তাতে শীঘ্রিই অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাবে যন্ত্রণা। ওর মাথার ভেতরের জমাট বাঁধা রক্ত অপসারণের জন্যে এখুনি অপারেশন করতে হবে।'

দরজায় টোকা দেবার মৃদু শব্দ হতেই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর্থার, মরিস আর মিস্টার হারকার। চেহারা আর পোশাক পরিচ্ছদ দেখেই বোঝা যায় সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে ওরা। আর্থার বলল, 'কি হয়েছে জন? শুনলাম, মারাত্মক দুর্ঘটনা নাকি ঘটে গেছে এখানে?'

'ঠিকই শুনেছিস। আয়, ভেতরে আয়, ডাকলাম আমি।'

ওরা ঘরে ঢুকতেই আবার দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি। রেনফিল্ডকে ওভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে প্রায় আঁতকে উঠে বলল আর্থার, 'কি হয়েছে লোকটার?'

সংক্ষেপে ঘটনাটা জানালাম ওদের। সব শেষে বললাম, অপারেশনের পর সামান্য সময়ের জন্যে হয়ত জ্ঞান ফিরতে পারে ওর। তাহলে ওর এ অবস্থার জন্য কে দায়ী জানা যাবে হয়ত।'

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে রেনফিল্ডের বিছানাটায় বসে পড়ল ওরা তিনজন। ততক্ষণে অপারেশনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন প্রফেসর। গভীর উৎকণ্ঠার সাথে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম আমরা। সময় যেন কাটতেই চাইছে না। যেন অনড় হয়ে

দাঁড়িয়ে গেছে আশঙ্কা আর উদ্বেগ ভরা মুহূর্তগুলো। জ্ঞান ফিরে আসবে তো রেনফিল্ডের? যদি আসে, কি শুনতে পাব ওর মুখ থেকে?

ধীরে, অতি ধীরে শ্বাস ফেলছে রেনফিল্ড। যে-কোন মুহূর্তে থেমে যেতে পারে বুকের ওই মৃদু উত্থান পতন। এক সময় শেষ হল অপারেশন। অত্যন্ত নিপুণভাবে কাজ শেষ করেছেন প্রফেসর। কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেশ জোরে জোরে শ্বাস ফেলল রেনফিল্ড, তারপরই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসতে থাকল ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। বার কয়েক চোখের পাতা মিট'মিট করে আস্তে করে চোখ মেলল রেনফিল্ড। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি আমি, প্রফেসর। বুঝতে পারছি নির্মম বাস্তবে পরিণত হয়েছে স্বপ্ন। তা আমার আয়ু আর কতক্ষণ আছে, প্রফেসর?'

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শান্ত ভাবে বললেন প্রফেসর, 'দুঃস্বপ্নের কথাটা আমাকে খুলে বলবে কি, রেনফিল্ড?'

'বলব। আগে আমাকে একটু পানি খাওয়ান। তৃষ্ণায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা।'

আমি মরিসের দিকে চাইতেই আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে একছুটে গিয়ে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল জোগাড় করে আনল সে। একটা গ্লাসে পানি ঢেলে তাতে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে রেনফিল্ডের হাঁ করা দু'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে ঢেলে দিলাম। ওটুকু খাওয়ার পর সামান্য একটু যেন চাঙ্গা মনে হল রেনফিল্ডকে। বার দু'য়েক ঢোক গিলে মৃদু স্বরে কথা বলতে শুরু করল সে, 'আসলে স্বপ্ন দেখিনি প্রফেসর, এক ভয়াবহ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমি একটু আগে। আমি জানি, সময় ফুরিয়ে এসেছে আমার। কিন্তু সব বলে যাব আপনাদের।' এ পর্যন্ত বলে আর একবার পানি খেতে চাইল রেনফিল্ড। পানি খেয়ে আবার বলতে শুরু করল সে, 'ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ নেকড়ের ক্রুদ্ধ গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে ঠাহর করার চেষ্টা করলাম কোন্ দিক থেকে আসছে ওই গর্জন,' বলেই একটু থামল রেনফিল্ড। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

গভীর আগ্রহের সাথে রেনফিল্ডের কথা শুনছিলেন প্রফেসর। রেনফিল্ড চুপ করতেই ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন তিনি, 'বলে যাও, তারপর?'

'কি যেন বলছিলাম?'

'নেকড়ের গর্জন।'

'হ্যাঁ, নেকড়ের গর্জন। প্রথমে অবাক হলেও কয়েক মুহূর্ত পরেই বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, গাঢ় কুয়াশায় নিজেকে ঢেকে নিয়ে আমার জানালার ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এর আগেও বহুবার

বহুরূপে আমার সামনে এসেছেন তিনি, কিন্তু আজ একেবারে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছে তাঁর চোখ দুটো। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন তিনি। চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তার ঝকঝকে সাদা তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। আমার ঘরে ঢুকতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল আজ জানালা না খোলাই উচিত। খুললেই হয়ত ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে।' আবার থামল রেনফিল্ড। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল সে, 'প্রায়ই আমার জন্যে খাবার পাঠাতেন তিনি। বড় বড় নীল রঙের মাছি পাঠাতেন, নীলকান্ত মণির মত ঝিকমিক করত ওদের ডানা আর পিঠ। আর পাঠাতেন সুপুষ্ট মাকড়সা, পতঙ্গ। যাদের পিঠে আঁকা থাকত করোটির চিহ্ন। আজ তিনি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, আজ তোমার জন্যে কি পাঠাব জানো? ইঁদুর। হাজার হাজার জ্যান্ত ইঁদুর। টকটকে লাল তাজা রক্ত বইছে ওগুলোর ধমনীতে।

'তাঁর কথায় হাসলাম আমি, কিন্তু জানালা খুললাম না। আসলে দেখতে চাইছিলাম তাঁর ক্ষমতা কতটুকু। ঠিক এই সময় আবার একসঙ্গে ডেকে উঠল হাজার হাজার নেকড়ে। ধীরে ধীরে একরাশ জমাট কুয়াশা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সামনের মাঠটায়। সেই কুয়াশার ভেতর বিদ্যুৎ চমকের মত ছুটে বেড়াতে লাগল একটা আলোর শিখা। একসময় সরে গেল কুয়াশা। তখনই চোখে পড়ল ওগুলো। হাজার হাজার ইঁদুর। মাঠ পেরিয়ে পিলপিল করে এগিয়ে আসছে আমার জানালার দিকে। আবার এসে দাঁড়ালেন তিনি জানালার সামনে। হেসে বললেন, সব তোমার জন্যে। আর শুধু আজ নয়, আমার উপাসনা করলে হাজার হাজার বছর ধরে এভাবে তোমাকে কৃতার্থ করে যাব আমি।

'ধীরে, অতি ধীরে জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম আমি, কিন্তু জানালা খুললাম না। শুধু তাঁর জ্বলজ্বলে লাল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ মনে হল, তাইতো, জানালা খুলছি না কেন? এতদিন ধরে কি শুধু এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করিনি আমি? কথাটা মনে হতেই আস্তে করে হাত বাড়িয়ে খুলে দিলাম জানালা। পরম শ্রদ্ধা ভরে মাথা নিচু করে তাঁকে আহ্বান জানালাম, আসুন, প্রভু, ভেতরে আসুন।

'চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ইঁদুরগুলো। একটা দমকা হাওয়ার মত ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি,' আবার চুপ করে গেল রেনফিল্ড। বার কয়েক জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে মৃদু কণ্ঠে পানি চাইল সে। তাড়াতাড়ি তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে ব্র্যাণ্ডি মেশান পানি ঢেলে দিলাম আমি। তার অবস্থা দেখে মনে হল যে-কোন মুহূর্তে আবার জ্ঞান হারাতে পারে সে। এখন জ্ঞান হারিয়ে ফেললে ওর কথা আর শোনা

হবে না, এই ভয়ে আগের কথার খেই ধরিয়ে দিতে গেলাম আমি। বাধা দিয়ে আমাকে ফিসফিস করে বললেন প্রফেসর, 'না, না, জন, জোর করে এখন কিছু বলিও না ওকে দিয়ে। তাহলে হয়ত স্মৃতি শক্তিই গোলমাল হয়ে যেতে পারে ওর।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেই একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল রেনফিল্ড, 'আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলজ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গী চাও, রেনফিল্ড, মেয়ে সঙ্গী? কে না চায়? ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম আমি।

'হঠাৎ কিসের গন্ধ পেয়েই বোধহয় কুকুরের মত সারা ঘরে শুঁকে বেড়াতে লাগলেন তিনি। তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আরে, এ ঘরে তো ঘুরে গেছে দেখছি তোমার সঙ্গিনী।

'তাঁর কথা শুনে বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা। গত কয়েক মাসে মাত্র একজন মেয়ে মানুষ একবার এ ঘরে প্রবেশ করেছেন, মিসেস হারকার। বুঝলাম মিনা হারকারকে আমার সঙ্গিনী রূপে পাঠাতে চান তিনি। কি করে পাঠাবেন তাও বুঝে ফেললাম। মিসেস হারকারকে আগে জীবন-মৃতাতে পরিণত করবেন তিনি, কারণ সম্পূর্ণ জীবিতাবস্থায় স্বামী ফেলে আমার কাছে মিসেস হারকার আসবেন এটা গাধার শিং গজানোর মতই অসম্ভব। তারপর মিসেস হারকারকে দিয়ে জীবন-মৃত করারেন আমাকে। এবং শুধু এভাবেই মিসেস হারকার আর আমার মিলন হতে পারে। চোখের সামনে মিসেস হারকারের সুন্দর নিষ্পাপ মুখটা ভেসে উঠল। মনে পড়ল কেমন মমতা ভরে আমার সাথে আলাপ করে গেছেন তিনি।

'শয়তানের সাধনা করেছিলাম শুধু ক্ষমতার লোভে, নিষ্পাপ মানুষের চরম সর্বনাশের কারণ হবার জন্যে নয়। আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম তাকে, আপনি কি মিসেস হারকারের কথা বলছেন?'

'চমৎকার, বুঝতে পেরেছ দেখছি। হ্যাঁ, আমার সহকারী হবার যোগ্যতা তোমার আছে,' খুশি হলেন তিনি।

'কিন্তু মিসেস হারকারকে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাই না আমি, নিজেকে জীবন-মৃততে পরিণত করতেও আপত্তি আছে আমার।'

'কি বললে?' মুহূর্তে হাসি হাসি ভাবটা মুছে গেল তাঁর মুখ থেকে। দ্বিগুণ হিংস্রতায় জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল তাঁর চোখ দুটো,' আবার চুপ করল রেনফিল্ড। ঘড় ঘড় আওয়াজ হচ্ছে ওর বুকের ভেতর। বুঝলাম, সময় শেষ হয়ে এসেছে রেনফিল্ডের।

আর একটু ব্র্যাণ্ডি মেশান পানি ঢেলে দিলাম রেনফিল্ডের হাঁ করা মুখে।

যেভাবেই হোক আর একটুক্ষণ টিকিয়ে রাখতে হবে ওকে। শুনতে হবে ওর কাহিনী। মিসেস হারকারের নাম শোনা মাত্র ধক্ করে উঠেছিল আমার বুকের ভেতর। বুঝতে পারছি চরম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে ওঁর মাথার ওপর। রেনফিল্ডের কাহিনীর শেষাংশ না শুনতে পারলে বোঝা যাবে না কিভাবে মিসেস হারকারের ওপর চড়াও হবে পিশাচ ড্রাকুলা।

আস্তে আস্তে আবার বলতে শুরু করল রেনফিল্ড, 'আমি তার কথায় প্রতিবাদ করায় দারুণ খেপে গিয়ে সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন তিনি। মাঝে মাঝে আমার দিকে এমন ভাবে চাইতে লাগলেন যেন আমি একটা ঘৃণ্য কীট। উনি ক্ষমতাশালী ঠিক, কিন্তু আমিও তো একেবারে অকেজো নই। সাধনা করে করে আমিও তো মোটামুটি ক্ষমতা অর্জন করেছি। তাহলে, শুধু আমার স্বপক্ষে একটা কথা বলতেই তিনি অমন ভাব দেখাবেন কেন? আমি তাঁর সাধনা করেছি, এক আধটা ভুল করে ফেললেও তো আমাকে তাঁর ক্ষমা করা উচিত। আজ বুঝতে পারছি, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে শয়তানের পূজা করা কত বড় ভুল, কত বড় অপরাধ।

'কথাটা বুঝতে পেরেই মনে মনে বার বার ডাকতে লাগলাম ঈশ্বরকে। আমার কৃত অপরাধের জন্য মাফ চাইলাম তাঁর কাছে। ওদিকে শয়তানটার ঔদ্ধত্য ক্রমশঃ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেখে আগুন ধরে গেল আমার মাথায়। আর সহ্য করতে না পেরে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। দু'হাতে জাপটে ধরলাম শয়তানটাকে। পারি আর না পারি, এতে আগের ভুলের কিছুটাও যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় তো ক্ষতি কি?

'আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল শয়তানটা। কিন্তু পারল না। বহু ভাবে চেষ্টা করেও আমার হাত থেকে ছাড়া না পেয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। ভাবলাম বুঝি জয়ী হতে চলেছি আমি। আমার ওপর যে অবজ্ঞা সে দেখিয়েছে ঠিক সেটাই ফিরিয়ে দেবার জন্যে থুথু ছিটিয়ে দিলাম তার মুখে, এবং দিয়েই বুঝলাম চরম ভুল করেছি। থুথু ছিটাতে গিয়েই তার চোখের দিকে চোখ পড়ল আমার। সাথে সাথে পৈশাচিক ক্ষমতায় আমার মত অলৌকিক ক্ষমতার শক্তিধর লোককেও সম্মোহিত করে ফেলল সে। সম্মোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক ভাবে ক্ষমতা হারালাম আমি। এই সুযোগে আমার বাহুপাশ থেকে বেরিয়ে এল শয়তানটা। পরমুহূর্তে আমাকে দু'হাতে চেপে ধরে এক ঝটকায় মাথার ওপর তুলে প্রচণ্ড এক আছাড় মারল সে। মনে হল একটা পাহাড় ভেঙে পড়ল আমার ওপর। জ্ঞান হারাবার আগের মুহূর্তে শুনলাম হাজারো নেকড়ের সম্মিলিত ক্রুদ্ধ গর্জন,' বলে কয়েকবার খুব জোরে টেনে টেনে শ্বাস নিল রেনফিল্ড। শ্বাস নেবার সময় সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গেল তার বুকের ঘড় ঘড়

আওয়াজ। তারপর অতি কষ্টে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনাকে মিসেস হারকারের সম্পর্কে আগেই হুঁশিয়ার করেছিলাম, ডাক্তার, কিন্তু আমার কথা শোনেননি...' বলেই চুপ করে গেল সে। তাড়াতাড়ি তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে একটু পানি ঢেলে দিলাম। কিন্তু সেটুকু গিলতে পারল না রেনফিল্ড, গড়িয়ে পড়ে গেল কষা বেয়ে।

রেনফিল্ড মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন প্রফেসর। বললেন, 'ও তোমাকে মিনা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছিল, কথাটা বলনি কেন আমাকে?'

'আমি, আমি স্যার ওটাকে পাগলের প্রলাপ বলে ভেবেছিলাম,' আমতা আমতা করে জবাব দিলাম।

'হুঁহ্!' বলে একলাফে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। আমাদের কারও দিকে আর একবারও না তাকিয়ে ছুটে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমরাও ছুটলাম তাঁর পিছু পিছু। বাড়ি পৌঁছে সোজা মিসেস হারকারের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর। ঠেলা দিতেই খুলে গেল ঘরের দরজা। খিল দেয়া হয়নি, শুধু ভিড়িয়ে রাখা হয়েছিল দরজার কপাট। প্রায় একসাথেই ঘরে ঢুকলাম আমরা চারজনে। মিসেস হারকারের বিছানার দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আতঙ্কে খাড়া হয়ে উঠল গায়ের রোম, মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল হিমেল শিহরণ।

চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন মিসেস হারকার। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সেই বিছানার ওপর। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তার গলার ওপর ঝুঁকে আছে কালো আলখেল্লা পরা, ও কে? মিসেস হারকারের হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে বাঁ হাতে ধরে রেখেছে, আর নিজের মুখটা ভালমত মিসেস হারকারের গলার কাছে ঠেকানোর জন্যে ডান হাত দিয়ে তার ঘাড় চেপে সামান্য একটু ওপরে তুলে ধরেছে মূর্তিটা।

আমাদের পায়ের শব্দে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল কালো আলখেল্লা পরা মূর্তিটা। সাথে সাথেই আতঙ্কিত গলায় ফিসফিস করে বললেন মিস্টার হারকার, 'কাউন্ট, কাউন্ট ড্রাকুলা!'

ঘরের ভেতর আমাদেরকে দেখে রাগে আগুনের শিখার মত দপ্ করে জ্বলে উঠল কাউন্টের দুই চোখ। প্রচণ্ড আক্রোশে দু'ঠোঁটের কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছে তার ঝকঝকে সাদা দাঁত দুটো। শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠল পিশাচ কাউন্ট, পরক্ষণেই তেড়ে এল আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কোটের দুই পকেট থেকে ঝটকা মেরে বেরিয়ে এল প্রফেসরের দুই হাত। বাঁ হাতে ঝকঝক করে উঠল একটা ছোট্ট সোনার ক্রুশ, সেটা কাউন্টের দিকে উঁচিয়ে

ধরলেন তিনি, যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাউন্ট। সেখান থেকেই রুদ্ধ আক্রোশে দাঁত খিঁচাতে থাকল আমাদের উদ্দেশ্যে। বিড়বিড় করে কি যেন পড়লেন প্রফেসর—বোধহয় বাইবেলের পবিত্র শ্লোক, তারপরই ডান হাতের জিনিসটা ছুঁড়ে দিলেন কাউন্টের দিকে। বিস্কুটের মত জিনিসটা দেখেই বুঝলাম—ধুনো।

সঙ্গে সঙ্গে অমানুষিক আর্তনাদ করে উঠে পিছিয়ে গেল কাউন্ট। পরমুহূর্তেই কুয়াশার রূপ নিতে শুরু করল সে। কয়েক সেকেণ্ডেই গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে গেল একটু আগে কাউন্ট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানটা। ওই গাঢ় কুয়াশার ভেতর ছুটে বেড়াচ্ছে দুটো জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলজ্বলে লাল চোখ। এ বীভৎসতা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। ধীরে ধীরে জানালা গলে বেরিয়ে যেতে লাগল কুয়াশার স্তর। কুয়াশার স্তরের পেছনের অংশে যেন ঝুলে থেকে বেরিয়ে গেল চোখ দুটোও। সঙ্গে সঙ্গে একবারের জন্যে শোনা গেল হাজার হাজার নেকড়ের সম্মিলিত ক্রুদ্ধ হিংস্র গর্জন।

চোখের সামনে থেকে বিভীষিকাটা দূর হয়ে যেতেই মিসেস হারকারের বিছানার কাছে ছুটে গেলেন প্রফেসর। ওর গলার ক্ষত দুটোতে হালকা ভাবে আঙুল বোলাতে বোলাতে আস্তে করে ডাকলেন মিসেস হারকারকে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন মিসেস হারকার। আমাদের সবাইকে ওর বিছানার পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত রাতে আপনারা এখানে কেন?'

'দুর্ঘটনায় মারা গেছে রেনফিল্ড। সবাই আমরা সেখান থেকেই আসছি। ভাবলাম, তুমি যখন রেনফিল্ডের সম্পর্কে আগ্রহী, তোমাকে খবরটা এখনই জানাই,' আসল কথা মিসেস হারকারের কাছে ভাঙলেন না প্রফেসর।

'আ-হা-হা। তাই নাকি? মরে বেঁচেছে তাহলে লোকটা। আসলে পাগল হলেও সত্যিই ভাল ছিল রেনফিল্ড। ওর অকস্মাৎ মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ হচ্ছে আমার,' বলতেই গলার কাছে হাত দিলেন মিসেস হারকার। ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে ব্যথা লাগতেই বললেন, 'উহ! আমার এখানটায় এত ব্যথা করছে কেন? আজ শরীরটাও এত দুর্বল লাগছে কেন?'

'ও কিছু না। বোধহয় পিঁপড়ে কামড়েছে গলায়। আর বেশি রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে অমন দুর্বল লাগে সবারই। হয়েছে, ঘুমাও এখন। ভোর হতে দেরি আছে এখনও।' বলে মিস্টার হারকারের দিকে ফিরে ফিসফিসিয়ে বললেন প্রফেসর, 'খবরদার, রাতের বেলা মিসেস হারকারকে একা ফেলে আর যাবে না কোথাও। যাও এখন ওর পাশে শুয়ে পড়গে। আর এই নাও, এটা ওর বালিশের নিচে রেখে

দিও,' বলে আর একটুকরো ধুনো মিস্টার হারকারের দিকে এগিয়ে দিলেন প্রফেসর।

'আজ সকালেই মিনার চেহারা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল আমার, প্রফেসর। কিন্তু তখন তেমন গুরুত্ব দিইনি,' বললেন মিস্টার হারকার।

'তোমাদের এই গুরুত্ব না দেয়াটা কতবড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় বুঝতে পারছো তো এখন? তোমাদের সবাইকে বলছি,' আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন প্রফেসর। 'এখন থেকে যত সামান্যই হোক, কোন কিছু সন্দেহ হলেই আমাকে জানাবে। বুঝেছ?'

ঘাড় কাত করে আমরা সাড়া দিলাম সবাই।

মিস্টার হারকারকে মিসেসের কাছে রেখে বেরিয়ে এলাম আমরা তিনজনে। বাইরে বেরিয়ে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, মিসেস হারকারকে না জাগালেও তো পারতেন?'

'পারতাম, কিন্তু লুসির কথা ভুলে গেছ? পিশাচের দ্বারা সম্মোহিত হয়ে মারা গিয়ে পিশাচিনীতে পরিণত হয়েছিল সে। মিসেস হারকারের বেলায়ও তা ঘটতে পারত। তাই তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে সম্মোহনমুক্ত করে দিলাম। এখন ঈশ্বর না করুন, আরেকবার পিশাচের দ্বারা সম্মোহিত হবার আগে মারা গেলে আর পিশাচিনীতে পরিণত হবে না মিনা।'

প্রফেসরের অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির তারিফ করলাম মনে মনে। আরেকবার ওই অসাধারণ প্রতিভাবান লোকটার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল আমার।

বার

জোনাথন হারকারের ডায়েরী থেকে

৩ অক্টোবর।

সকালবেলা আবার আমাদের জরুরী বৈঠক বসলো ডাক্তার সেওয়ার্ডের পড়ার ঘরে। আলোচ্য বিষয়—কাউন্ট ড্রাকুলা। প্রফেসর বললেন, 'আজ সূর্যাস্তের আগে যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে শয়তানটাকে। পঞ্চাশটা বাক্সের সব কটা খুঁজে বের করে খুলে খুলে দেখতে হবে। এমন ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে নিজেদের যেন কাউন্ট ড্রাকুলাকে খুঁজে পাওয়া মাত্র হত্যা করতে পারি তাকে,' একে একে সবার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। 'কারও কোন আপত্তি আছে?'

'না, নেই,' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন মিস্টার মরিস। 'ওই কাউন্ট

হারামজাদাকে খুন করা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোন ইচ্ছেই নেই আমার।'

মৃদু হেসে বললেন প্রফেসর, 'আসলে তোমার মুখ থেকে এই জবাবই আশা করছিলাম আমি, মরিস।'

'চার-চারটে জায়গায় হানা দিয়ে আজকের মধ্যে পঞ্চাশটা বাক্স পরীক্ষা করা সম্ভব, স্যার?' মৃদু প্রতিবাদ জানালাম আমি।

'একেবারে অসম্ভব না হলেও সহজ নয় কাজটা। দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে আমাদের। মরিস আর আর্থার থাকবে এক দলে, অন্য দলে থাকব আমি, তুমি আর জন। ওরা দু'জন হানা দেবে মাইল অ্যাণ্ড নিউ টাউনের একশ সাতানব্বই নম্বর চিকস্যাণ্ড লেন আর ব্রেমণ্ডসের জ্যামাইকা লেনে। আমরা খুঁজব কারফাক্স আর পিকাডিলির পুরানো গির্জায়। আর্থার আর মরিসের খোঁজার জায়গা দুটোর ওপর তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না আমি, কিন্তু তবু একবার দেখা উচিত। মরিস, তোমাদের কাজ হবে বাক্সের ডালাগুলো খুলে ভেতরটা দেখা। ভেতরে কাউন্ট না থাকলে সেখানে একটুকরো করে ধুনো রেখে আবার বন্ধ করে দেবে ডালা।'

'আর থাকলে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মরিস।

'যেভাবে লুসির জীবন-মৃত আত্মাটাকে হত্যা করেছি, অবিকল তেমনি ভাবেই তাকে হত্যা করবে। এবং কাজটা করার ভার দিচ্ছি আমি তোমাকে,' উত্তর দিলেন প্রফেসর।

'তাহলে, এখুনি এই মুহূর্তে ঈশ্বরের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চাই আমি।'

'এসো, ঈশ্বর সহায় থাকুন তোমাদের।'

লর্ড গোডালমিং আর মিস্টার মরিস বেরিয়ে যাবার পর আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই হানা দিলাম কারফাক্সের বিশাল পুরানো গির্জাটায়। আজ আমরা তৈরি হয়েই এসেছি, কাজেই গির্জায় ঢুকতে বাধা দিতে পারল না আমাদের দারোয়ান। টমাস স্নেলিং-এর কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে তার প্রতিনিধি হয়ে এসেছি আমি। অবশ্যই মিছে কথা বলে অনেক কষ্টে রাজি করান গেছে টমাস স্নেলিংকে।

বাক্সগুলো যেখানটায় পড়ে আছে সেখানে দিনরাতের কোনো ভেদাভেদ নেই। সেদিন রাতের মতই আজ দিনের বেলায়ও মোমবাতি জ্বেলেই কাজ করতে হল আমাদের। ব্যাগ থেকে বড় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে মাটি ভর্তি সেই বিশাল বাক্সের ডালাগুলো খুলে ফেললেন প্রফেসর। প্রত্যেকটা বাক্সের ভেতরই একবার করে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে একটুকরো করে ধুনো ভেঙে ফেললেন ভেতরে, তারপর আবার বন্ধ করে দিলেন ডালাগুলো। উনত্রিশটা বাক্সই খুঁজে দেখলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না পিশাচটাকে।

গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন প্রফেসর, 'হারামজাদা টের পেয়ে গেছে আমরা পিছু লেগেছি ওর, তাই পালিয়েছে। চলো, দেরি না করে পিকাডিলির পরিত্যক্ত গির্জাটায় হানা দিই।'

ফেনচার্চ স্ট্রীটে পৌছে হঠাৎ আমাকে বললেন প্রফেসর, 'গ্রীন পার্ক থেকে একজন চাবির কারিগর ডেকে নিলে কেমন হয়? বলা তো যায় না। গির্জার সদর দরজায় তালা মারাও থাকতে পারে।'

'লাগবে না, প্রফেসর,' বললাম আমি। 'সেদিনই ওই গির্জার আশপাশটা ভালমত দেখে গেছি আমি। আস্তাবলের সামনের জানালাটায় গরাদ নেই। অনায়াসে ওই জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারব আমরা।'

'বেশ, চলো তাহলে, লোক যত কম জানাজানি হয় ততই মঙ্গল,' আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন প্রফেসর।

এখান থেকে একটা ঘোড়া গাড়ি নিয়ে পিকাডিলি সার্কাস পর্যন্ত এলাম আমরা, তারপর পায়ে হেঁটে দুপুরের একটু পর এসে দাঁড়ালাম পরিত্যক্ত গির্জাটার সামনে। আশপাশটা অত্যন্ত নির্জন। ঘুরে গিয়ে পেছনে আস্তাবলটার কাছে পৌছে জানালা টপকে একে একে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। নিচের হল ঘরটায় পৌছতেই একটা ভ্যাপসা পচা দুর্গন্ধ এসে লাগল নাকে। ওই গন্ধের সাথে আমি ভালভাবেই পরিচিত, কাউন্ট ড্রাকুলার গায়ের গন্ধ ওটা। বুঝলাম, অতি সম্প্রতি এই হলঘরটা ব্যবহার করছে শয়তানটা। বিরাট হল ঘরের শেষ প্রান্তে পড়ে আছে কাঠের বাক্সগুলো। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ডালা খোলায় মন দিলেন প্রফেসর। কিন্তু এখানেও পাওয়া গেল না কাউন্টকে। টমাস স্নেলিং-এর হিসেব মত এখানে মোট ন'টা বাক্স থাকার কথা, কিন্তু গুণে দেখলাম আটটা আছে, আর একটা কোথায় গেল? গির্জার সব কটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না বাক্সটা। অর্থাৎ এখান থেকেও পালিয়েছে কাউন্ট ড্রাকুলা, একেবারে বাক্স সহ।

কঠিন গলায় আমাদের সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করলেন প্রফেসর, 'কাউন্ট ড্রাকুলা, আমার হাত থেকে পার পাবে না তুমি, শত শত নিরপরাধ প্রাণোচ্ছল যুবক যুবতী আর মিনার মুখ চেয়ে যেভাবে হোক তোমাকে খুঁজে বের করবই আমি।'

সন্ধ্যার পর ডাক্তার সেওয়ার্ডের বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম আমাদের আগেই ফিরে এসেছেন মিস্টার মরিস আর লর্ড গোডালমিং। তাঁরাও খুঁজে পাননি কাউন্ট ড্রাকুলাকে; তবে জায়গা মতই পেয়েছেন বারটা বাক্স। অর্থাৎ সত্যিই একটা বাক্স উধাও।

৪ অক্টোবর সকাল।

সারা দিনের খাটুনির পর গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ মিনার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে, মিনা?'

'প্রফেসরকে একবার ডেকে নিয়ে এসো না, জলদি,' উত্তেজিত গলায় আমাকে অনুরোধ করল মিনা।

'ব্যাপার কি? হঠাৎ প্রফেসরের দরকার পড়ল কেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'একটু আগে এসেছিল ও। কিন্তু প্রফেসরের দেয়া ক্রুশটার জন্যে আমার কাছে আসতে পারেনি। দূর থেকেই অবশ্য সম্মোহিত করার চেষ্টা করছিল আমাকে, কিন্তু খুব একটা কার্যকরী হতে পারছিল না। কাল বলে দিয়েছেন প্রফেসর, যদি পিশাচটা এসে আমাকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করে, আর আমি বুঝতে পারি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর কাছে খবর পাঠাই। জলদি যাও না, প্লিজ।'

'যাচ্ছি,' বলে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে স্যাণ্ডেল জোড়া পায়ে গলাতে গলাতে ছুটলাম। বারান্দায় বেরিয়েই প্রায় ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলাম, 'আরে মিস্টার মরিস, আপনি এখানে? এই রাতের বেলা?'

'সারারাত বাড়ির আনাচে কানাচে পাহারা দেবার ভার পড়েছে আমার ওপর। অবশ্যই ভার দিয়েছেন প্রফেসর। কিন্তু আপনি এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?'

'প্রফেসরকে ডেকে আনতে।'

'কেন? মিসেসের কিছু হয়েছে নাকি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ মিস্টার মরিসের।

'না, তেমন কিছু নয়। একটু আগে নাকি কাউন্ট ড্রাকুলা এসে তাকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করেছিল।'

'তাই নাকি? কিন্তু মিসেসকে একা ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না আপনার। আপনি ঘরে যান। এক্ষুণি ডেকে আনছি আমি প্রফেসরকে,' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটলেন মিস্টার মরিস।

ঘরে ফিরে এলাম। সারাটা রাত জেগে থেকে আমাদেরকে পাহারা দিয়েছেন মিস্টার মরিস। কথাটা ভাবতেই কেমন যেন লজ্জা লাগল আমার। আর আমাদের কথা এতটা ভাবেন প্রফেসর, ভেবে তাঁর প্রতি জাগল গভীর শ্রদ্ধা। দু'মিনিট পরেই মিস্টার মরিসকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর। হাসতে হাসতে মিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার মা? অসময়ে এ বুড়ো ছেলেকে এত জরুরী তলব কেন?'

'ড্রাকুলা এসেছিল, প্রফেসর। আমাকে সম্মোহিত করার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। আমি টের পেয়ে গেছি সাথে সাথেই।'

'ভেরি গুড। হারামজাদাটাকে পেয়েছি এতদিনে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তো মা। হ্যাঁ, আর আমার চোখের দিকে তাকাও।' মিনা প্রফেসরের চোখে চোখ রাখতেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে দু'হাতের তালু মাথার দু'পাশ থেকে একশ আশি ডিগ্রী কোণ করে কোমর পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনলেন তিনি কয়েকবার। ধীরে ধীরে অর্ধমুদিত হয়ে এল মিনার চোখের পাতা, ভারি হয়ে উঠল শ্বাস-প্রশ্বাস। মিনার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ইঙ্গিতে মিস্টার মরিসকে কাছে ডাকলেন প্রফেসর। মিস্টার মরিস এগিয়ে যেতেই ফিসফিস করে তাকে লর্ড গোডালমিং আর ডাক্তার সেওয়ার্ডকে ডেকে নিয়ে আসতে বললেন। একটু পরই এসে হাজির হল ওরা।

মিনার বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে অনেকটা ফিসফিসিয়ে অদ্ভুত কণ্ঠে ডাকলেন প্রফেসর, 'মিনা, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?'

যেন স্বপ্নের ওপার থেকে জবাব এল, 'হ্যাঁ, প্রফেসর।'

'কোথায় এখন তুমি?'

'জানি না।'

ধমকে উঠলেন প্রফেসর, 'বল কোথায়?'

'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। অচেনা লাগছে সব কিছু।'

'কি দেখতে পাচ্ছ?'

'কিচ্ছু না। কেবল অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার চারদিকে।'

'আলো নেই কোথাও?'

'না।'

'কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি?'

'পানির অস্পষ্ট কলকল, কোন কিছুর গায়ে ঢেউয়ের চাপড় মারার মৃদু ছল ছলাৎ শব্দ।'

'সবই অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ কোন খোলের মধ্যে আছ এখন তুমি?'

'হ্যাঁ।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রফেসর ছাড়া একে অন্যের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করলাম

আমরা সবাই। ওদিকে প্রশ্ন করেই চলেছেন প্রফেসর, 'আর কি শুনতে পাচ্ছ?'

'তেমন কিছু না।'

'তবু?'

'ব্যস্ত সব মানুষের পায়ের শব্দ, নোঙরের গায়ে লোহার শেকল জড়ানোর একটানা বিশ্রী ঘড় ঘড় আওয়াজ।'

'এ সমস্ত শব্দও অস্পষ্ট?'

'হ্যাঁ।'

'কি করছ তুমি এখন?'

'শুয়ে আছি। মৃত্যুর মত নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছি। মনে হচ্ছে কবরে...' হঠাৎ এই সময় বাইরে কোথাও মোরগ ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই যেন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল মিনা। মনে হচ্ছে শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর। চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'জলদি, জলদি আমার চোখের দিকে তাকাও, মিনা হ্যাঁ, হয়েছে। এবার ফিরে এস তুমি আমাদের পৃথিবীতে। হ্যাঁ, এস এস। শুধু তুমি, একা। এসো। এসো।'

আস্তে করে চোখের পাতা সম্পূর্ণ খুলল মিনা। আমাদের সবাইকে ওর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্রফেসর, আপনারা সব কি করছেন এখানে? আমার দিকে অবাক হয়ে অমন তাকিয়ে...' বলতে গিয়েই হঠাৎ থেমে গিয়ে শব্দ করে হাসল মিনা। 'ওহ্ হো, ভুলেই গিয়েছিলাম, আমাকে সম্মোহিত করেছিলেন আপনি। তা কিছু জানতে পারলেন, প্রফেসর?'

'পেরেছি, আমরা সবাই,' উত্তর দিলেন মিস্টার মরিস। একটু আগে মিনার মুখ থেকে বেরোনো কথার সুর নকল করে বললেন তিনি, 'আপনি এখন খোলের মধ্যে।'

মিস্টার মরিসের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম আমরা সবাই। বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল মিনা। হাসির বেগ একটু প্রশমিত হয়ে এলে মিনাকে সব কথা বললেন প্রফেসর।

প্রফেসরের কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'তাহলে কোন নৌকা বা জাহাজের খোলের মধ্যে আছে এখন কাউন্ট ড্রাকুলা?'

'হ্যাঁ। এবং উধাও হওয়া বাক্সটার ভেতরে।'

'অর্থাৎ লণ্ডন ছেড়ে পালাচ্ছে সে?'

'হ্যাঁ, পালাচ্ছে।

'তাহলে তো এখুনি বাক্সটা খুঁজতে বেরিয়ে পড়া উচিত আমাদের,' উত্তেজিত

ভাবে বললেন মিস্টার মরিস।

'অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মরিস,' ওর তাড়াতাড়ি দেখে হেসে ফেলে বললেন প্রফেসর। 'যেটুকু বুঝতে পারছি—জাহাজটা এখনো কোনও বন্দরে নোঙর করা অবস্থাতেই আছে। এখন প্রথমে আমাদের জানতে হবে বিরাট মাটি ভর্তি বাক্স নিয়ে ট্রানসিলভেনিয়ার দিকে রওনা হচ্ছে কোন্ জাহাজটা।'

ট্রানসিলভেনিয়ার নাম শুনেই ধক্ করে উঠল আমার হৃৎপিণ্ডটা। বললাম, 'তাহলে আবার নিজের দুর্গে ফিরে যাচ্ছে পিশাচ কাউন্ট ড্রাকুলা?'

'হ্যাঁ, উত্তর দিলেন প্রফেসর। 'এবং সেখানে পৌছতে পারার আগেই ওকে শেষ করতে হবে আমাদের। একবার নিজের প্রাসাদে পৌছে গেলে আর ওকে খুঁজে বের করা যাবে না সহজে।'

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

৭ অক্টোবর।

আজ সকালে আবার জরুরী বৈঠক বসল আমাদের। কেমন করে, কোন্‌পথে কোন্ জাহাজে পালাচ্ছে কাউন্ট ড্রাকুলা, এক এক করে আমাদের সব শোনালেন প্রফেসর। গত কয়েকদিন ধরেই এ সব খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। মিস্টার মরিসের এক প্রশ্নের জবাবে বললেন তিনি, ট্রানসিলভেনিয়ার দিকে রওনা দেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না শয়তানটার। আন্দাজ করলাম যেপথে এসেছিল সেপথেই ফিরে যাবে সে। হয় দানিয়ুব মাউথ দিয়ে, নয় কৃষ্ণ সাগর পার হয়ে। এই আন্দাজের ওপর ভিত্তি করেই বন্দরে খোঁজ নিই কোন জাহাজ দানিয়ুব মাউথ কিংবা কৃষ্ণ সাগর পাড়ি দিচ্ছে কিন্তু এভাবে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম না কিছু। শেষ পর্যন্ত আর্থারের একটা কথা বেশ মনে ধরল। সে বলল, গত কয়েক-দিনের পুরানো 'দি টাইমস' পত্রিকা ঘেঁটে দেখলেই হবে, কোন্ জাহাজ, কোত্থেকে যাত্রা করে কোথায় গিয়ে পৌছবে তা জানা যাবে। সাথে সাথেই গত বিশ দিনের 'দি টাইমস' জোগাড় করে খুঁজে দেখতে শুরু করলাম। যা চাইছিলাম, পেয়েও গেলাম শেষ পর্যন্ত। জারিনা ক্যাথেরিন নামে রাশিয়ান জাহাজ ডোলিটিল ওয়ার্ফ থেকে ছেড়ে ভার্না যাবে। জাহাজটা বন্দর ত্যাগ করে গেছে গতকাল। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মাটি বোঝাই একটা বাক্সও বয়ে নিয়ে গেছে জাহাজটা। ভার্না থেকে রিসটিকস নামে একজন লোক ছাড়িয়ে নিতে আসবে বাক্সটা।'

'তাহলে জারিনা ক্যাথেরিনকে কিভাবে ধরা যায় তাই এখন ভেবে দেখতে হবে আমাদের,' বললেন মিস্টার মরিস।

'ভার্না পৌছতে কম করেও তিন সপ্তাহ লাগবে জাহাজটার। স্থলপথে আজ

থেকে দিন দশেক পরে রওনা দিলেও জাহাজটা পৌঁছার আগেই ভার্না পৌঁছে যেতে পারব আমরা।'

'তারপর?' জানতে চাইলেন লর্ড গোডালমিং।

'সুযোগ পেলে সেখানেই হত্যা করব কাউন্টের জীবন-মৃত আত্মাকে। একান্তই যদি সে সুযোগ না পাই তাহলে যেভাবেই হোক অন্তত একটা বুনো গোলাপের ডাল ভরে দেব বাক্সটায়, যেন বাক্স থেকে বেরিয়ে না আসতে পারে পিশাচটা। তারপর কোথায় নেয়া হয় বাক্সটা দেখব। সেটা জানা হয়ে গেলে একসময় না একসময় পিশাচটাকে হত্যার সুযোগ আমরা পাবই।'

এরপর আলোচনা করে ঠিক করা হল কবে ভার্নার উদ্দেশে রওনা দেব। দশ দিন নয়, তার অর্ধেক, অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক পাঁচ দিন পর, অর্থাৎ, ১২ অক্টোবর যাত্রা শুরু হবে আমাদের।

তের

জোনাথন হারকারের ডায়েরী থেকে

১৫ অক্টোবর, ভার্না।

চ্যারিং ক্রস অতিক্রম করলাম আমরা ১২ অক্টোবর সকালে, এবং প্যারীতে এসে পৌঁছুলাম সেদিনই রাতে। আগেই আসন সংরক্ষিত করা ছিল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে, তাই বেশ আরামেই এসেছি সারাটা পথ। ট্রেন থেকে নেমেই তাঁর নামে কোন তারবার্তা এসেছে কিনা বাণিজ্য প্রতিনিধির দফতরে খোঁজ নিয়ে তা জানতে গেছেন লর্ড গোডালমিং। আমরা গিয়ে উঠলাম ওডেসাস হোটেলে।

সমস্ত শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে আবার তার স্বাভাবিক উচ্ছলতায় ফিরে এসেছে মিনা। প্রায়ই ভোরের আগে ওকে সম্মোহন করে কাউন্ট ড্রাকুলার খোঁজ জেনে নেন প্রফেসর। তবে এ পর্যন্ত 'জাহাজের গায়ে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি' ছাড়া আর কিছু বলছে না সে। অর্থাৎ এখনও মাঝ দরিয়ায় রয়েছে জারিনা ক্যাথেরিন।

১২ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত চারদিনে আসা চারটে টেলিগ্রাম নিয়ে একটু পরই হোটেলে ফিরে এলেন লর্ড গোডালমিং। লণ্ডন ছেড়ে আসার আগেই লয়ার্ড জাহাজ কোম্পানীর সাথে বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন তিনি, জারিনা ক্যাথেরিনের খবরাখবর জানিয়ে যেন ওকে রোজ একটা করে টেলিগ্রাম করা হয়। কথা রেখেছে লয়ার্ড কোম্পানী। এ পর্যন্ত পাওয়া চারটে খবরই এক—ভার্নার বন্দরে পৌঁছতে

এখনও দেরি আছে জারিনা ক্যাথেরিনের। জাহাজ বন্দরে না ভেড়া পর্যন্ত কিছুই করার নেই আমাদের। তবে এর ভেতর সহকারী বাণিজ্য দূতের সাথে দেখা করে যেভাবেই হোক তাঁর কাছ থেকে বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখার একটা অনুমতিপত্র নিতে হবে। লর্ড গোডালমিং আশ্বাস দিলেন, কাজটা করতে পারবেন তিনি।

১৬ অক্টোবর।

লয়ার্ড কোম্পানীর তারবার্তায় জানা গেল দারদানেলস অতিক্রম করেছে জারিনা ক্যাথেরিন।

১৭ অক্টোবর।

বাণিজ্য দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাক্সটা খুলে দেখার অনুমতিপত্র জোগাড় করে ফেলেছেন লর্ড গোডালমিং। এমনকি জাহাজটা বন্দরে ভেড়ার আগে আমাদেরকে খবর দেবার ব্যবস্থা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাণিজ্য দূত। আমাদের মধ্যে আলোচনার পর ঠিক হয়েছে, বাক্স খোলার পর কাউন্ট ড্রাকুলাকে পাওয়া গেলেই তাকে হত্যার দায়িত্ব নেবেন প্রফেসর স্বয়ং, এবং ডাক্তার সেওয়ার্ড তাঁর সহকারী। মরিস, লর্ড গোডালমিং আর আমি থাকব পাহারায়। প্রয়োজন মনে করলে আমাদের কাজে বাইরের অনধিকার চর্চাকারীকে আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ঠেকিয়ে রাখব। কারণ এবার সুযোগ হারালে শয়তানটাকে আবার হাতের মুঠোয় পাওয়া সহজ হবে না।

২৪ অক্টোবর।

পুরো এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, এখনো জারিনা ক্যাথেরিনের কোন খবর নেই। অথচ দারদানেলস থেকে ওটার ভার্না পৌঁছতে চব্বিশ ঘন্টাও লাগার কথা নয়।

২৫ অক্টোবর।

আজও কোন খবর নেই। সম্মোহিত অবস্থায় মিনা জানাল, এখনো ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে। অর্থাৎ এখনো দূর সাগরেই রয়ে গেছে জারিনা ক্যাথেরিন।

২৬ অক্টোবর।

লয়ার্ড কোম্পানীর তারবার্তায় জানা গেল জারিনা ক্যাথেরিনের সাথে ওদের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রফেসরের ধারণা, প্রচণ্ড কুয়াশার জন্যে মাঝ সাগরের কোথাও আটকে পড়েছে জাহাজটা।

২৭ অক্টোবর।

খবর নেই আজও। উত্তেজনা আর হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠেছি সবাই। সবচেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন প্রফেসর। তাঁর ধারণা, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে

জারিনা ক্যাথেরিনকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে ড্রাকুলা। এক রাতে বেশ কয়েকবার মিনাকে সম্মোহিত করেও তেমন কিছু জানা যায়নি।

২৮ অক্টোবর।

লয়ার্ড কোম্পানীর তারবার্তায় আজ খোঁজ পাওয়া গেছে জারিনা ক্যাথেরিনের। আজ দুপুর একটায় নাকি গালেজ-এ প্রবেশ করবে জাহাজটা। কিন্তু গালেজ-এ যাবার তো কথা ছিল না ওটার।

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

২৮ অক্টোবর।

জারিনা ক্যাথেরিন গালেজ-এ ঢোকায় খুব একটা অবাক হলাম না, যদিও গালেজ-এ যাবার কথা ছিল না ওটার। আসলে এমনি একটা অভাবনীয় কিছু ঘটার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমরা। খবর শুনে শান্তভাবে মিনাকে বললেন প্রফেসর, 'দেখ তো মা, গালেজ-এ যাবার ট্রেন ক'টায়?'

রেলওয়ে টাইম টেবল-এর পাতা উল্টে দেখে নিয়ে বলল মিনা, 'চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র একটা ট্রেন, রাত একটা ছত্রিশ মিনিটে।'

'ওতেই যাব, জিনিসপত্র গোছগাছ করে নাও তুমি। জোনাথন, টিকিট কাটার ভার তোমার ওপর। আর্থার, জাহাজ দপ্তরের প্রতিনিধির সাথে দেখা করে একটা অনুমতিপত্র নিয়ে আসবে, যাতে গালেজ-এ বাক্সটা পরীক্ষা করে দেখতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়। মরিস, সহকারী বাণিজ্য দূতের সাথে দেখা করে আর একটা অনুমতিপত্র সংগ্রহ করবে তুমি, তাহলে বাক্সটা খুলতে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না আমাদের। জন আর আমি আগামীদিন কি করে কি করব তার একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলছি।'

মিস্টার হারকার, আর্থার আর মরিস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মিসেস হারকারকে বললেন প্রফেসর, 'মিনা, যাও তো মা, জোনাথনের ট্রানসিলভেনিয়া ভ্রমণ কাহিনী লেখা আসল ডায়েরীটা নিয়ে এসো। গালেজ থেকে কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ পর্যন্ত যাবার একটা সংক্ষিপ্ত পথের নকশা বের করে ফেলতে চাই। আর...' সরাসরি মিসেস হারকারের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন প্রফেসর, 'তার সঙ্গে যদি তোমার হাতের তৈরি একটু কফি হয়...।'

'এখুনি যাচ্ছি আমি,' বলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মিসেস হারকার।

উনি চলে যেতেই আমার দিকে ফিরে বললেন প্রফেসর, 'একটা কথা হয়ত তোমাকে পরে বলার সুযোগ নাও পেতে পারি, জন, আগে থেকেই বলে রাখছি, বার বার মিনাকে সম্মোহিত করেছি আমি এবং করেছি রাতের বেলা। ড্রাকুলা জেনে

গেছে যে মিনাকে সম্মোহিত করে আমরা তার খোঁজ নেবার চেষ্টা করছি, আর জানাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ মিনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে সে, আমরাও করছি। তোমার জানা আছে একই দেশে দুই রাজা রাজত্ব করতে পারে না, তেমনি একই জায়গায় দুটো শক্তি প্রয়োগ করলে দুর্বলটা হটে যেতে বাধ্য। কাউন্টের শক্তি আমাদের চাইতে দুর্বল হয়ে পড়েছে মিনার সঙ্গে সঙ্গে রাখা ক্রুশ আর ধুনোর জন্যে। ও দুটোকে দারুণ ভয় পায় কাউন্ট, অথচ আমাদের শক্তির উৎসই হল জিনিস দুটো, সুতরাং ক্ষমতার যুদ্ধে হেরে গিয়ে বুঝে গেছে পিশাচটা আসল ব্যাপার, কি করে আমরা তার খোঁজখবর করছি। তাই নিজেকে বাঁচানোর জন্যে দারদানেলস-এ প্রবেশ করার পর প্রচণ্ড কুয়াশার সৃষ্টি করে জারিনা ক্যাথেরিনের গতিপথ ভুল করিয়ে গালেজ-এ নিয়ে ফেলেছে সে জাহাজটাকে। তাহলে তুরস্কের মধ্যে দিয়ে সহজেই তার এলাকায় ঢুকে যেতে পারবে সে। আর ওর এলাকায় একবার ঢুকে যেতে পারলে অনেক অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়বে পিশাচটা।'

এই সময় কফি আর ডায়েরী বুকটা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন মিসেস হারকার। কফি খেতে খেতে ভবিষ্যৎ প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম আমরা।

২৯ অক্টোবর।

ট্রেনে করে ভার্না থেকে গালেজ-এর দিকে চলেছি আমরা। যার যার ওপর দায়িত্ব দেয়া কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে সন্ধ্যার দিকে আবার আমরা সবাই মিলিত হয়েছিলাম গতকাল, সেই সময়ই একবার মিসেস হারকারকে সম্মোহন করলেন প্রফেসর। মিসেস হারকার বললেন, 'ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। তার বদলে দূরে বহু মানুষের কাটা কাটা কথা শোনা যাচ্ছে। অস্পষ্ট আলোর রেখা চোখে পড়ছে…হঠাৎ এলোমেলো ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে…দূর থেকে ভেসে আসছে এক আধটা নেকড়ের গর্জন…এই সময়ে বেশিক্ষণ মিসেস হারকারকে সম্মোহিত করে রাখলে নতুন কোন পদ্ধতিতে তার ওপর অশুভ প্রভাব ফেলে বসতে পারে কাউন্ট ড্রাকুলা, এই ভয়ে তাড়াতাড়িই তাকে সম্মোহন মুক্ত করে দিলেন প্রফেসর। মিসেস হারকারের ছাড়া ছাড়া কথাগুলোকে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করলেন তিনি, 'এখন নৈশ ভ্রমণে বেরিয়েছে কাউন্ট ড্রাকুলা।'

৩০ অক্টোবর, সকাল।

গালেজ-এর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। এখন সাতটা বাজে। প্রায় তিন ঘন্টা লেট করেছে ট্রেন, নাহলে ভোর চারটায়ই গালেজ-এ পৌছে যাবার কথা। ভোরের আগে একবার মিসেস হারকারকে সম্মোহিত করে জানা গেল, 'আমার চারদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার…কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না…কেবল চাকার একটানা

ঘড় ঘড় শব্দ…চাবুকের শন শন…হ্রেষাধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না… ভীষণ দুলছি…কে যেন জঘন্য ভাষায় গালাগাল দিল একটা…' এর পরই মিসেস হারকারকে সম্মোহন মুক্ত করে দিয়েছিলেন প্রফেসর।

হঠাৎ ধীরে ধীরে কমতে লাগল ট্রেনের গতি। কুলিদের হাঁক-ডাকও অবছা ভাবে কানে এসে বাজছে। তাহলে গালেজ-এ পৌঁছে গেছে ট্রেন।

চোদ্দ

জোনাথন হারকারের ডায়েরী থেকে

৩০ অক্টোবর, সকাল।

মিনাকে মিস্টার মরিসের সাথে আগেই তারযোগে ঠিক করে রাখা হোটেলে পাঠিয়ে দিলাম। লর্ড গোডালমিং চলে গেলেন বাণিজ্য দূতের দফতরে। আর আমরা তিনজনে রওনা দিলাম জাহাজ ঘাটার উদ্দেশে।

সোজা গিয়ে জারিনা ক্যাথেরিনের ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করে বাক্সটার কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন মাটি বোঝাই বিরাট ওই বাক্সটাই শুধু গালেজ-এ নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আর কোন মাল খালাস হবে না এখানে। তিনি আরও জানালেন, গতকাল বিকেলে ১৬নং বার্গেন স্ট্রাসের ইমানুয়েল হিলডেসহিয়েম নামে একজন রুমানিয়ান কাউন্ট ড্রাকুলার উপযুক্ত নির্দেশপত্র দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে বাক্সটা। প্রথমে নাকি আপত্তি জানিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু রুমানিয়ানটা জোর করতে থাকলে বললেন যে বাক্সটা ভার্নায় খালাস করার নির্দেশ আছে তাঁর ওপর। তবুও নাছোড়বান্দা রুমানিয়ানটা, শেষ পর্যন্ত বাক্সের গায়ে আটকান লেবেল পড়ে দেখতে অনুরোধ করল সে ক্যাপ্টেনকে। উপায়ান্তর না দেখে তাই করলেন ক্যাপ্টেন? অবাক কাণ্ড! লেবেলে নাকি লেখা আছে 'গালেজ ভায়া জিব্রাল্টার'। লেবেলটা জাল কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু না, একেবারে জেনুইন লেবেল।

এর বেশি কিছু জানেন না ক্যাপ্টেন। জাহাজ থেকে নেমে এসে ভাড়াটে টমটম রাখার জায়গায় খোঁজ নিয়েও তেমন কিছু জানা গেল না। একজন টমটমঅলা শুধু বলতে পারল গতকাল বিকেলে নাকি একটা টমটমে চাপিয়ে বিরাট একটা কাঠের বাক্স নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু কোথায় নেয়া হয়েছে বলতে পারল না সে।

হতাশ হয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

*

আমরা হোটেলে পৌছানর একটু পরই লর্ড গোডালমিংও ফিরে এলেন। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে জরুরী মিটিং-এ বসলাম আমরা। এখন আমাদের গন্তব্যস্থান সোজা কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গ। যেভাবেই হোক বিসট্রিজ থেকে বোর্গো গিরিপথ অতিক্রম করে কাউন্টির দুর্গের পথ ধরতে হবে আমাদের। গালেজ থেকে বিসট্রিজে তিন ভাবে যাওয়া যায়। প্রথমত জলপথে, সেরেথ নদী দিয়ে। দ্বিতীয়ত রেলপথে—এখান থেকে ভেরেস্তি পর্যন্ত গিয়ে ঘোড়া গাড়িতে চেপে। আর তৃতীয় ও শেষ পথটা শুধু ঘোড়া গাড়িতে। আন্দাজ করলাম। এই পথেই গেছে কাউন্ট ড্রাকুলা।

যদি প্রথম পথেই যায়, সেক্ষেত্রে কাউন্ট ড্রাকুলাকে ধরতে হলে একটা অসাধারণ দ্রুতগামী স্টীম লঞ্চ দরকার। আর দ্বিতীয় পথে যদি গিয়ে থাকে সে তাহলে তাকে ধরা যাবে না কোনমতেই। কিন্তু সেপথে বারবার বাহন বদলাতে হবে বলে আন্দাজ করলাম কিছুতেই সে পথটা বেছে নেয়নি ড্রাকুলা। আর তৃতীয় পথটা ধরে যদি সে গিয়ে থাকে, তাহলে এই মুহূর্তে আমরা রওনা দিলেও আমাদের থেকে পনর ষোল ঘন্টা এগিয়ে থাকবে ড্রাকুলা। সুতরাং একটা অত্যন্ত দ্রুতগামী টমটম হলে একটানা আটচল্লিশ ঘন্টা চলার পর হয়ত কাউন্ট ড্রাকুলাকে ধরা সম্ভব হলেও হতে পারে আমাদের পক্ষে। যদিও আমরা নিশ্চিত যে তৃতীয় পথটাই বেছে নিয়েছে সে, তবুও হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। অন্য দুটো পথে তার যাওয়ার সম্ভাবনাটাও একেবারে বাদ দিলে চলবে না।

তাহলে কি করা যায়? সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ঠিক হল, যত টাকা লাগুক স্টীম লঞ্চ ভাড়া করে নদীপথে যাব আমি আর লর্ড গোডালমিং। মিনা আর প্রফেসর এগারটা চল্লিশের ট্রেন ধরে রেলপথে যাবেন। আর ছ'ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি নিয়ে তৃতীয় পথে রওনা দেবেন ডাক্তার সেওয়ার্ড আর মিস্টার মরিস। বোর্গো গিরিপথের মুখে গিয়ে মিলিত হবে তিনটে দল এবং শেষ কথা হল যে-কোন উপায়েই হোক কাউন্ট ড্রাকুলার আগে পৌছতে হবে তিনটে দলের।

পথে দস্যু তস্কর বা বুনো জানোয়ারের ভয় আছে, কাজেই তিনটে দলকেই সাথে করে আগ্নেয়াস্ত্র নিতে হবে। প্রয়োজনীয় ম্যাপও নিতে হবে। সমস্ত সম্ভাবনাগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে যার যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে হোটেল থেকেই তিনটে দলে ভাগ হয়ে তিন দিকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

৩০ অক্টোবর, রাত।

প্রচুর টাকার বিনিময়ে একটা খুবই ভাল লঞ্চ জোগাড় করতে পেরেছি আমরা। চালককে বসে থাকতে বলে নিজের হাতেই স্টিয়ারিং হুইল তুলে নিলেন লর্ড

গোডালমিং। অসাধারণ দক্ষতায় প্রচণ্ড জোরে লঞ্চটাকে চালিয়ে নিয়ে চললেন তিনি। এত ভাল লঞ্চ চালনা তিনি কোথায় শিখলেন জিজ্ঞেস করে জানলাম, টেমস নদীতে তাঁর নিজেরই একটা স্টীম লঞ্চ আছে। নিরক্ষরেখা থেকে ৪৭ ডিগ্রী কৌণিক দূরত্ব রেখে উত্তর দিকে যাত্রা করেছিলাম আমরা, এখন দ্রুত গতিতে কারপাথিয়ানসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। লর্ড গোডালমিং আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন এ হারেই সারাটা রাত লঞ্চ চালিয়ে যেতে পারবেন তিনি।

অন্ধকার রাতে, অজানা পথে এক অজানা ভয়ঙ্করের দেশে পাড়ি জমিয়েছি আমরা। বাইরের পৃথিবীর সাথে এখন আমাদের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন। গভীর অন্ধকারে নদীর দু'তীরের বিশাল পাহাড়গুলোকে দেখলে কেন যেন ছমছম করে ওঠে গা। তার ওপর মাঝে মাঝেই হিমেল ঝড়ো বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় থর থর করে কেঁপে উঠছে আমাদের লঞ্চ।

৩১ অক্টোবর।

যতই সামনে এগোচ্ছি, বেড়ে চলেছে ঠাণ্ডা। লঞ্চের ভেতরে ফার্নেসের উত্তাপ না থাকলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বহু আগেই জমে যেতাম। সারারাত একটানা লঞ্চ চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে চালকের হাতে হুইল তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন লর্ড গোডালমিং। দুপুরের পর থেকে আবার লঞ্চ চালনার ভার নিয়েছেন তিনি।

১ নভেম্বর।

সাংঘাতিক উদ্বেগ সত্ত্বেও গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙল লর্ড গোডালমিং-এর ডাকে। ধড় মড় করে উঠে বসে দেখলাম সকাল হয়ে গেছে।

ফান্দুতে এসে পৌঁছার পরও ড্রাকুলার বাক্সের কোন খোঁজ পেলাম না। এখান থেকে বিসট্রিজের দিকে চলে গেছে ছোট্ট একটা শাখা নদী। ওই পথেই যেতে হবে আমাদের। শাখা নদী দিয়ে ভেতরে ঢুকেই একটা ফেরিঘাট চোখে পড়ল। ওখানে খোঁজ নিয়ে জানলাম। বড় আকারের নৌকা পাল তুলে দিয়ে বেশ দ্রুত গতিতেই বিসট্রিজের দিকে এগিয়ে গেছে গতকাল রাতের বেলা। কে জানে, ওই নৌকাটায় করেই যাচ্ছে কিনা কাউন্ট ড্রাকুলা? যাক বা না যাক, এ ভাবেই বিসট্রিজে পৌঁছুতে হবে আমাদের। এ পর্যন্ত ভাল ভাবেই এসেছি আমরা। অন্য দুটো দলও কি আমাদের মতই এগুচ্ছে? হঠাৎ মিনার কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঈশ্বরের কাছে আর্জি জানাচ্ছি, ও যেন বিপদ মুক্ত থাকে।

পনের

ডাক্তার জন সেওয়ার্ডের ডায়েরী থেকে

১ নভেম্বর।

কোন্ দিক দিয়ে যে গত দুটো দিন কেটে গেছে টেরই পাইনি। লিখতেও পারিনি, কারণ সে সময়ও নেই, সুযোগও নেই। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে চলতে গিয়ে টমটমের ক্রমাগত ঝাঁকুনিতে স্থির হয়ে বসাই দুষ্কর, লিখব কি?

কোচোয়ান বাদেই টমটমটা ভাড়া নিয়েছিলাম, অবশ্য তাতে টাকা খরচ হয়েছে প্রচুর। টমটমের পুরো মূল্যও জামানত হিসেবে রেখে আসতে হয়েছে গাড়ির মালিকের কাছে।

পালা করে টমটম চালাচ্ছি আমি আর মরিস। মাঝে মাঝে অতি সামান্য সময়ের জন্যে আমাদের এবং ঘোড়াগুলোর খাওয়া আর বিশ্রাম চলছে। এই একটু বিশ্রামের সময়েই আজ লেখার জন্যে খাতা খুলে বসেছি। কয়েকটা লাইন অন্তত না লিখে রাখলে চলবে কেন?

যতই সামনে এগোচ্ছি বেড়ে চলেছে ঠাণ্ডা। অল্পঅল্প তুষারও পড়তে শুরু করেছে গতকাল রাত থেকে। এবড়োখেবড়ো উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ এমনিতেই সাংঘাতিক বিপজ্জনক, তার ওপর তুষার পড়ে পিচ্ছিল হয়ে শতগুণ বেড়ে গেছে বিপদের আশঙ্কা। তবু, যে-ভাবেই হোক যত দ্রুত সম্ভব বোর্গো গিরিপথে গিয়ে পৌঁছতেই হবে আমাদের।

ষোল

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

৩১ অক্টোবর।

ভেরেস্তিতে এসে পৌঁছেছি আজ দুপুরে। রাতটা হোটেলে কাটিয়ে কাল খুব ভোরে আবার বোর্গো গিরিপথের দিকে রওনা দেব। যেভাবে শীত পড়তে শুরু করেছে, এখান থেকেই সবার জন্যে গরম জামা-কাপড় কিনে না নিয়ে গেলে বোর্গো গিরিপথে পৌঁছে বিপদে পড়তে হবে, ভেবে, দিনের বেলায়ই সমস্ত কেনাকাটা সেরে রেখেছিলাম। জোনাথনের জন্যে দারুণ ভাবনা হচ্ছে। কি জানি

কোন্ বিপদে পড়ে বসে আবার।

১ নভেম্বর।

আজকের মত এত সুন্দর সকাল জীবনে দেখিনি আমি। চারদিকে ছবির মত সুন্দর সব প্রাকৃতিক দৃশ্য। ধূসর, সবুজ আর নীলের মেলা চারদিকে।

ভাল কথা, দু'দিন পর আজ ভোররাতে আবার আমাকে সম্মোহিত করেছিলেন প্রফেসর। আশ্চর্য। আমার কথা শুনে প্রফেসরের ধারণা হয়েছে এখন নাকি আবার জলপথে চলেছে কাউন্ট ড্রাকুলা। প্রফেসর বলেছেন, গালেজ থেকে প্রথমে টমটমে করে তৃতীয় পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে গেছে কাউন্ট আমাদের বোকা বানানোর জন্যে। তারপর ফিরে এসে জলপথে রওনা হয়েছে। ভাবতেও পারেনি পিশাচটা, তিনটে পথেই তার পিছু নেব আমরা। কাউন্ট জলপথে চলেছে শোনার পর থেকে জোনাথনের বিপদাশঙ্কায় সারাক্ষণ কেমন করছে আমার বুকের ভেতরটা।

বোধহয় আমার মনের কথা টের পেয়েই আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে প্রফেসর বললেন, 'ভেবো না মা, ওই পিশাচটার সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ জোনাথন। বিপদ আসলে ঠিকই টের পাবে সে। তাছাড়া পবিত্র ক্রুশ আর ধুনো কাছে আছে ওর, ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না পিশাচ ড্রাকুলা।'

একটা গ্রামের ভেতর এসে রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামিয়ে চা খেতে নামলাম আমরা। বিচিত্র পোশাক পরা মেয়ে-পুরুষের দল আমাদেরকে ঘিরে ধরে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। একজন বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল প্রফেসরকে, 'এ এলাকায় নতুন দেখছি তোমাদেরকে, তা চলেছ কোথায়?'

'বোর্গো গিরিপথ পেরিয়ে কাউন্ট ড্রাকুলার মেহমান হতে চলেছি আমরা,' উত্তর দিলেন প্রফেসর।

'পাগল হয়েছ তোমরা। ওই হতচ্ছাড়া প্রাসাদে মেহমান হতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে কেউ?' বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে বলল বৃদ্ধা।

'ঈশ্বর সহায় থাকলে আমরা পারব। এই দেখুন না কি কি জিনিস আছে আমাদের সাথে,' বলে পকেট থেকে ক্রুশ, রসুন আর ধুনো বের করে দেখালেন প্রফেসর।

'হুঁ! মনে হচ্ছে পারবে তোমরা। তবু হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, সাবধানে থেকো,' কথা শুনে মনে হল প্রফেসরের দেখান জিনিসগুলোর গুণাগুণ জানা আছে বৃদ্ধার।

চা খাওয়া হয়ে গেলে আবার রওনা দিলাম আমরা। হিসেব মত দুপুরের আগেই বোর্গো গিরিপথের মুখে পৌঁছে যাবার কথা আমাদের।

২ নভেম্বর, সকাল।

দুপুরে নয়, শেষ পর্যন্ত গতকাল বিকেলে এসে পৌঁছেছিলাম বোর্গো গিরি-পথের প্রবেশ মুখে। তিনটে দলের মধ্যে আমরাই প্রথম এখানে এসে পৌঁছেছি। বোর্গো গিরিপথটার প্রবেশ মুখের কাছেই বুকোভিনা থেকে বিসট্রিজ হয়ে আসা চওড়া পথটার সাথে এসে মিশেছে পুব পশ্চিম উত্তর থেকে আসা তিনটে গাড়ি চলার উপযোগী অপেক্ষাকৃত ছোট পথ। পশ্চিমের পথটা চলে গেছে কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গ পর্যন্ত। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া পথটার দু'দিকে খাড়া পাহাড় আর ঘন বন জঙ্গল। ওদিকে তাকালেই কেমন যেন ছমছম করে ওঠে গা। অথচ এই পথ দিয়েই এক আঁধার রাতে একা একা কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গে পাড়ি জমাতে হয়েছিল জোনাথনকে, কথাটা ভাবলেও খাড়া হয়ে ওঠে গায়ের রোম। সত্যিই সাহসী বলতে হবে জোনাথনকে।

ঠিক উপত্যকা নয়, বরং বলা যায় বিশাল একটা সমান্তরাল চত্বরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বোর্গো গিরিপথের মুখটা। দক্ষিণে খাড়া পাহাড়। উত্তর পুবের পথ দুটো অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে এখান থেকে। এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ করেই পাহাড়ের আড়ালে হাড়িয়ে গেছে পথ দুটো।

চারদিকে যতদূর চোখ যায় লোক বসতির কোনো চিহ্নই নেই। অনেক খুঁজে পেতে পুবের পাহাড়ের গায়ে একটা খিলানঅলা গুহার মত জায়গা বের করে তাতে আমাদের রাত কাটানর বন্দোবস্ত করলেন প্রফেসর। গাড়ি থেকে খুলে নিয়ে কাছেই একটা গাছের সাথে বেঁধে খেতে দিলেন ঘোড়াগুলোকে। একটানা খাড়াই পাহাড়ী পথ বেয়ে এসে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছিল ওরাও।

বেলা থাকতে থাকতেই আশপাশের বন থেকে কিছু কাঠ জোগাড় করে আনলেন প্রফেসর। অল্পক্ষণ পরেই পশ্চিমের বিশাল পাহাড়টার ওপারে অস্ত গেল সূর্য। অদ্ভুত লাগল আমার কাছে সূর্যাস্তটা। অস্ত যাবার আগে পাহাড়রটার চূড়ায় যেন কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকল সূর্যটা, তারপরই দ্রুত নেমে গেল ওপাশে। পশ্চিমাকাশের মেঘগুলোর ওপর কিছুক্ষণ ধরে রঙ ছিটাল পাহাড়ের ওপাশে হারিয়ে যাওয়া সূর্যটা। তন্ময় হয়ে ওই বিচিত্র রঙে রাঙান মেঘমালার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, টেরই পাইনি কখন এসে ঘিরে ধরেছে নিকষ কালো অন্ধকার। আর টের পাব কি, সন্ধ্যা তো আর নিয়ম মাফিক পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেনি, হঠাৎ করেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর।

আঁধার হয়ে যেতেই গুহার ভেতর থেকে আমাকে ডাকলেন প্রফেসর। ফিরে দেখলাম, কাঠের পর কাঠ সাজিয়ে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে ফেলেছেন তিনি। সেই অগ্নিকুণ্ডে ভালমত আগুন জ্বলে উঠতেই গুহার ভেতরটা আর বাইরের বেশ কিছুটা জায়গা আলোকিত হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকতেই

চোখে পড়ল গুহার মেঝেতে কাঠি দিয়ে এঁকে বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করেছেন প্রফেসর। হিজিবিজি করে আরও কি সব যেন আঁকা বৃত্তটার ভেতর। আমাকে বৃত্তটার ভেতর গিয়ে বসতে আদেশ দিলেন প্রফেসর। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি প্রফেসর?'

'আগে থেকেই হুঁশিয়ার থাকলাম। কাউন্ট ড্রাকুলার এলাকা এটা। সে ছাড়াও আরও কত পিশাচ প্রেতাত্মা আছে এ এলাকায় কে জানে। ওই বৃত্তের ভেতর থাকলে আমাদের কিছুই করতে পারবে না পিশাচেরা। যদিও চেষ্টা করবে অনেকভাবে। আর একটা কথা, ওরা তোমাকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে বাইরে বের করার চেষ্টা করবে, তোমারও ইচ্ছে করবে বেরোতে, কিন্তু খবরদার। এক চুল বাইরে যাবে না বৃত্তের।'

বৃত্তের ভেতর বসেই খেয়ে নিলাম আমি আর প্রফেসর। হিম পড়তে শুরু করেছে। গায়ে কয়েকটা মোটা কম্বল জড়িয়ে নিয়ে গনগনে আগুনের পাশে বসে থাকা সত্ত্বেও কাঁপুনি গেল না শরীরের। আর অন্ধকার! এমন নিকষ কালো অন্ধকার জীবনে দেখিনি আমি। বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছে অরণ্যচারী প্রাণীদের বিচিত্র ডাক। মাঝে মাঝেই কানে এসে বাজছে নেকড়ের কলজে কাঁপান বীভৎস গর্জন। সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে কোটি কোটি ঝিঁঝির সম্মিলিত কর্কশ চিৎকার।

সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসছে আমার, কিন্তু কি জানি ঘুমিয়ে পড়লেই কি ঘটে এই ভয়ে জোর করে মেলে রাখছিলাম চোখের পাতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। একটা পাথরে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠিক কতক্ষণ পর জানি না, হঠাৎ ঘোড়াগুলোর ভয়ার্ত চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলাম বসে থেকেই থর থর করে কাঁপছে ঘোড়াগুলো। কোন কারণে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ওরা।

ওদিকে শোঁ-ওঁ-ওঁ শব্দে বয়ে চলেছে তুষার মেশান প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। হঠাৎ করেই থেমে গেল বাতাসের গর্জন। সাথে সাথেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি ছেঁড়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল ঘোড়াগুলো। পালাতে চাইছে। কেন? কি দেখতে পেয়েছে ওরা?

কয়েক সেকেণ্ড পরই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা, ঘোড়াগুলোর পেছনে বন থেকে যেন তালে তালে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছে হাজার হাজার ধূসর লোমশ প্রাণী। ওদের হাঁ করা মুখের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে সাদা ধারাল দাঁতের সারি। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল দাঁতগুলো। প্রত্যেকটা মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা করে টকটকে লাল জিভ। ঘোড়াগুলোর কয়েক হাতের মধ্যে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল জানোয়ারগুলো, তারপর একসাথে হিংস্র

গর্জন করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়াগুলোর ওপর। দেখতে দেখতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ঘোড়াগুলোকে খেয়ে ফেলল ওরা।

ঘোড়াগুলোকে খাওয়ার পর আমাদের ওপর চোখ পড়ল নেকড়েগুলোর। ধীরেসুস্থে খুশি মনে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল ওরা। গুহা মুখটা থেকে হাতখানেক তফাতে থাকতেই আবার একসাথে বীভৎস গর্জন করে উঠল জানোয়ারগুলো। অর্থাৎ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ওরা, এটা তারই ইঙ্গিত।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম প্রফেসরকে। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন প্রফেসর, 'ভয় নেই মা, আমাদের বৃত্তের ভেতর ঢুকতে পারবে না হতচ্ছাড়া নেকড়েগুলো। ওরা সাধারণ জানোয়ার হলে পারতো, কিন্তু কাউন্ট ড্রাকুলার প্রভাব আছে ওদের ওপর। ওই পিশাচ কাউন্ট যে জিনিসকে ভয় পায়, ওই নেকড়েগুলোও ভয় পায় তাকে।' প্রফেসরের কথাই ঠিক। বৃত্তটার ইঞ্চি দুয়েকের মধ্যে পা দিয়েই ছিটকে পেছনে সরে গেল কয়েকটা নেকড়ে, যেন কষে চাবুক মেরেছে কেউ ওদের গায়ে। আর সামনে এগোতে সাহস করল না নেকড়ে-. গুলো। বৃত্তটার কয়েক হাত দূরে বসে বসেই ক্রুদ্ধ গর্জন করে করে শাসাতে লাগল আমাদের, যেন বলছে, 'সাহস থাকলে বাইরে আয়, তারপর দেখাচ্ছি মজা।' কিন্তু ওদের মজা দেখার সাহস আমাদের নেই। তাই বৃত্তের ভেতর বসেই ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকলাম।

কতক্ষণ পর জানি না, হঠাৎ করেই যেন কার আগমনে ভয় পেয়ে গিয়ে পেছনের জঙ্গলে ছুটে পালাল নেকড়েগুলো। কাঠগুলো পুড়ে যাওয়ায় নিবু নিবু হয়ে এসেছে অগ্নিকুণ্ডের আগুন। কিছু নতুন ডালপালা ফেলে দিলেন তাতে প্রফেসর। আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। ঠিক এই সময় আগুনের আলোয় চোখে পড়ল জিনিসগুলো। তিনিটে ধুলোর ঘূর্ণি। আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল এক ধরনের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে ধূলিকণাগুলো থেকে। আস্তে আস্তে সেই ঘূর্ণায়মান উজ্জ্বল ধূলিকণার ভেতর থেকে রূপ নিতে থাকল তিনটে মূর্তি। অল্পসময়েই ঝলমলে সাদা পোশাক পরা তিনজন অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম গুহা-মুখটার সামনে। আশ্চর্য উজ্জ্বল দীর্ঘ টানাটানা চোখ, ঝকঝকে সাদা তীক্ষ্ণ দাঁত আর টুকটুকে লাল ঠোঁট ওদের। দু'জনের রঙ একটু চাপা। পরিষ্কার বুঝলাম ওরা কারা। কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গে চাঁদনী রাতে এই তিন ডাইনীকেই দেখেছিল জোনাথন।

আমাদের দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল ওরা। আশেপাশের পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াতে লাগল সেই হাসির শব্দ। মদির কণ্ঠে

আমাকে ডাকল সবচেয়ে সুন্দরী ডাইনীটা, 'ওখানে ওই গুহার ভেতরে বসে কেন, বোন? চলো আমাদের সঙ্গে। আমরা সবাই মিলে হাসব, খেলব, গাইব। কি মজা হবে, না? এসো, চলে এসো।'

মাথার ভেতরটা কেমন জানি করে উঠল আমার। মনে হল, তাইতো, এই হতচ্ছাড়া গুহায় বসে আছি কেন আমি?' ওদের সাথে চলে গেলেই তো পারি। বেরিয়ে যাবার জন্যে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে যেতেই কাঁধ চেপে ধরে জোর করে আমাকে বসিয়ে দিলেন প্রফেসর। পকেট থেকে একটা ক্রুশ বের করে আমার মাথায় ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই তিন ডাইনীর সাথে হেসে খেলে বেড়ানোর চিন্তা দূর হয়ে গেল আমার মাথা থেকে। বুঝতে পারলাম, চরম ভুল করতে যাচ্ছিলাম।

ক্রুশটা দেখেই একটু চমকে গেল ডাইনীরা। পকেট থেকে এক টুকরো ধুনো বের করলেন এবার প্রফেসর। তারপর ভেঙে তিন টুকরো করে ছুঁড়ে দিলেন তিন ডাইনীর দিকে। বুক ভাঙা আর্তনাদ করে চোখের পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ডাইনীরা।

যেমনি হঠাৎ করে থেমে গিয়েছিল, ডাইনীগুলো চলে যেতেই তেমনি হঠাৎ করেই আবার শুরু হল তুষার ঝড়। বুঝলাম, ঝড়কে থামিয়ে দিয়েছিল ওই তিন ডাইনী।

একসময় শেষ হল ওই ভয়ঙ্কর রাত। ঝড়ের বেগও কমতে কমতে থেমে গেল একসময়ে। সকাল যে এত আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে জীবনে প্রথমে টের পেলাম আজ।

প্রফেসর ভ্যান হেলসিং-এর মেমর‍্যাণ্ডাম

২ নভেম্বর।

নাস্তা খাওয়ার পরপরই গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে মিনা। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আমারও। কিন্তু ঘুমালে চলবে না, বহু কাজ পড়ে আছে। প্রথমেই খুঁজে বের করতে হবে ওই ডাইনী তিনটের কবর।

বৃত্তটার ভেতরই ঘুমিয়ে আছে মিনা। এই দিনের বেলা কোন ভয় নেই, কিন্তু ডাইনীদের অশুভ প্রভাব পড়তে পারে ওর ওপর, ভেবে, ওর মাথার কাছে রেখে দিলাম একটা ক্রুশ। তারপর শরীরের ওপর কিছু ধুনোর গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু কোন্ পথে যাবে? ভেবেচিন্তে পশ্চিমের পথটা ধরেই রওনা দিলাম। বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর চোখে পড়ল পরিত্যক্ত কবরখানাটা। কবরখানাটার একপাশে একটা বড়সড় ঘর। কালের কশাঘাতে জীর্ণ হয়ে গেছে

দেয়ালগুলো। প্লাস্টার খসে গিয়ে মুখ ব্যাদান করে আছে লাল ইঁট।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওই ঘরটাতেই ঢুকে পড়লাম। বেশ কয়েকটা পুরানো কফিন পড়ে আছে ঘরটার ভেতর। বুঝলাম আসলে এটা একটা সমাধিকক্ষ। কতদিনের পুরানো কফিন ওগুলো কে জানে? আন্দাজ করলাম, কয়েকশো বছর আগের তো হবেই। মলিন হয়ে যাওয়া কফিনগুলোর গায়ের বিচিত্র কারুকাজ দেখেই বোঝা যায় প্রাচীন আমলের কোন সম্ভ্রান্ত রাজা বা জমিদারের সমাধিকক্ষ এটা।

প্রত্যেকটা কফিন এখন খুলে দেখতে হবে আমাকে। সহজ নয় কাজটা, তবু করতেই হবে। এক এক করে খুলতে শুরু করলাম কফিনের ডালা। সব ক'টা কফিন খুলে দুটো ডাইনীকে পেলাম, সেই অপেক্ষাকৃত চাপা রঙের দুটো। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দরীটা কোথায়? যেখানেই হোক, খুঁজে বের করতেই হবে ওকে। তার আগে যে দুটোকে পাওয়া গেছে ওদেরকেই শেষ করে নেয়া যাক। সেই আগের কায়দায় মাথা কেটে রসুনের কোয়া পুরে দিলাম ওদের মুখে। তারপর হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দিলাম কাঠের গজাল। সঙ্গে সঙ্গে কফিনের ধুলোর সাথে মিশে গেল ওরা। কোন চিহ্নই থাকল না আর ওদের। শত শত বৎসর আগে কেউ মারা গেলে তার চিহ্ন আজ পর্যন্ত থাকবেই বা কি?

ডাইনী দুটোকে শেষ করে আবার খুঁজতে শুরু করলাম। খুঁজতে খুঁজতে এ সমাধিকক্ষটার ঠিক পেছনে ছোট্ট আর একটা সমাধিকক্ষ খুঁজে পেলাম। মাত্র দুটো কফিন আছে সেখানে। দুটোর গায়েই সোনার কারুকাজ করা। সোনার পাতে লাশের নাম লিখে আটকে দেয়া হয়েছে দুটো কফিনের মাথার দিকটায়। এত পুরু হয়ে ধুলো পড়ে আছে ওগুলোর ওপর যে ভালমত পড়াই যায় না। পকেট থেকে রুমাল বের করে প্রথম কফিনটার গায়ে আটকান নাম লেখা পাতটার ওপরটা ভালমত মুছে নিয়ে নামটা পড়েই চমকে উঠলাম। পরিষ্কার জার্মান অক্ষরে বড় বড় করে লেখা নামটাকে বাংলা অক্ষরে লিখলে হয়, 'কাউন্ট ড্রাকুলা'।

কফিনটার ডালার স্ক্রুগুলো খুলে ধীরে ধীরে তুলে ধরলাম ডালাটা। শূন্য। কেউ নেই ওর ভেতর। অর্থাৎ কাউন্ট থাকে না এখানে। আর থাকে না যে তার প্রমাণ তো আমি নিজেই। নতুন নতুন কফিন বদলিয়ে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়ায় কাউন্ট। তেমনি একটা কফিনের পিছু নিয়েই তো সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে এই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এসে পৌঁছেছি আমরা। ডালাটা নামিয়ে রাখার আগে ধুনো আর রসুন ছড়িয়ে দিলাম কফিনটার ভেতরে। ভবিষ্যতে দরকার পড়লেও আর এটার ভেতর এসে আত্মগোপন করতে পারবে না কাউন্ট ড্রাকুলা।

দ্বিতীয় কফিনটার কাছে এগিয়ে গিয়ে এটার নেমপ্লেটটাও মুছে ফেললাম

রুমাল দিয়ে। এটাতে লেখা নামটা হল, 'কাউন্টেস ফ্র্যানজিসকা'। অর্থাৎ এই ফ্র্যানজিসকা নামের ভদ্রমহিলা ছিলেন কাউন্ট ড্রাকুলার সহধর্মিণী। স্ক্রুগুলো খুলে এ কফিনটার ডালাটা তুলে ধরতেই চমকে উঠলাম। যদিও আগেই আন্দাজ করেছিলাম, তবু স্তব্ধ হয়ে সেদিকে চেয়ে থাকলাম কয়েক মুহূর্ত। কফিনের ভেতর শুয়ে আছে গতরাতের সেই রূপসী ডাইনী। গতরাতের চেয়েও অনেক, অনেক বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে এখন ওকে। বুঝলাম, জীবিত থাকাকালীন এই কাউন্টেসের পরিচারিকা ছিল চাপা রাঙা ডাইনী দুটো।

আর বেশিক্ষণ ভাবনা চিন্তা না করে শেষ করে দিলাম এটাকেও। কফিনের ডালা আটকে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম, রীতিমত কাঁপছে তখন আমার সর্বশরীর। তিন তিনটা ডাইনীকে একা শেষ করা সোজা কথা নয়।

বোর্গো গিরিপথের প্রবেশ মুখের গুহাটার কাছে ফিরে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল। এসে দেখলাম তখনও গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে মিনা।

মিনা হারকারের ডায়েরী থেকে

২ নভেম্বর, রাত।

ঘুম ভাঙল প্রফেসরের ডাকে। উঠে গুহা থেকে বেরিয়ে দেখলাম পশ্চিমাকাশের দিকে রওনা দিয়েছে সূর্য। প্রফেসর বললেন, 'এই যে মা, খাওয়া দাওয়া আজ কিছু হবে না?'

'একটু অপেক্ষা করুন, প্রফেসর, এখুনি আনছি,' টিন খুলে শুকনো খাবার বের করতে বসলাম।

খাবারগুলো সবে সাজান শেষ করেছি, এমন সময় মাথার ওপরের পাহাড় চূড়া থেকে ভেসে এল প্রফেসরের উচ্চকিত চিৎকার, 'মিনা, জলদি এসো।'

খাবার ফেলে ছুটলাম। চূড়ায় উঠতে উঠতে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হল প্রফেসর?'

চোখ থেকে বিনকিউলার নামাতে নামাতে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'একটা ঘোড়াগাড়ি। এদিকেই আসছে।'

'কই, কোথায়?' প্রফেসরের পাশে এসে জিজ্ঞেস করলাম।

বিনকিউলার আমার হাতে দিতে দিতে বললেন প্রফেসর, 'উত্তরের পথ ধরে আসছে গাড়িটা।'

বিনকিউলারটা চোখে লাগিয়ে প্রফেসরের নির্দেশিত দিকে তাকালাম। সত্যিই, উত্তরের পাহাড়ী পথ ধরে একটা দু'ঘোড়া টানা হুড খোলা বেশ বড় আকারের গাড়ি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে এদিকেই। গাড়িটায় রাখা

বাক্সটাও দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। কয়েকজন জিপসী বসে আছে বাক্সটার ওপর। গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ বহু দূরের পাহাড়টার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আর একটা গাড়ি। ওটার দ্রুত আকৃতি বড় হওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে গাড়িটা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সামনেরটাকে ধরার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে পেছনের গাড়িটা। ওটা আরও এগিয়ে আসতেই লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে চিনতে পারলাম আমি। জোনাথন। আনন্দে দুলে উঠল বুকটা। চোখ থেকে বিনকিউলারটা নামিয়ে প্রফেসরের হাতে দিতে দিতে বললাম, 'দেখুন, দেখুন, প্রফেসর, জোনাথনরাও পৌঁছে গেছে।'

'তাই নাকি? কই দেখি?' আমার হাত থেকে বিনকিউলারটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চোখে লাগালেন প্রফেসর। কয়েক সেকেণ্ড দেখে নিয়েই যন্ত্রটা চোখ থেকে নামিয়ে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'পুব দিক থেকেও দ্রুত ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

প্রফেসরের কথা শুনে আমিও পুব দিকে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। আমারও যেন মনে হল শুনতে পাচ্ছি শব্দটা।

'চলো, মিনা। আক্রমণের প্রস্তুতি নিইগে,' বলে আমার হাত ধরে দ্রুত পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করলেন প্রফেসর।

নিচে নেমে এসে কি মনে হতেই পশ্চিম আকাশটা একবার দেখে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন প্রফেসর। তারপর প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ! বেলা তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে! হাতে সময়ও অল্প। এই সময়ের ভেতরই ওই জিপসীগুলোর হাত থেকে বাক্সটা ছিনিয়ে নিয়ে ড্রাকুলাকে শেষ করতে না পারলে আবার হাতছাড়া হয়ে যাবে পিশাচটা। সূর্য ডুবে গেলেই কফিন থেকে বেরিয়ে পালাবে কাউন্ট। তখন এই এলাকায় উল্টো তার হাতেই মারা যাব আমরা। তুমি এখানে দাঁড়াও মিনা, আমি আসছি।' এক ছুটে গিয়ে গুহার ভেতর থেকে তাঁর ব্যাগ ও পিস্তলটা নিয়ে এলেন প্রফেসর। ও দুটো আমার হাতে দিয়ে আমাদের ঘোড়াশূন্য গাড়িটা নিজেই টানতে টানতে নিয়ে চললেন গিরিপথের উত্তর প্রবেশ মুখের কাছে। সেখানে পৌঁছে গাড়িটা আড়াআড়ি ভাবে রেখে প্রবেশ পথটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ছুটে এসে আমার হাত থেকে ব্যাগ আর পিস্তলটা নিয়ে আমাকে সহ ছুটলেন গিরিমুখের কাছে। ফেলে রাখা গাড়িটার কাছাকাছিই একটা বিশাল পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম আমরা।

এক এক করে কেটে যাচ্ছে প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠিত মুহূর্তগুলো। প্রতি সেকেণ্ডে দু'বার করে সূর্যের দিকে তাকাচ্ছেন প্রফেসর। কারণ ওটা অস্ত গেলেই আমাদের আশা ভরসা সব শেষ। এই নির্জন ভয়ঙ্কর পাহাড়ী এলাকা থেকে তখন প্রাণ নিয়ে

বেরিয়ে যেতে পারব কিনা সন্দেহ। ফিসফিস করে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এত ভয়ের কি আছে, প্রফেসর, আপনার বানান ওই বৃত্তের ভেতর বসে থাকলেই তো আর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ড্রাকুলা।'

'পারবে। এবং অতি সহজে। নেকড়েগুলোর কথা ভুলে গেলে?'

'কিন্তু ওরাও তো বৃত্তের ভেতর ঢুকতে পারে না?'

'আজ পারবে। ওগুলোর ওপর থেকে শুধু নিজের প্রভাব তুলে নেবে কাউন্ট ড্রাকুলা। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নেকড়েতে পরিণত হবে ওগুলো। তখন ওই যাদুর বৃত্ত থাকা না থাকা নেকড়েগুলোর কাছে সমান। গোটা চারেক রাইফেল পিস্তল দিয়ে কি করে ঠেকাব ওই হাজার হাজার রক্তলোভী হিংস্র নেকড়েকে?'

এতক্ষণে টের পেলাম কোন্ পথে আসবে বিপদ। মনে পড়ল নেকড়েগুলোর ঝকঝকে তীক্ষ্ণ দাঁত আর টকটকে লাল জিভের কথা। কি করে ঘোড়াগুলোকে নিমেষে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল ওরা কল্পনা করে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম একবার। ওদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে ঘোড়ার পদশব্দ।

'খবরদার! এক পা এগোবে না আর,' হঠাৎ আমাদের দুপাশের পাহাড় চূড়া থেকে রুক্ষ কঠিন গলায় আদেশ দিল কেউ কাউকে। চমকে উঠে তাকালাম দু'দিকেই। দেখলাম, রাইফেল উঁচিয়ে ধরে ডান দিকের পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার মরিস, বাঁয়ে জোনাথন। আবার গর্জে উঠলেন মিস্টার মরিস, 'শেষবারের মত বলছি, এখুনি গাড়ি না থামালে গুলি করতে বাধ্য হব!'

লাফ দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর, তাঁর সাথে সাথে আমিও। দেখলাম দ্রুত ধাবমান ঘোড়াগুলোকে থামাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে জিপসী সর্দার। মিস্টার মরিসের কথা সর্দার বুঝতে পেরেছে কিনা কে জানে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় আর হাতের রাইফেল দেখে যে কেউই আন্দাজ করতে পারবে মিস্টার মরিসের উদ্দেশ্যটা কি। আমার মনে হল আন্দাজেই বুঝে নিয়েছে জিপসী সর্দার। অসাধারণ দক্ষতায় ঘোড়াগুলোকে থামিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে পালাবার চেষ্টা করল সে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল মিস্টার মরিসের হাতের রাইফেল। প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল একটা ঘোড়া। গুলি করল জোনাথনও। দ্বিতীয় ঘোড়াটাও পড়ে গেল। বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে নেমে ছুটল জিপসী সর্দার। পিছু পিছু তার সাঙ্গপাঙ্গরাও।

এক মুহূর্ত দেরি না করে ব্যাগ হাতে ছুটলেন প্রফেসর। আমি ছুটলাম তাঁর পিছু পিছু। জিপসীদের গাড়ির কাছে পৌঁছেই এক মুহূর্তও দেরি না করে। পকেট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে বাক্সের ডালা খোলায় মনোযোগ দিলেন তিনি। ওদিকে পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। মেঘের গায়ে তার রঙ ছিটানর

পালাও প্রায় শেষ। এমনি সময় টান মেরে বাক্সের ডালা তুলে ফেললেন প্রফেসর। একসাথে বাক্সের ভেতরে উঁকি দিলাম আমি, প্রফেসর, জোনাথন আর মিস্টার মরিস।

বোধহয় ঘুম ভাঙার সময় হয়ে এসেছে কাউন্ট ড্রাকুলার। কারণ জ্বলতে শুরু করেছে তার লাল টকটকে চোখ দুটো। যে-কোন মুহূর্তে এখন আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়তে পারে পিশাচটা।

দ্রুত ব্যাগ থেকে রসুনের কোয়া বের করে কাউন্টের মুখে পুরে দিলেন প্রফেসর। পরমুহূর্তেই মাংস কাটা ছুরির এক কোপে কাউন্টের মাথাটা গলা থেকে আলাদা করে দিল জোনাথন। ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুটের সাথে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে বেঁধে রেখেছিল সে ছুরিটা, বোধহয় এমনি কোন প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্যেই। কাউন্টের কাটা ধড়টা সাংঘাতিকভাবে দুমড়াতে মোচড়াতে শুরু করতেই ব্যাগ থেকে একটা কাঠের গজাল আর হাতুড়ি বের করে মিস্টার মরিসের হাতে তুলে দিলেন প্রফেসর। বললেন, 'পিশাচটার দেহটা স্থির হলেই এই গজালটা ওর হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দেবে।'

হাতুড়ি আর গজাল হাতে অপেক্ষা করতে থাকলেন মিস্টার মরিস। হঠাৎ আমাদের পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ হতেই চমকে পেছনে ফিরে চাইলাম। দেখলাম, গাড়ি নিয়ে গিরিমুখে প্রবেশ করছেন লর্ড গোডালমিং। প্রায় একই সময়ে পুবের মুখ দিয়ে এসে ঢুকলেন ডাক্তার সেওয়ার্ড। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। লর্ড গোডালমিং আর ডাক্তার সেওয়ার্ডের হাতে গাড়ির ভার দিয়েই জিপসীদের আটকাতে রাইফেল হাতে দু'দিক থেকে দুই পাহাড় চূড়ায় উঠে যান মিস্টার মরিস আর জোনাথন, পরে ওদের মুখেই কথাটা শুনেছি আমি। এতক্ষণ হয়ত কোন পাহাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন লর্ড গোডালমিং আর ডাক্তার সেওয়ার্ড, জিপসীরা পরাজিত হয়েছে টের পেয়েই এখন গিরিমুখে এসে ঢুকেছেন ওঁরা।

গিরিমুখে প্রবেশ করেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে আমাদের দিকে ছুটে এলেন লর্ড গোডালমিং আর ডাক্তার সেওয়ার্ড। বাক্সের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে কাউন্টের ধড়টার। ঠিক সেই মুহূর্তে হাতের গজালটা কাউন্টের হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দিলেন মিস্টার মরিস।

সাথে সাথেই ঘটতে শুরু করল ঘটনা। দ্রুত গলতে শুরু করল কাউন্টের দেহটা, সবটা দেহ গলে যাওয়ার পর বাক্সের গায়ের ধুলোর সাথে মিশে যেতে শুরু করল গলিত পদার্থটুকু। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে ধুলোয় মিলেমিশে অদৃশ্য হয়ে গেল কাউন্টের সমস্ত চিহ্ন। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে যদি মারা যেত কাউন্ট তাহলেও তার কফিন খুলে দেখলে এখন বাক্সের

মধ্যে যেমন দেখছি তেমনি ধুলো ময়লা ছাড়া আর কিছুই দেখতাম না আমরা।

ওদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। বনের ভেতর ডাকতে শুরু করেছে নেকড়েগুলো। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন প্রফেসর, 'জলদি, গাড়ি দুটোতে উঠে পড় সবাই। নেকড়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে এখুনি পালাতে হবে আমাদের। কাউন্টের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক জানোয়ারে পরিণত হয়েছে ওরা। যাদুর বৃত্ত বা ওই ধরনের আর কিছুই এখন ওদের ঠেকাতে পারবে না'।

'কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কাউন্ট ড্রাকুলার প্রাসাদ দুর্গে।'

'প্রাসাদ দুর্গে,' অবাক হয়ে গেলাম আমি। 'ওই অভিশপ্ত দুর্গে এই রাতের বেলা গিয়ে ঢুকতে চাইছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, প্রাসাদ দুর্গে। ওটাই এখন আমাদের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।'

'নিরাপদ হল কি করে? কাউন্ট ড্রাকুলা না হয় মরেছে, কিন্তু ওই তিন ডাইনী তো রয়ে গেছে।'

'না, নেই। আজ দুপুরে শেষ করে এসেছি আমি ওদের। তুমি তখন ঘুমিয়ে ছিলে।'

প্রফেসরের প্রতি শ্রদ্ধায় আর একবার নুয়ে এল আমার মাথাটা।

কাউন্ট মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গিয়েছিল দুর্গের সমস্ত মায়াবী তালা, কাজেই সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি আমাদের। ঘোড়াসুদ্ধ গাড়িগুলোকেও ভেতরে নিয়ে আসার পর ভেতর থেকে দরজায় খিল তুলে দিয়েছিলেন প্রফেসর।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে যে কামরাটায় জোনাথনের ঘুমানোর বন্দোবস্ত করেছিল কাউন্ট ড্রাকুলা তা আমাদের দেখাচ্ছিল জোনাথন, এমন সময় কয়েকজন লোকের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে চমকে উঠে ছুটে গেলাম জানালার কাছে। তারার আবছা আলোয় চোখে পড়ল দুর্গের সদর দরজার দিকে প্রাণপণে ছুটে আসছে কয়েকটা লোক। ওদের চুল আর পোশাকের আবছা, অবয়ব দেখে বুঝলাম সেই জিপসী কয়জন। কিন্তু ওরা এভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে কেন? মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কোন কিছু তাড়া করেছে ওদের। কয়েক সেকেণ্ড পরই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। বন থেকে বেরিয়ে হিংস্র গর্জন করতে করতে জিপসীদের পেছন পেছন ছুটে আসছে লোমশ জানোয়ারগুলো। কাউন্টের পৈশাচিক প্রভাব মুক্ত হয়ে তারই পূজারীদের তাড়া করেছে ভয়াবহ নেকড়ের দল।

বন্ধ সদর দরজার কাছে এসে প্রাণপণে তাতে ধাক্কা দিতে শুরু করল জিপসীরা, আর বার বার পেছনে তাকাতে লাগল। ওদের কাছ থেকে আর মাত্র

কয়েক গজ দূরে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

উদ্বিগ্নভাবে প্রফেসরকে বললাম, 'দরজার খিলটা খুলে দেয়া উচিত, প্রফেসর।'

'এখন আর কোন লাভ নেই,' শান্ত গলায় বললেন প্রফেসর। 'দেরি হয়ে গেছে অনেক। নিচে নেমে গিয়ে আমরা খিল খোলার আগেই জিপসীদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে নেকড়ের দল।'

নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হবার আগেই আস্তে করে জানালার কাছ থেকে সরে এলাম আমি।

বিশ্বের ভয়ঙ্করতম পিশাচ কাহিনী
ব্রাম স্টোকারের

ড্রাকুলা

রূপান্তরঃ রকিব হাসান

ট্রানসিলভেনিয়ার দুর্গম অঞ্চলে পাহাড়-চুড়ায় বিশাল
এক প্রাচীন দুর্গে ওর বাস।
দুর্গের নিচের এক অন্ধকার কামরায়-
কফিনের ভেতর।
লোকালয়ে, একেবারে খোদ লন্ডন শহরে এসে
হাজির হলো সে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।
রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন আইনজীবী হকিন্স।
ক্রমেই রক্তশুন্য ফ্যাঁকাসে হয়ে যাচ্ছে লুসির চেহারা।
সাংঘাতিক পাগলামি শুরু করেছে রেনফিল্ড।
হারিয়ে যাচ্ছে শিশুরা-ফিরে এলে ওদের গলায়
দেখা যাচ্ছে ধারালো দাঁতের সূক্ষ্ম ক্ষতচিহ্ন।
এসব কিসের আলামত?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০